



দ্য সাইলেন্ট পেশেন্ট

অ্যালেক্স মাইকেলিডিস

অনুবাদঃ সালমান হক

দ্য সাইলেন্ট পেশেন্ট

অ্যালেক্স মাইকেলিডিস

অনুবাদঃ সালমান হক

অনুবাদের উৎসর্গঃ

কালকের দিনটা হয়তো আজকের
চেয়ে ভালো কাটবে, এই আশায়
বুক বাঁধা সবাইকে...

পূর্বকথা

অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ডায়েরিঃ জুলাই ১৪

জানি না কেন লিখছি এসব।

বলা যায় না, জানতেও পারি। কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইছি না।

এই লেখাকে কী নাম দেব, সেটাও জানি না। ডায়েরি বলাটা একটু নাটুকে শোনাবে বোধহয়। এমন তো না যে কিছু বলার আছে আমার। অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের মত মানুষদেরই কেবল ডায়েরি লেখা মানায়। জার্নাল বললে বড় বেশি আঁতেল মার্কী শোনায়। তখন আবার মনে হবে, প্রতিদিনই লিখতে হবে এখানে, ফলে নিয়মিত লেখার প্রতি অনীহা জন্মাবে।

নাম না দিলেও কিছু আসে যায় না। মাঝে মাঝে শুধু এখানে কিছু কথা লেখবো, ব্যস। একবার কোন কিছুর নাম দিলে দেখা যায় সেই নামটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। ঘুরে ফিরে সেই শব্দগুলোই মাথায় ঘোরে। কিন্তু শব্দ তো গোটা চিত্রের খুবই ছোট একটা অংশ, সমুদ্রের উপরের পৃষ্ঠে বেরিয়ে থাকা হিমশৈলের চুড়ার মতন। তাছাড়া কথা বা শব্দে কখনোই সুবিধে করতে পারিনি আমি, বরং ছবির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তাই বলা যায় যে গ্যাব্রিয়েল জোরাজুরি না করলে এখানে লেখা শুরুই করতাম না বোধহয়।

কিছুদিন যাবত বিষণ্ণতা জেঁকে বসেছে আমার মধ্যে, কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত। ভেবেছিলাম ঠিকঠাক লুকোতে পেরেছি ব্যাপারটা, কিন্তু ওর চোখে ঠিকই পড়েছে। জানতাম যে পড়বে, সবকিছুর প্রতি খেয়াল থাকে ওর। জিজ্ঞেস করেছিল, আমার আঁকাআঁকি কেমন চলছে। সত্যিটাই বলেছিলাম-চলছে না। তখন এক গ্লাস ওয়াইন এনে দেয় আমাকে, টেবিলে বসে ওর রান্না দেখতে থাকি।

গ্যাব্রিয়েলের রান্নার একটা আলাদা ধরণ আছে, দেখতে ভালো লাগে। চমৎকার রাধুনি সে-ছিমছাম, গোছানো। আমার পুরো উল্টো।

“কিছু বলল,” বলে সে।

“বলার কিছু থাকলে না বলবো। মাঝে মাঝে নিজের মনেই আটকে যাই, জানো?”

মনে হয় কাদাভর্তি জলার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি।”

“তাহলে লেখার চেষ্টা করলেও তো পারো। মনের এলোমেলো ভাবনাগুলোও গোছাতে পারবে তখন।”

“খারাপ বলোনি। চেষ্টা করে দেখবো।”

“আমাকে খুশি করার জন্যে না বলে আসলেও লেখা শুরু করো, ডার্লিং।”

“করবো।”

এরপর থেকে প্রায়ই আমাকে ব্যাপারটা নিয়ে তোতে শুরু করে সে, কিন্তু পাত্তা দেই না আমি। কিছুদিন পর এই ছোট নোটবুকটা নিয়ে আসে আমার জন্যে। কালো চামড়ায় মোড়ানো, ভেতরে খালি পৃষ্ঠা; গতানুগতিক কাগজের চাইতে কিছুটা পুরু। প্রথম খালি পৃষ্ঠাটায় হাত বুলাই একবার-মসৃণতাটুকু অনুভব করি চোখ বুজে। এরপর পেন্সিল চেষ্টে নিয়ে লেগে পড়ি।

ঠিকই বলেছিল ও। আসলেই লিখতে শুরু করার পর ভালো লাগছে। মনের গুমোট পরিবেশটা হাল্কা হচ্ছে, অনেকটা থেরাপির মতন।

গ্যাব্রিয়েল মুখ ফুটে বলেনি, কিন্তু ও যে আমাকে নিয়ে চিন্তিত সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। সত্যি কথা বলতে (এখানে সত্যটাই লিখবো সবসময়), আমি এখানে লেখা আসলে শুরুই করেছি ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে সে, এটা ভাবতে ভালো লাগে না একদমই। আমার কারণে কষ্ট পাচ্ছে গ্যাব্রিয়েল, এমনটা হতে দিতে পারি না। ওকে যে ভীষণ ভালবাসি! নিজের পুরোটা উজাড় করে ভালোবাসি। এই ভালোবাসার কারণেই মাঝে মাঝে মনে হয়

নাহ। ঐ ব্যাপারে কিছু লিখবো না।

আমার ছবিগুলো আঁকার পেছনের গল্প, অনুপ্রেরণার গল্প-এসবই লিখবো এখানে। ইতিবাচক, হাসিখুশি, স্বাভাবিক চিন্তাগুলোকে শব্দে রূপান্তরের চেষ্টা করবো।

উল্টোপাল্টা ভাবনার কোন জায়গা নেই।

প্রথম পর্ব

দর্শন ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন প্রতিটা মানুষই ভাবতে পারে যে কারো পক্ষেই কোন কিছু গোপন রাখা সম্ভব নয়। যদি তার মুখ বন্ধ থাকে, তাহলে তার আঙুলগুলো কথা বলতে শুরু করে। আর তার অস্তিত্বের প্রতিটা রন্ধ্র হতে ঠিকরে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা।

- সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ইন্ট্রোডাকটরি লেকচারস অন সাইকোঅ্যানালাইসিস

তেরিশ বছর বয়সে স্বামীকে হত্যা করে অ্যালিসিয়া বেরেনসন। কদিন আগেই সপ্তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করেছিল তারা। দুজনই শিল্পী-অ্যালিসিয়া চিত্রশিল্পী, আর গ্যাব্রিয়েল একজন বিখ্যাত ফ্যাশন ফটোগ্রাফার। ছবি তোলার একটা স্বকীয় ভঙ্গিমা আছে গ্যাব্রিয়েলের। অদ্ভুত সব কোণ থেকে একহারা গড়নের, অর্ধনগ্ন সব নারীদের ছবি। মৃত্যুর পর ছবিগুলোর দাম আকাশ ছুঁয়েছে। আমার কাছে অবশ্য তার কাজগুলো একদমই খেলো মনে হয়। বিষয়বস্তুর কোন গভীরতা নেই। অ্যালিসিয়ার ভালো কাজগুলোর সামনে ধোপেই টিকবে না। নিজেকে অবশ্য শিল্প সমঝদার দাবি করবো না, কালের পরিক্রমায় অ্যালিসিয়ার কাজগুলো টিকে থাকবে কি না তা সময়ই বলবে। তবে তার এই মহান কীর্তি অন্য সবকিছুকে লুপ্ত করে দিবে, এটা নিশ্চিত। আপনারা অবশ্য বলতে পারেন যে আমি পক্ষপাতিত্ব করছি। ধরে নিন, আপাতত নিজের মতামতটুকু দিচ্ছি, এই যা। আর আমার মতে অ্যালিসিয়া জিনিয়াস। কৌশলগত দক্ষতার কথা বাদ দিলেও, তার ছবিগুলো আপনা থেকেই প্রবলভাবে যে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কিংবা বলা যায়, বাধ্য করবে মনোযোগ দিতে।

গ্যাব্রিয়েল বেরেনসন খুন হয় ছয় বছর আগে, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে। অগাস্টের পঁচিশ তারিখে (সে বছর বড় বেশি গরম পড়েছিল, আপনাদের মনে আছে বোধহয়) হত্যা করা হয় তাকে। তাপমাত্রার পারদ রেকর্ড ছুঁয়েছিল সেবার। যেদিন সে মারা যায় সেদিন তাপমাত্রা ছিল বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

জীবনের শেষ দিনটায় ভোরে ঘুম ভাঙে গ্যাব্রিয়েলের। হ্যাম্পস্টেড হিথের একদম কিনারা ঘেঁষে গ্যাব্রিয়েল আর অ্যালিসিয়ার বাড়ি। সোয়া পাঁচটায় নর্থওয়েস্ট লন্ডনের বাড়িটা থেকে তুলে তাকে শারডিচে পৌঁছে দেয় একটা গাড়ি। দিনের বাকিটা সময় ছাদে ভোগ ম্যাগাজিনের জন্যে মডেলদের ছবি তুলে কাটায় সে।

অ্যালিসিয়া সেদিন কি করছিল সেসম্পর্কে অবশ্য বেশি কিছু জানা যায়নি। আসন্ন প্রদর্শনীর জন্যে কাজে বেশ পিছিয়ে ছিল সে। সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকার কথা। হয়তো বাগানের ধারে সামারহাউজটায় ছবি এঁকেছে সারাদিন, কিছুদিন আগেই ওটাকে নিজের স্টুডিও বানিয়ে নেয়ে সে। গ্যাব্রিয়েলের ছবি তুলতে তুলতে দেরি হয়ে যায়, বাসায় ফেরে এগারোটার দিকে।

আধঘন্টা পর তাদের প্রতিবেশী বার্বি হেলমান গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। সাথে সাথে পুলিশে ফোন দেয় সে। ১১:৩৫-এ হেভারস্টক হিল স্টেশন থেকে রওনা হয়ে যায় একটা গাড়ি। ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে সময় লাগে তিন মিনিট।

সামনের দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে কালিগোলা অন্ধকার; একটা বাতিও কাজ করছিল না। সন্তর্পণে হলওয়ে পার হয়ে লিভিংরুমে পৌঁছে যায় পুলিশ অফিসারদের দলটা। টর্চের আলোয় সব দেখতে হচ্ছিলো। সেই আলোতেই ফায়ারপ্লোসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অ্যালিসিয়াকে। পুলিশের উপস্থিতিতে কোন বিকারই ছিল না তার। যেন বরফ কুঁদে বানানো শীতল একটা মূর্তি, চেহারায় স্পষ্ট আতংকের ছাপ।

মেঝেতে একটা বন্দুক খুঁজে পায় পুলিশ। আর তার পাশেই চেয়ারে হাত পা বাঁধা গ্যাব্রিয়েল। প্রথমে অফিসারদের দলটা ভেবেছিল বেঁচে আছে সে। মাথাটা অবশ্য একপাশে মৃদু হেলে ছিল, সাধারণত জ্ঞান হারালে এরকম হয়। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের চেহারায় টর্চের আলো পড়তেই পরিষ্কার হয়ে যায় সবকিছু। গুলির উপযুপরি আঘাতে পুরোপুরি বিকৃত তার সুদর্শন চেহারা। পেছনের দেয়ালে ছিটকে লেগেছে খুলির টুকরো, ঘিলু আর রক্ত।

রক্তের ব্যাপারে বিশেষ করে বলতেই হয়। চারদিকে চাপ-চাপ রক্ত। পেছনের দেয়াল, মেঝে, চেয়ার-কোথাও বাদ নেই। অফিসাররা প্রথমে ভাবে সবটুকুই বুঝি গ্যাব্রিয়েলের রক্ত। কিন্তু পরিমাণটা বড্ড বেশি হওয়াতে সন্দেহ জাগে। আর তখনই টর্চের আলোয় মেঝেতে ঝিকিয়ে ওঠে একটা ছুরি, অ্যালিসিয়ার পায়ের কাছে।

এবারে কয়েকটা টর্চ তার দিকে ঘুরে গেলে দেখা যায় সাদা ড্রেসটা রক্তে ভিজে গেছে। দ্রুত একজন অফিসার অ্যালিসিয়ার কজিতে আলো ফেলতেই অতিরিক্ত রক্তের রহস্যটাও বোঝা যায়। অঝোরে রক্ত ঝরছে সেখানকার ক্ষত থেকে। ইচ্ছেকৃতভাবে পোচ দেয়া হয়েছে, এটাও পরিষ্কার।

অ্যালিসিয়া প্রাণপণে বাধা দেয়, যাতে তাকে কেউ বাঁচাতে না পারে। শেষমেষ তিনজন অফিসার একসাথে ধরে নিরস্ত করে। দ্রুত নিকটস্থ রয়াল ফি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। পথেই জ্ঞান হারায় অ্যালিসিয়া। প্রচুর রক্তক্ষরণ হলেও বেঁচে যায় সেযাত্রা।

পরদিন হাসপাতালের একটা প্রাইভেট রুমে আইনজীবীর উপস্থিতিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। গোটা সময় একদম নিশ্চুপ থাকে অ্যালিসিয়া। ফ্যাকাসে ঠোঁটজোড়া মাঝে মাঝে কেঁপে উঠলেও কোন কথা বেরোয়নি। কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। যেন কথা বলতেই ভুলে গেছে সে; কিংবা চেষ্টা সত্ত্বেও বলতে পারছে না। তার বিরুদ্ধে গ্যাব্রিয়েলকে হত্যার অভিযোগ আনার সময়েও কিছু বলেনি। যখন বলা হয় যে তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তখনও মুখে রা সরেনি। কিছু স্বীকারও করে না, আবার অস্বীকারও করে না সে।

অ্যালিসিয়া আর কোনদিন কথা বলেনি।

তার এই নীরবতা তাই স্বাভাবিকভাবেই জন্ম দেয় নানারকম গুজবের। ঘটনার পেছনে নিগুঢ়, হঠকারী কোন রহস্য খুঁজতে শুরু করে অনেকে। পরবর্তী কয়েকমাস পত্রিকার শিরোনামে বারবার দেখা যায় অ্যালিসিয়া বেরেনসনের নাম।

সে মুখে কুলুপ আঁটলেও একটা বার্তা অবশ্য ঠিকই দেয়। নিজের পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে। ছবিটা অ্যালিসিয়া আঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর। শুনানির আগ পর্যন্ত হাউজ-অ্যারেস্টে থাকতে হয় তাকে। আদালত থেকে তার দেখভালের জন্যে যে নার্সকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, সেই ভদ্রমহিলার মতে বাসায় পুরোটা সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে ছবিই আঁকতো অ্যালিসিয়া।

সাধারণত একটা ছবি আঁকার আগে কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে প্রস্তুতি নিত অ্যালিসিয়া। খসড়া স্কেচ, রঙ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট-এসব চলতো লম্বা একটা সময়। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলে তবেই তুলির ছোঁয়া দিত। কিন্তু এবারে আর প্রস্তুতির ধার ধারেনি সে, অনেকটা স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই স্বামী মারা যাওয়ার কদিনের মধ্যে এঁকে

ফেলে ছবিটা।

এই তথ্যটা যেন আগুনে ঢিলে দেয়। স্বামী মারা যাবার পর অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং স্টুডিওতে ঢুকে রঙ নিয়ে রীতিমত খেলাধুলা জুড়ে দিয়েছে- এমনটাই বলেছে অনেকে। কোন বোধ-বিচার নেই! একদম ঠাণ্ডা মাথার খুনিদের মতন।

হয়তো কথাগুলো আংশিক সত্য। অ্যালিসিয়া বেরেনসন খুনি হতেও পারে, আবার না-ও পারে। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে সে একজন শিল্পী। তাই নিজের অনুভূতিগুলো ভেতরে জোর করে দমিয়ে না রেখে এভাবে ক্যানভাসে তুলির আঁচড়ে প্রকাশ করার ব্যাপারটা আমার কাছে তাই অস্বাভাবিক ঠেকেনি। জীবনে হয়তো প্রথমবারের মতন ছবি আঁকার মধ্যে কিছুটা প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে তার চিত্ত। কিন্তু এরকম বেদনার্ত সময়ে প্রশান্তি অনুভব করা কি আদৌ সম্ভব?

ছবিটা একটা আত্মপ্রতিকৃতি। ক্যানভাসের বামদিকে একদম নিচে হালকা নীল গ্রিক অক্ষরে ছবিটার নামও লিখে দেয় সে।

একটা শব্দ : অ্যালসেস্টিস।

অ্যালসেস্টিস গ্রিক পুরাণের এক চরিত্র। তার ভালোবাসার গল্পটা যেকোন করুণ কিংবদন্তিকে হার মানাবে। স্বামী অ্যাডমেতাসের জন্যে স্বেচ্ছায় নিজের জীবনাবসানের শর্ত মেনে নেয় সে। রাজি হয় ইহজগতের মায়া তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে নিজে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে। সে বাদে অন্য কেউ কিন্তু এগিয়ে আসেনি অ্যাডমেতাসকে রক্ষা করতে। স্বেচ্ছা-বলিদানের এই কাহিনীর সাথে অ্যালিসিয়ার সার্বিক পরিস্থিতির মিল ঠিক কোথায়, তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। লম্বা একটা সময় ভেবেছি ব্যাপারটা নিয়ে। অবশেষে সত্যটা একদিন সামনে আসলে

নাহ, এভাবে তাড়াহুড়ো করে বললে গোটা চিত্রটা বুঝতে অসুবিধে হবে। এর চেয়ে বরং একদম গোড়া থেকে শুরু করি। ঘটনাগুলো আপনা থেকেই প্রকাশ পাবে সেক্ষেত্রে। অযথা রঙ চড়িয়ে অথবা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু বলার সুযোগ আমার নেই। ধীরে সুস্থে, সতর্কভাবে ধাপে ধাপে এগোনোটাই শ্রেয়। কিন্তু শুরু করবোটা কোথা থেকে? নিজের পরিচয় দেয়া উচিত, কিন্তু এ মুহূর্তে না দিলেও অসুবিধে নেই; আমি তো আর এই গল্পের মূল চরিত্র নই। কাহিনীটা মূলত অ্যালিসিয়া বেরেনসনের, সুতরাং তাকে এবং তার আঁকা ‘অ্যালসেস্টিস’ দিয়েই শুরু করছি।

ছবিটা একটা আত্মপ্রতিকৃতি। ক্যানভাসে দেখা যাবে অ্যালিসিয়া তার স্টুডিওতে নগ্ন দেহে ইজেলের সামনে তুলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দেহাবয়বের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লালচে চুলগুলো কঙ্কালসার কাঁধ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নিচের দিকে। ফ্যাকাসে ত্বক ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে নীলচে শিরা-উপশিরা। দুই হাতের কজিতে না শুকানো তাজা ক্ষত। আঙুলের ফাঁকে নিপুণভাবে তুলিটা ধরা। লাল রঙ চুঁইয়ে পড়ছে ওটা থেকে-নাকি রক্ত? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে ছবি আঁকায় মত্ত অ্যালিসিয়া, কিন্তু তার সামনের ক্যানভাসটা একদম খালি। তেমনি তার চেহারাও অভিব্যক্তিহীন। কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটটা ঈষৎ ফাঁকা। মুক।

মামলার শুনানি চলাকালীন সময়েই ছবিটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে জিন ফিলিক্স মার্টিন। সোহোতে অবস্থিত তার ছোট গ্যালারিটাই অ্যালিসিয়ার যাবতীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শন করে এসেছে সবসময়। স্বাভাবিকভাবেই তার এই সিদ্ধান্ত বিতর্কের ঝড় তোলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, স্বামীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবিটা দেখার জন্যে আর্ট গ্যালারির বাইরে ইতিহাসে প্রথমবারের মতন বিশাল লাইন।

অন্যান্য শিল্প-প্রেমীদের সাথে সেদিন লাইনে আমিও ছিলাম। লম্বা একটা সময় অপেক্ষা করেছি পাশের সেক্স-শপটার সামনে দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে এগোতে থাকে লাইন। ভেতরে ঢোকার পর আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই আরাধ্য ছবিটার সামনে। যেন মেলার মূল আকর্ষণ ‘ভুতুড়ে বাড়ি’ দেখতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একদল মানুষকে। অবশেষে নিজেকে ‘অ্যালসেস্টিস’-এর মুখোমুখি আবিষ্কার করি।

দীর্ঘ একটা সময় অ্যালিসিয়ার চেহারার দিকে তাকিয়ে তার চোখের দৃষ্টিটা বোঝার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন লাভ হয় না। ছবিটা আমার বোধগম্যতার বাইরে। সেই নির্বিকার, অনুভূতিশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যালিসিয়া। অপাপবিদ্ধতা বলুন কিংবা অনুশোচনা-কোনটারই ছোঁয়া নেই অভিব্যক্তিতে।

অন্যদের অবশ্য তাকে বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না।

“দেখেই মনে হয় শয়তান,” আমার পেছনে ফিসফিসিয়ে বলে এক মহিলা।

“তাই না?” তার সঙ্গিও একমত পোষণ করে এই বিষয়ে। “ঠাণ্ডা মাথার খুনি।”

অ্যালিসিয়ার দোষ প্রমাণিত হবার আগেই এরকম মন্তব্য করাটা উচিৎ নয়

বলেই মনে হয় আমার কাছে। কিন্তু তাই বলে বাস্তবতা অস্বীকারের সুযোগ নেই। সকলে ধরেই নিয়েছে সে দোষি। ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো শুরু থেকেই গল্পের ভিলেন হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে তাকে।

অবশ্য ঘটনাস্থলের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে সাধারণ কারো পক্ষে এরকমটা ভাবাই স্বাভাবিক। গ্যাব্রিয়েলের মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। একা। বন্দুকের গায়ে প্রাপ্ত আঙুলের ছাপও তার। গ্যাব্রিয়েলকে যে সে-ই হত্যা করেছে এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কখনোই ছিল না। কিন্তু খুনটা কেন করেছে সে, এটা রহস্য থেকে যায়।

এই ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে আলাপ আলোচনা হয়েছে বিস্তর। নানাধরণের তত্ত্ব ছাপা হয়েছে সংবাদপত্রে। উত্তাপ ছড়িয়েছে রেডিও চ্যানেলগুলোর সকালবেলার শো-তে। অভিজ্ঞ আলোচকেরা চেষ্টা করেছে অ্যালিসিয়ার এহেন কৃতকর্মের উদ্দেশ্য উদ্ঘাটনের। কেউ তার পক্ষে কথা বলেছে আবার কেউ কেউ সরাসরি তাকেই দোষারোপ করেছে। একটা তত্ত্ব অনুযায়ী গোটা ব্যাপারটাই একটা দুর্ঘটনা। হয়তো কোন সেক্স গেমের মতো ছিল দু'জনে, গ্যাব্রিয়েলের হাত পা বাঁধা ছিল সেজন্যেই। আবার অনেকে আঙুল তোলে সেই পুরনো পাপীর দিকেই-ঈর্ষা। হয়তো অন্য কোন নারীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি অ্যালিসিয়া। কিন্তু শুনানিতে গ্যাব্রিয়েলের ভাই দাবি করে যে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বা বিশ্বস্ততার কোন কমতি ছিল না তার। তাহলে কি টাকাপয়সার কোন ব্যাপার? স্বামীর মৃত্যুতে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ ছিল না অ্যালিসিয়ার। বরং দু'জনের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তার সম্পত্তির পরিমাণই বেশি।

কানাঘুষো চলতেই থাকে। রহস্যের জবাব তো পাওয়া যায়ই না, বরং অ্যালিসিয়াকে ঘিরে উদ্ভব ঘটে নিত্য নতুন প্রশ্নের। বিশেষ করে তার চুপ থাকা নিয়ে। কেন মুখে কুলুপ এঁটেছে সে? কিছু লুকোচ্ছে? কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে? যদি তাই হয় তাহলে কাকে বাঁচাতে চাচ্ছে সে? কেন?

মনে আছে, সেসময় আমি ভাবতাম, অ্যালিসিয়াকে নিয়ে এসব জল্পনা কল্পনা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের কেন্দ্রে আছে এক অপার শূন্যতা। মৌনতা।

শুনানিতে বিচারক সাহেবও অ্যালিসিয়ার মুখ না খোলাকে ভালো চোখে দেখেননি। বিচারক অ্যালভারসটোন যুক্তি দেখান, নির্দোষ লোকেরা সাধারণত চড়া

গলায় নিজেদের নির্দোষিতা দাবি করে। অ্যালিসিয়া মুখে তো কুলুপ এঁটেছিলই, হাবভাবেও অনুতাপের কোন চিহ্ন ছিল না। শুনানি চলাকালীন সময়ে একবারের জন্যেও চোখের জল ফেলেনি সে-গণমাধ্যম কর্মীদের জন্যে মুখরোচক আরেকটা তথ্য। পুরোটা সময় চেহারা ছিল অভিব্যক্তিহীন, শীতল।

আসামী পক্ষ তাই বাধ্য হয় সাজা কমানোর চেষ্টা করতে। তারা বলে, ছোটবেলা থেকেই মানসিক সমস্যায় ভুগছে অ্যালিসিয়া। বিচারক প্রথমে খোঁড়া অজুহাত হিসেবে নাকচ করে দেন এই দাবি। কিন্তু পরবর্তীতে ইম্পেরিয়াল কলেজের ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিষয়ের অধ্যাপক ল্যাজারুস ডায়োমেডেসের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত বদলান তিনি। মি. ডায়োমেডেস অধ্যাপনার পাশাপাশি উত্তর লন্ডনের মানসিক হাসপাতাল গ্রোভ'-এ ক্লিনিকাল ডিরেক্টর হিসেবেও কর্মরত। সাধারণত সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের রাখা হয় সুরক্ষিত এই ফরেনসিক ইউনিটে। তিনি বলেন, অ্যালিসিয়ার কথা বলতে না চাওয়া তার মানসিক অস্থিতির দিকেই নির্দেশ করছে, তাই রায় ঘোষণার সময় সেটাও বিবেচনা করা উচিত।

সহজভাবে ব্যাখ্যা করলে ডায়োমেডেসের কথার মানে দাঁড়ায়-অ্যালিসিয়া মানসিকভাবে অসুস্থ। তবে সাইকিয়াট্রিস্টরা সাধারণত কারো মুখের ওপর একথা বলেন না।

একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে এই ব্যাখ্যাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হবে। যদি আসলেও অ্যালিসিয়ার কোন সমস্যা না থেকে থাকে, তাহলে ভালোবাসার মানুষটাকে কেন চেয়ারে বেঁধে একদম কাছ থেকে মুখে গুলি করবে সে? কেনই বা ঘটনার পর তার চেহারায় ফুটে উঠবে না অনুতাপ? কারো সাথে কোন কথাও তো বলেনি। সমস্যা আলবত আছে। সোজা বাংলায় অ্যালিসিয়া বদ্ধ উন্মাদ।

অন্যথা হবার সম্ভাবনাই নেই।

শেষ পর্যন্ত আসামী পক্ষের দাবি মেনে নেন বিচারক অ্যালভারস্টোন। জুরিদেরও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করেন তিনি। অ্যালিসিয়াকে অধ্যাপক ডায়োমেডেসের তত্ত্ববধায়নে ভর্তি করা হয় গ্রোভে। সেই ডায়োমেডেস, যিনি হস্তক্ষেপ না করলে বিচারক আসামীপক্ষের দাবি গ্রাহ্যই করতেন না।

অ্যালিসিয়ার যদি আসলেও কোন মানসিক সমস্যা না থেকে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে অভিনয়ের দরুণ এযাত্রা পার পেয়ে গেছে সে। লম্বা কারাদণ্ড ভোগ

করতে হবে না তাকে। পুরোপুরি সুস্থ হলে কয়েক বছরের মধ্যেই ছাড়া পাবে। তাহলে তো এতদিনে একটু একটু করে সুস্থ হবার অভিনয় শুরু করার কথা তার, তাই না? এক-আধটা কথা বলবে; কৃতকর্ম নিয়ে অনুশোচনায় ভোগা শুরু করবে। কিন্তু না, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়-অ্যালিসিয়া কথা বলে না।

মৌনতাই তার একমাত্র পাথের।

আর তাই ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে গণমাধ্যমের উন্মাদনা মিইয়ে আসে, ভাটা পড়ে উৎসাহে। আপাত চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার আসামীদের তালিকায় নাম উঠে যায় তার, কালের পরিক্রমায় যাদের পরিচয় ভুলে যাই আমরা সবাই।

তবে সবার ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। অ্যালিসিয়া বেরেনসনের রহস্য নিয়ে আমার মতন হাতে গোণা কয়েকজন এখনও আগ্রহী। জানতে চাই তার এরকম মুখে কুলুপ এঁটে থাকার আসল কারণটা কি। একজন সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যে, গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুতে মানসিক আঘাত পেয়েছে সে। তার চুপ থাকা সেই মানসিক আঘাতেরই বহিঃপ্রকাশ। কৃতকর্ম কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি অ্যালিসিয়া, তাই থমকে গেছে চিরতরে। কিন্তু তাকে সাহায্য করতে চাই আমি চাই যে সে সুস্থ হয়ে উঠে নিজের মুখে সব খুলে বলুক। তাকে সাড়িয়ে তুলতে চাই।

এটা বলা হয়তো অত্যাুক্তি হবে না যে অ্যালিসিয়া বেরেনসনকে সাহায্য করার যোগ্যতা আমার আছে। একজন ফরেনসিক সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে সমাজের সবচেয়ে ভঙ্গুর মানসিকতার রোগীদের নিয়ে কাজ করেছি। তাছাড়া অ্যালিসিয়ার গল্পটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুরণিত করেছে। আমাকে, শুরু থেকেই কেমন যেন একটা সংযোগ অনুভব করছিলাম ওর প্রতি।

দুর্ভাগ্যবশত তখনও ব্রডমুরে কর্মরত ছিলাম আমি বিধায় ওকে সাহায্য করাটা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু ভাগ্যদেবীর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন।

অ্যালিসিয়া বেরেনসন ভর্তি হবার ছয় বছর পর অবশেষে দ্য গ্রোভে ফরেনসিক সাইকোথেরাপিস্টের পদ খালি হয়। বিজ্ঞপ্তিটা দেখামাত্র বুঝে গিয়েছিলাম, মনে মনে এতদিন এরকম কিছুই চেয়ে এসেছি। তাই চোখ বুজে আবেদন করে ফেলি।

আমার নাম থিও ফেবার, বয়স বেয়াল্লিশে। সাইকোথেরাপিস্ট হয়েছি কারণ আমার নিজের মানসিক অবস্থাও একসময় আমার রোগীদের মতনই ছিল। তবে

ইন্টারভিউতে যখন আমাকে যখন প্রশ্নটা করা হলো, তখন সত্যটা চেপে গেছি।

“সাইকোথেরাপির প্রতি আপনার আগ্রহী হবার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে কি বলবেন?” জানতে চাইলেন ইন্দিরা শর্মা। চোখের বিশাল চশমাটার কারণে তার দিকে তাকালে পঁচার কথা মনে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

ইন্দিরা থোভের কনসাল্ট্যান্ট সাইকোথেরাপিস্ট। বয়স ষাটের কাছকাছি হলেও চেহারার কমণীয় ভাবটা কমেণি। গোলাকার মুখের সাথে কাঁচা-পাকা চুলগুলো বেশ মানিয়ে গেছে। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মিষ্টি করে হাসলেন একবার, যেন বোঝাতে চাইছেন যে এই প্রশ্নটা নিতান্তই জড়তা কাটানোর প্রেক্ষিতে করা। আগামী প্রশ্নগুলো হয়তো আরেকটু কৌশলী হবে।

ইতস্তত করতে লাগলাম। প্যানেলের বাকি সবাই যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি। বললাম যে হাইস্কুলে পড়ার সময় একটা কেয়ার হোমে পার্ট-টাইম চাকরি করেছি আমি, সেখান থেকেই সাইকোলজির প্রতি আগ্রহ জন্মে। আর সেই আগ্রহের দরুণই একসময় সাইকোথেরাপির ওপরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করি। জানতাম যে এরকম কিছুই শুনতে চাইছে ইন্টারভিউ প্যানেলের সদস্যরা। কথা বলার সময় সবার চোখের দিকেই তাকিয়েছি, যাতে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আছে এরকমটা না ভেবে বসে কেউ।

“বোধহয় মানুষকে সাহায্য করতে চাওয়াটাই মূল কারণ,” কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম। “আসলেই।”

যত্নসব ফালতু কথা।

মানে, মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছে আছে আমার, তবে সেটা মুখ্য কারণ নয় এই পেশায় আসার। প্রশিক্ষণ শুরু হবার পর এই কারণটা মাথায় আসে। মূল উদ্দেশ্যটা শুনলে অনেকে হয়তো আমাকে স্বার্থপর ভাববে। আসলে নিজেকে সাহায্য করার জন্যে এই পথ বেছে নিয়েছি আমি। যারা অন্যদের মানসিক সুস্থতা রক্ষায় কাজ করে তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই কথাটা প্রযোজ্য বলে আমার বিশ্বাস। সাইকোথেরাপির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই কারণ আমরা প্রত্যেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অথবা একসময় বিপর্যস্ত ছিলাম। তবে সেটা স্বীকার করে নেবার মানসিকতা সবার আছে কি না, তা ভাববার বিষয়।

মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়ার পর ছোটবেলায় বেশ লম্বা একটা সময় কিন্তু আমরা কিছু মনে রাখতে পারি না। মস্তিষ্কের স্মৃতি-ধারণ ক্ষমতা পুরোপুরি বিকশিত হতে কিছুটা সময় লাগে। অনেকে আবার ভাবে যে ভালোবাসার দেবী আফ্রোদিতি যেরকম সমুদ্রের ফেনা থেকে একদম নিখুঁত হয়ে জন্মেছিলেন, আমরাও হয়তো পূর্ণ বিকশিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেই স্মৃতিহীন দশা থেকে পরবর্তী দশায় পদার্পণ করি। কিন্তু মস্তিষ্কের বিকাশ নিয়ে চলমান গবেষণার কারণে আমরা এখন জানি যে ধারণাটা ভুল। জন্মের সময় আমাদের মস্তিষ্কের অবস্থার সাথে কাদামাটির তুলনা করা যায়। আর সেটা কোন অবস্থাতেই দৈবচরিত্রের মত নিখুঁত নয়। যেমনটা। সাইকোঅ্যানালিস্ট ডোনাল্ড উইনিকট বলেন, “শিশু বলে আদতে কিছুর অস্তিত্ব নেই।” আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ওপর পারিপার্শ্বিকতা আর সাহচর্যের প্রভাব প্রবল; আর সেই প্রভাব নিখুঁত চরিত্রের জন্ম দেয় না। কাদামাটিকে নির্দিষ্ট একটা রূপ দেয়ার পেছনে কুমারের যেরকম ভূমিকা থাকে, তেমনি আমাদের চরিত্রের রূপায়নের কারিগর হিসেবে মা-বাবা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে।

সংগত কারণেই এই চিন্তাটা কিছুটা ভীতিকর। কে জানে সেই স্মৃতিহীন দশায় আমাদের কিরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে! হয়তো সহ্য করতে হয়েছে নানারকম যন্ত্রনা আর ভোগান্তি। ঠিকমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের চারিত্রিক গঠনপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বড় হবার সময় আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গি ছিল ভয়, অনিশ্চয়তা আর দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে মনে হতো যে আমার অস্তিত্ব না থাকলেও দুশ্চিন্তাটুকুর অস্তিত্ব ঠিকই থাকবে।

আর এরকমটা অনুভূত হবার পেছনের কারণ যে বাবা, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এখন।

বাবা কখন কোন পরিস্থিতিতে রেগে যাবেন বা কি করবেন সেটা আগে থেকে বোঝার কোন উপায় ছিল না। একদম সাধারণ কোন মন্তব্য বা। সামান্য ভিন্নমত পোষণও হুটহাট রাগিয়ে তুলতে তাকে। এরপর যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটতো সেটা থেকে রেহাইয়ের কোন উপায় ছিল না। তার চিৎকার চোঁচামেচির তোড়ে পুরো বাসা কাঁপতো। কখনো কখনো ভয়ে ছুট দিলে পেছন পেছন তাড়া করে আসতেন। অগত্যা বিছানার নিচে বা দেয়ালের পাশে লুকোনোর চেষ্টা করতাম। মনে মনে প্রার্থনা চলতো যাতে কোন এক অদৃশ্য শক্তিবলে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাই।

তবে শেষরক্ষা হতো না, তার হাতজোড়া ঠিকই টেনে বের করে আনতো আমাকে। এরপর বাতাসে শিষ কেটে এসে আমার শরীরে নানারকম নকশা আঁকতো তার কোমরের বেল্ট। প্রতিটা আঘাতে জ্বলে উঠতে শরীর। একসময় যেভাবে ছুট করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবেই হঠাৎ থেমে যেত অত্যাচার। বাচ্চারা যেভাবে রেগেমেগে খেলার পুতুল ছুঁড়ে মারে, ঠিক সেভাবে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা হতো আমাকে। নিশ্চল পড়ে থাকতাম সেখানে।

বাবার ওরকম রেগে ওঠার কারণ কখনো বুঝিনি। শাস্তিটুকু আসলেও প্রাপ্য ছিল কি না, এ প্রশ্ন নিজেকে হাজারবার করেছি। মা'র কাছে যখন জানতে চাইতাম যে বাবা আমার ওপর সবসময় রেগে থাকে কেন, তখন জবাবে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাতো সে। “আমি কিভাবে বলবো? তোমার বাবা একটা আস্ত উন্মাদ।”

মা কিন্তু মজাচ্ছিলে কথাটা বলতো না। এখন যদি কোন সাইকিয়াট্রিস্ট বাবাকে দেখতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলতো, তিনি পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে ভুগেছেন পুরোটা জীবন। আর তার এই মানসিক সমস্যার প্রভাব পড়েছে আমার মস্তিষ্কের বিকাশের ওপরে। শারীরিক নির্যাতন, জিনিসপত্র ভাঙচুর, কান্নাকাটি-এই হচ্ছে আমার শৈশব।

তবে কিছু আনন্দের মুহূর্তও ছিল; বিশেষ করে বাবা যখন বাসায় থাকতেন না। একবার ব্যবসার কাজে একমাসের জন্যে আমেরিকা গিয়েছিলেন তিনি। সেই তিরিশটা দিন আমি আর মা বাসায় নির্ভয়ে সময় কাটিয়েছি। সেবার ডিসেম্বরে প্রচুর তুষারপাত হয়েছিল। আমাদের বাগানের দিকে তাকালে মনে হতো কেউ বুঝি সাদা একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে সেখানে। মা'র সাথে স্নোম্যান বানিয়েছিলাম। পুরোটা বানানোর পর দেখা যায় যে স্নোম্যানটার অবয়ব বাবার সাথে মিলে গেছে। এমনকি তার মতন একটা ভুড়িও আছে। অবচেতন মনেই কাজটা করেছিলাম আমরা। পরে অবশ্য ইচ্ছে করেই বাবার হাতমোজা, হ্যাট আর ছাতাটাও জুড়ে দেয়া হয়। সবশেষে অনেকগুলো স্নোবল বানিয়ে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে দিতাম স্নোম্যানটার দিকে আর দুষ্ট বাচ্চাদের মতন হাসতাম একজন আরেকজনকে ধরে।

সেই রাতে ভারি তুষারঝড় হয়েছিল। মা তার ঘরে গেলে আমি কিছুক্ষণ ঘুমের ভান করে রুমে শুয়ে থাকি, এরপর সন্তর্পণে বেরিয়ে আসি বাগানে। দু'হাত বাড়িয়ে তুষারকণা নিয়ে খেলি আনমনে কিছুক্ষণ। আমার আঙুলের ডগায় ওগুলোকে উধাও

হয়ে যেতে দেখি। তখনকার অনুভূতিটা আসলে ঠিক বলে বোঝাতে সম্ভব না আমার পক্ষে। একই সাথে আনন্দ আর হতাশা অনুভূত হওয়া কি সম্ভব? হাতের ওপর যখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলো তুষারকণাগুলো, মনে হচ্ছিল জীবনের আনন্দ হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে আমার বাড়ির চার দেয়ালের বাইরেও সৌন্দর্যে ভরপুর একটা জগত বিদ্যমান; সেই মুহূর্তে অবশ্য জগতটা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরেই ছিল। এই স্মৃতিটা পরবর্তীতে আমার জীবনে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। ভয়ের নাগপাশে মোড়ানো সেই ক্ষণিকের স্বাধীনতা আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেন আঁধারে মোড়ানো টিমটিমে এক আলোকবর্তিকা।

এটা বেশ বুঝতে পারি, বাঁচতে হলে, সুস্থ একটা জীবন পেতে হলে বাসা থেকে পালাতে হবে আমাকে; যতদূরে সম্ভব। কেবলমাত্র তখনই হয়তো কিছুটা নিরাপদ বোধ করতে পারবো। সেই সুযোগটা পাই আঠারো বছর বয়সে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে যেরকম নম্বরের দরকার ছিল, তা পেয়ে যাই। সারের সেই বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসি। ভেবেছিলাম অবশেষে মুক্তির স্বাদ পেতে যাচ্ছি।

কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম।

তখন জানতাম না, কিন্তু বাবার ছায়া অবচেতনভাবেই ততদিনে আমার গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। বাসা থেকে যত দূরেই পালাই না কেন, তার হাত থেকে কখনোই রেহাই পাবো না। মাথার ভেতরে সবসময়ই একটা কণ্ঠস্বর বলতে থাকবে, মানুষ হিসেবে আমি ব্যর্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম সেমিস্টারের প্রায় পুরোটাই সেই কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করে আমাকে, অবস্থা এতটাই সঙ্গিন ছিল। প্রচণ্ড ভয়ের কারণে ঘর থেকে বাইরেই বেরুতে পারতাম না, কারো সাথে কথা বলা তো দূরের কথা। মনে হতো যেন বাসাতেই আছি। মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়ি, আশা ছেড়ে দেই। মুক্তির কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আপনাআপনিই একটা সমাধান উদয় হয় এসময়।

ওষুধের দোকানে দোকানে ঘুরে অনেকগুলো প্যারাসিটামল কিনি। ইচ্ছেকৃতভাবেই এক দোকান থেকে কয়েক পাতার বেশি নেইনি, কেউ হয়তো সন্দেহ করবে এই ভয়ে। কিন্তু সন্দেহটা অমূলকই ছিল বলতে গেলে, কেউ একবারের বেশি দু'বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেনি আমার দিকে। যেন সম্পূর্ণ অদৃশ্য

একটা মানুষ আমি, অস্তিত্বহীন।

নিজের ঘরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভেতরেই কাঁপা কাঁপা হাতে প্যারাসিটামলগুলো প্যাকেট থেকে বের করি। অতগুলো ট্যাবলেট গিলতে অবশ্য বেশ কষ্ট হয়, তবুও জোর করে একটার পর একটা মুখে পুরতেই থাকি। এরপর বিছানায় উঠে পড়ে চোখ বুজে অপেক্ষা করি আসন্ন মৃত্যুর।

কিন্তু মৃত্যুও আমার ধারে-কাছে ঘেঁষেনি।

বরং প্রচণ্ড পেট ব্যথায় কুঁকড়ে উঠি কিছুক্ষণ বাদেই। বমির সাথে পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আধ-গলা ট্যাবলেটগুলো। সেই অবস্থাতেই অন্ধকারে শুয়ে থাকি, পেটের ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে। একসময় মনে হয় যেন অনন্তকাল কেটে গেছে। এরপর ধীরে ধীরে একটা জিনিস পরিষ্কার হয় আমার কাছে। বোধোদয় বলা যেতে পারে ব্যাপারটাকে।

মৃত্যু আসলে কাম্য ছিল না আমার। আসলে, আমি তো তখন অবধি ঠিকভাবে জীবন শুরুই করিনি।

একটা আশার সঞ্চার হয় ভেতরে ভেতরে। আর সেই আশা থেকেই উপলব্ধি করি যে সাহায্য দরকার আমার।

রুথের বেশে সাহায্যটা উপস্থিত হয় আমার জীবনে। রুথ একজন সাইকোথেরাপিস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সেলিং ইউনিট থেকে তার খোঁজ পাই। শুভ্র চলের রুথের আচার ব্যবহারে অভিভাবকসুলভ একটা ভাব ছিল। দাদী-নানিদের কাছ থেকে যেরকম আন্তরিকতা পাওয়া যায়, সেরকম। সহমর্মীতায় মোড়া তার হাসিটা দেখলেই স্বস্তিবোধ করতাম। ভরসা করতে ইচ্ছে হতো। প্রথমে অবশ্য খুব বেশি কথা বলতো না সে। আমিই বলতাম যা বলার, রুথ চুপ করে শুনে যেত। আমার বলা কথাগুলো পীড়াদায়ক হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে কিছুই অনুভব করতাম না। যেন অন্য কারো গল্প বলছি, অনুভূতির সাথে যাবতীয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বেদনাদায়ক স্মৃতি বা আত্মঘাতী চিন্তাভাবনার ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করতাম ঠিকই, কিন্তু সেগুলো কোন প্রভাব ফেলতে না আমার মানসচিন্তে।

মাঝে মাঝে কথা বলার সময়ে রুথের চেহারার দিকে তাকাতাম। অবাক হয়ে খেয়াল করতাম যে তার চোখে কোণায় পানি জমেছে আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে। হয়তো অবিশ্বাস্য শোনাবে-কিন্তু চোখের পানিগুলো আদতে তার ছিল না,

ছিল আমার।

সেই সময়ে অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু থেরাপি এভাবেই কাজ করে। অব্যক্ত অনুভূতিগুলোর ব্যাপারে সবকিছু থেরাপিস্টকে খুলে বলে রোগি, যে অনুভূতিগুলোর মুখোমুখি হতে এতদিন ভয় পেয়ে এসেছে। তার হয়ে সেগুলো অনুভব করার দায়িত্ব থেরাপিস্টের। এরপর ধীরে ধীরে অনুভূতিগুলো আবারো রোগিকে ফিরিয়ে দেয় সে। রুথ আর আমার ক্ষেত্রেও অমনটা ঘটেছিল।

কয়েক বছর তার কাছে নিয়মিত যাতায়াত করি আমি। সেই সময়টুকুতে জীবনের অনেক কিছু বদলালেও রুথের সাথে দেখা করার বিষয়টা বদলায়নি। তার মাধ্যমে নতুন এক ধরনের সম্পর্ক অন্তরীণে সক্ষম হই, যে সম্পর্কটার ভিত্তি তৈরি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সততা এবং মায়া দিয়ে। ক্রোধ, সহিংসতা বা কোন অভিযোগের স্থান নেই সেখানে। নিজের ব্যাপারে ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে আমার অনুভূতিগুলো আর আগের মত ভয়ের উদ্বেক ঘটায় না। মাথার ভেতরে সেই কণ্ঠস্বরটার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে টের পেতাম, তবে তার বিপরীতে রুথের কণ্ঠস্বরও কানে বাজতো। ফলে সময়ের সাথে একসময় নির্বাক হয়ে যায় কণ্ঠস্বরটা। প্রশান্তি ভর করে আমার মনে।

সাইকোথেরাপি আসলেও আমার জীবন বাঁচিয়েছে। শুধু তাই নয়, জীবনটাকে পুরোপুরি বদলেও দিয়েছে। এভাবে নির্ভয়ে কথা বলার মাধ্যমেই নিজেকে খুঁজে পাই এক পর্যায়ে। যদি কেউ আমায় নিজেকে বিশ্লেষণ করতে বলে, তবে এই কথাই বলবো।

পেশা হিসেবে তাই সাইকোথেরাপিই যে বেছে নিয়েছি, এতে কেউ নিশ্চয়ই অবাক হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ব শেষ করে লন্ডনে সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণের গোটা সময়টা রুথের সাথে নিয়মিত দেখা করতাম। তার দিক থেকে উৎসাহের কোন কমতি ছিল না, তবে বাস্তবতাটাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেনি। “ছেলেখেলা নয় কিন্তু ব্যাপারটা।” ঠিকই বলেছিল ও, আমার রোগীদের সাথে কাজ করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাই।

প্রথম যেদিন সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে যাই, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। আমি সেখানে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে এক রোগি সবার সামনে প্যান্ট

খুলে মলত্যাগ শুরু করে। দুর্গন্ধে ছেয়ে যায় গোটা ঘরটা। সামনের দিনগুলোতে এরকম আরো ঘটনা ঘটে। আত্মহত্যার চেষ্টা, নিজের শরীরে কাটাকাটি, চিৎকার-চৈতামেচি-এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল এসব বুঝি সহ্য হবে না আমার। কিন্তু প্রতিবারই সহনশীলতার পরিচয় দেই আমি। ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসে সবকিছু।

সাইকিয়াট্রিক ইউনিটের আপাত অদ্ভুত জগতটার সাথে কত সহজে মানিয়ে নেয়া যায়, এটা ভাবলে অবাকই লাগে। দৈনন্দিন উন্মাদনার সাথে একসময় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় সবাই। শুধু রোগীদের উন্মাদনার কথা বলছি না কিন্তু, নিজের উন্মাদনাও বিবেচ্য এই ক্ষেত্রে। আমার বিশ্বাস আমরা সবাই কোন না কোনভাবে ব্যধিগ্রস্ত।

আর সেজনেই অ্যালিসিয়া বেরেনসনের সাথে নিজেকে মেলাতে কষ্ট হয় না। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যে কি না তরুণ বয়সে সাইকোথেরাপির মাধ্যমে অন্ধকার অতীতকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। যদি সেরকমটা না হতো তাহলে আমাকেও হয়তো অ্যালিসিয়ার মতন কোন এক মানসিক হাসপাতালে বন্দি জীবন পার করতে হতো। ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহে সেরকমটা হয়নি।

পেশা হিসেবে সাইকোথেরাপি কেন বেছে নিলাম, ইন্দিরা শর্মার এই প্রশ্নের জবাবে অবশ্য এগুলো বলার কোন উপায় ছিল না। হাজার হলেও চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছি আমি। জানি, কী করতে হবে।

“সবশেষে আমি বলতে চাই, প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই একজন সাইকোথেরাপিস্ট তার আসল লক্ষ্য খুঁজে পায়। প্রাথমিক উদ্দেশ্যে যা-ই হোক না কেন।”

“হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। একদম ঠিক।” বিজ্ঞ ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন ইন্দিরা।

ইন্টারভিউটা খারাপ হয়নি। ব্রডমুরে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা বাড়তি সুবিধা হিসেবে কাজ করেছে আমার জন্যে। ইন্দিরা বলেন, মাত্রাতিরিক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীদের নিয়ে কাজ করা সম্ভব হবে আমার পক্ষে। কিছুক্ষণ বাদেই জানতে পারি যে চাকরিটা পেয়ে গেছি।

এর একমাস পর তল্লিতল্লা গুটিয়ে থোভের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই।

জানুয়ারির এক শীতল দিনে থোভে উপস্থিত হই আমি। বাইরে পাতাঝরা গাছগুলো কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ ধবধবে সাদা, কিছুক্ষণের মধ্যে তুষারপাত শুরু হবে।

প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বের করলাম। গত সাতদিন ধূমপান করিনি। নিজেকে নিজেই কথা দিয়েছিলাম যে সিগারেট ছেড়ে দেব। সেটা আর পারলাম কই। সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিলাম, নিজের ওপর বিরক্ত। সাইকোথেরাপিস্টরা এই ধূমপানের আসক্তিটা একটু বাঁকা চোখেই দেখে, একজন থেরাপিস্ট হিসেবে নিজেকে এই আসক্তি থেকে মুক্ত করা আমার কাজের ভেতরে পড়ে। চাকরির প্রথম দিনেই আমার মুখ থেকে যাতে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া না যায় সেজন্য একটা মিন্ট গাম চিবিয়ে নিলাম কিছুক্ষণ।

কিছুটা কাঁপছি আমি। যতটা না ঠাণ্ডায়, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায়। ব্রডমুরে আমার কনসালটেন্ট কোন রাখঢাক ছাড়াই মন্তব্য করেছিল, গ্রোভে যোগ দেয়াটা ভুল হচ্ছে আমার ক্যারিয়ারের জন্যে। তাছাড়া গ্রোভের পরিবেশ, বিশেষ করে প্রফেসর ডায়োমেডেসকে নিয়ে দৃশ্যতই বিরক্ত ছিল।

“লোকটা একটু কেমন যেন। গ্রুপ থেরাপি নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছেন। ফোকসের সাথেও কাজ করেছেন কিছুদিন। আশির দশকে হার্টফোর্ডশায়ারে বিকল্প ভেষজ চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক বিবেচনায়, বিশেষ করে এখনকার দিনে একেবারেই অচল...” এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর গলা নামিয়ে নেয় সে। “তোমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি না, থিও। কিন্তু গুজব কানে এসেছে যে জায়গাটা বন্ধ করে দেয়া হবে। হয়তো ছয় মাস পরেই তোমাকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে...এগুলো জানার পরেও সিদ্ধান্ত বদলাবে না?”

“না,” ভদ্রতার খাতিরে ইতস্ততের অভিনয় করে বললাম।

মাথা ঝাঁকায় কনসালটেন্ট। “নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত যেহেতু নিয়েই নিয়েছো...”।

তাকে অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ব্যাপারে কিছু বলিনি আমি। তার চিকিৎসার জন্যেই যে গ্রোভে যোগ দিচ্ছি এটা চেপে গিয়েছি ইচ্ছে করেই। হয়তো বুঝিয়ে বলতেও পারতাম। অ্যালিসিয়ার সাথে কাজ করলে ভবিষ্যতে ঘটনাটা নিয়ে বই লিখতে পারবো বা কোন জার্নালে পেপার পাব্লিশ হবে; তবুও দেখা যেত, আমার ভুল ধরছে সে। হয়তো ঠিকই বলছিল। কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারবো।

সিগারেট নিভিয়ে নিজেকে কিছুটা ধাতস্ত করে ভেতরে প্রবেশ করি।

এডগোয়ের হাসপাতালের সবচেয়ে পুরনো অংশটায় গ্রোভের অবস্থান। লাল

ইটে তৈরি ভিক্টোরিয়ান নকশার বিশাল মূল দালানটার বাইরে অনেক আগেই বাড়তি কিছু ভবন জুড়ে দেয়া হয়েছে। দ্য গ্রোভ এই বিশাল কমপ্লেক্সের একদম মাঝামাঝি। ভেতরের বাসিন্দারা যে খুব একটা সুবিধার নয় সেটা বোঝা যাবে বাইরের সারি সারি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে। রিসিপশনে অবশ্য চেষ্টা করা হয়েছে স্বাভাবিক একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার। নীল রঙের বড় কয়েকটা কাউচ আর দেয়ালে রোগীদের আঁকা কিছু ছবি শোভা পাচ্ছে সেখানে। সুরক্ষিত সাইকিয়াট্রিক ইউনিট তো নয়, যেন বাচ্চাদের কিভারগার্ডেন।

লম্বা একজন লোক উদয় হলো আমার পাশে। হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। নিজের নাম বলল ইউরি, গ্রোভের হেড সাইকিয়াট্রিক নার্স। “গ্রোভে আপনাকে স্বাগতম। দুঃখিত, আমি বাদে আর কেউ আসেনি আপনাকে স্বাগত জানাতে।”

ইউরির বয়স চল্লিশের কোঠায়, দেখতে শুনতে ভালোই, পেটানো শরীর। কালো চুল, গলার কাছে কলারের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ট্যাটু। তামাক আর আফটারশেভের কড়া গন্ধ নাকে এসে লাগলো। “সাত বছর আগে লাটভিয়া থেকে এখানে আসি আমি। তখন অবশ্য একদমই ইংরেজি জানতাম না, কিন্তু এক বছরের মধ্যে আয়ত্ত্ব করে ফেলি।”

“দারুণ।”

“আসলে ইংরেজি সহজ একটা ভাষা। লাটভিয়ানে কথা বলার চেষ্টা করলেই বুঝবেন।”

হেসে কোমড়ে ঝোলানো চাবির গোছার দিকে হাত বাড়ালো সে। সেখান থেকে এক সেট চাবি বের করে আমার হাতে দিল। “রুমগুলোর জন্যে এগুলো লাগবে আপনার আর ওয়ার্ডে প্রবেশের জন্যে কিছু কোড আছে।”

“অনেক চাবি তো এখানে। ব্রডমুরে এতগুলো নিয়ে ঘুরতে হতো না।”

“আসলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা জোরদার করা হয়েছে কদিন ধরে। বিশেষ করে স্টেফানি কাজে যোগ দেয়ার পর থেকে।”

“স্টেফানি কে?”

জবাবে কিছু না বলে রিসিপশন ডেস্কের পেছনের অফিস থেকে বেরিয়ে আসা একজনের দিকে ইশারা করলো ইউরি।

মাঝ চল্লিশের এক ক্যারিবিয়ান নারী, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। “আমি

স্টেফানি ক্লার্ক। থোভের ম্যানেজার।”

মুখে একটা কাষ্ঠল হাসি ঝুলিয়ে রেখে আমার সাথে করমর্দন করলো সে। মনে হচ্ছে যেন এখানে আমার উপস্থিতি তার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

“এই ইউনিটের ম্যানেজার হিসেবে নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন ছাড় দিতে রাজি নই আমি। রোগি আর স্টাফ, দুই পক্ষকে নিরাপদ রাখাই আমার দায়িত্ব।” আমার হাতে একটা ছোট যন্ত্র ধরিয়ে দিল সে-পার্সোনাল অ্যাটাক অ্যালার্ম। “এটা সবসময় সাথে সাথে রাখবেন। মনে থাকে যেন।”

জি, ম্যাডাম, বলা থেকে খুব কষ্ট করে আটকালাম নিজেকে। স্টেফানিকে সন্তুষ্ট রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এর আগেও কঠোর ওয়ার্ড ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে এই পন্থা অবলম্বন করেছি, এমন কিছু করা যাবে না যাতে তারা বিরাগভজন হয়।

“আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্টেফানি।” মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে রেখেছি আগে থেকেই।

জবাবে স্টেফানি অবশ্য হাসলো না। “ইউরি আপনাকে আপনার অফিস দেখিয়ে দিবে।” হনহন করে সেখান থেকে চলে গেল সে।

“আসুন আমার সাথে,” বলল ইউরি।

তার পেছন পেছন ওয়ার্ডের প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটা বড় স্টিলের তৈরি দরজা। ওটার পাশেই মেটাল ডিটেক্টর হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন সিকিউরিটি গার্ড।

আমার দিকে তাকালো ইউরি। “আপনার নিশ্চয়ই নিয়ম কানুন জানাই আছে। ধারালো বা এমন কোনকিছু নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।”

“লাইটারও নেয়া যাবে না।” পকেট হাতড়ে আমার লাইটারটা বের করে নিল গার্ড।

“দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম ওটার কথা।”

ওর পেছন পেছন যাবার ইশার করলো ইউরি। “আপনার অফিস দেখিয়ে দেই, চলুন। অন্য সবাই কম্যুনিটি মিটিংয়ে গেছে, তাই এত চুপচাপ।”

“আমিও যাবো?”

“মিটিংয়ে?” অবাক মনে হলো ইউরিকে। “আগে একটু গুছিয়ে নিন সবকিছু,

নাকি?”

“আর গুছিয়ে নেয়ার কি আছে? পরে সময় দিতে পারবেন না?”

কাঁধ ঝাঁকালো ইউরি। “আপনার যেমনটা ইচ্ছে। চলুন তাহলে।”

বেশ কয়েকবার করিডোর বদলে আর তালা দেয়া দরজা খোলা-বন্ধের পর উপস্থিত হলাম গন্তব্যে। খুব বেশি পরিচর্যার যে বালাই নেই, তা স্পষ্ট। পলেন্স্তারা খসে পড়ছে জায়গায় জায়গায়, চুনকাম উঠে গেছে অনেক আগেই। বাতাসে শেওলার গন্ধ।

“ভেতরেই আছে সবাই,” বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল ইউরি।

“ঠিক আছে, ধন্যবাদ।”

এক মুহূর্তে থেমে নিজেকে তৈরি করে নিলাম। এরপর দরজা ঠেলে পা রাখলাম ভেতরে।

লম্বা একটা ঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কম্যুনিটি মিটিং। ঘরটার জানালায় জেলখানার মত পুরু গারদ। বাইরে লাল ইটের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। কফির ঘ্রাণ পেলাম (ইউরির আফটার শেভের গন্ধ ছাপিয়ে খুব কম ঘ্রাণই অবশ্য নাক অবধি পৌঁছুতে পারছে)। ভেতরে জনা তিরিশেক মানুষ গোল হয়ে বসে আছে। বেশিরভাগেরই হাতে চা অথবা কফির কাপ, খানিক পরপর হাই তুলছে ঢুলুঢুলু চোখে। যাদের কফি খাওয়া শেষ তারা হাতের কাপটা নাড়াচাড়া করছে অথবা সেটা দিয়ে বিভিন্ন নকশা করার চেষ্টা করছে।

সাধারণত গ্রোভের মত মানসিক স্বাস্থ্যের ইনস্টিটিউটগুলোয় দিনে এক দু’বার সকলে এভাবে দেখা করে। এটাকে মিটিংও বলতে পারেন, আবার গ্রুপ থেরাপি সেশনও বলতে পারেন। ইউনিটের যাবতীয় কার্যক্রম অথবা রোগীদের বিষয়াদি নিয়েও বিস্তারিত আলাপ হয় এখানে। প্রফেসর ডায়োমেডেসের ভাষায় রোগিরা নিজেদের চিকিৎসায় যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সচেতন হতে পারে, সেটারই একটা প্রচেষ্টা এই মিটিংগুলো। তবে প্রচেষ্টাটা যে সবসময় সফল হয়, তা বলা যাবে না। গ্রুপ থেরাপি বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুণ মি, ডায়োমেডেস বরাবরই মিটিং বা গ্রুপ ওয়ার্কের ভক্ত। নাটকের কুশীলবরা যেরকম মঞ্চের সামনে জড়ো হওয়া লোকদের উপস্থিতিতে কাজ করে মজা পায়, প্রফেসর ডায়োমেডেসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এমনকি আমাকে স্বাগত জানানোর

জন্যে তার উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যেও কিছুটা নাটুকেপনা খুঁজে পেলাম। হাত বাড়িয়ে আমাকে সামনে এগোনোর ইশারা করলেব তিনি।

“থিও। এসে পড়েছে তাহলে। বসো আমাদের সাথে।”

কথার ভঙ্গিতে খানিকটা গ্রিক টান, তবে সহজে ধরা যাবে না। ত্রিশ বছরের বেশি ইংল্যান্ডে থাকার কারণে টানটা হারিয়েই যেতে বসেছে। বয়স সত্তরের কোঠায় হলেও চেহারার সুদর্শন ভাবটা মুছে যায়নি। বরং কম বয়সি হাঁচড়েপাকা ছেলেমেয়েদের অভিব্যক্তির সাথে মিলে যায় তার অভিব্যক্তি। যেন সাইকিয়াট্রিস্ট নন, ভাগনে-ভাগ্নিদের পছন্দের মামা। তবে রোগীদের দেখাশোনার ব্যাপারে কিন্তু কোন গাফিলতি নেই তার, সকালে ইউনিটের ক্লিনারদের আগে চলে আসেন তিনি। এরপর নাইট শিফট চালু হবারও বেশ কিছুক্ষণ পর অবধি থাকেন, মাঝে মাঝে তো রাতটা অফিসের কাউচে শুয়েই কাটিয়ে দেন। দু’বারের ডিভোর্সি মি. ডায়োমেডেসের জন্যে থোভই সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

“এখানে বসো, নিজের পাশের খালি চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর।

“বসো, বসো, বসো।”

তার কথা অনুযায়ী বসে পড়লাম সেখানে।

বেশ আত্মহ নিয়ে আমাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ডায়োমেডেস।

“আমাদের নতুন সাইকোথেরাপিস্টের সাথে পরিচিত হও সবাই। থিও ফেবার! আমার মতন তোমরাও ওকে থোভ পরিবারে আপন করে”

ডায়োমেডেসের পরিচয় সম্ভাষণ চলার ফাঁকে আমার চোখ অ্যালিসিয়াকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কোথাও দেখলাম না তাকে। ঘরে একমাত্র প্রফেসর ডায়োমেডেসই স্যুট-টাই চাপিয়ে এসেছেন, বাকিদের পরনে হাফহাতা শার্ট বা গেঞ্জি। দেখে বোঝা মুশকিল যে কে রোগি আর কে স্টাফ।

কয়েকজন অবশ্য আমার পূর্বপরিচিত, যেমন-ক্রিস্টিয়ান। ব্রডমুরে থাকতে ওর সাথে পরিচয় হয়েছিল। চেহারায় রাগবি খেলোয়াড়দের মতন রুক্ষতা (আসলেও রাগবি প্লেয়ার ছিল সে), থেবড়ানো নাক আর মুখভর্তি দাড়ি। অনেকের চোখেই হয়তো তাকে সুদর্শন ঠেকবে। আমি ব্রডমুরে যোগ দেয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ওখান থেকে চলে আসে সে। ক্রিস্টিয়ানকে কখনোই খুব একটা ভালো লাগেনি আমার, তবে সত্যি কথা বলতে তার সাথে খুব বেশিদিন কাজও করিনি, তাই ঠিকমতো চিনি

এটাও বলা যাবে না।

ইন্টারভিউতে ইন্দিরার সাথে পরিচয় হয়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন একবার, গোটা দলটার মধ্যে একমাত্র তার আন্তরিকতার মধ্যেই কোন খাদ নেই। রোগীদের বেশিরভাগই চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। আসলে তাদের যে ধরনের শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তাতে এ ধরনের আচরণই কাম্য। আমাকে পুরোপুরি ভরসা করে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আরেকটা ব্যাপার, রোগীদের সবাই নারী। অনেকেরই শরীরের নানারকমের ক্ষতচিহ্ন। এটা স্পষ্ট যে থোভে আসার আগে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাদের। আর সেই যন্ত্রনা এতটাই প্রবল যে মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে পুরোপুরি। দুর্বিষহ অতীতের ছাপ তাদের প্রত্যেকের চেহারায় একদম পরিস্কার।

কিন্তু অ্যালিসিয়া বেরেনসন? সে কোথায়? আরো একবার ঘরে উপস্থিত সবার ওপরে নজর বুলালাম, কিন্তু খুঁজে পেলাম না তাকে। এরপর হঠাৎই আবিষ্কার করলাম যে আমার উল্টোদিকে বসে থাকা মানুষটাই অ্যালিসিয়া। এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

চিনতে পারিনি কারণ অন্যদের চেয়ে তাকে আলাদা করার কোন উপায় নেই।

চেয়ারে জুবুখুব হয়ে বসে আছে অ্যালিসিয়া। কড়া সিডেটিভ দেয়া হয়েছে তাকে, নিশ্চিত। হাতে চায়ের কাপ। অনবরত কাঁপুনির কারণে নিয়মিত বিরতিতে সেখান থেকে চা পড়ছে মেঝেতে। উঠে গিয়ে তার কাপটা সোজা করে দেয়া থেকে নিজেকে আটকালাম। পারিপার্শ্বিকের কোন ভ্রশই নেই তার। আমি যদি কাজটা করিও, কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না।

তার অবস্থা যে এতটা খারাপ হবে তা ধারণা করিনি। আগের সৌন্দর্যের কিছুটা ছাপ অবশ্য এখনও বিদ্যমান। গাঢ় নীল চোখ, নিখুঁত গড়নের চেহারা। তবে সেগুলো ছাপিয়ে চোখে পড়বে এলোমেলো লাল, নোংরা চুল। হাতের নখগুলো বারবার চিবোনের কারণে বিশ্রী দেখাচ্ছে। দু কজির ক্ষতচিহ্নগুলো প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। অ্যালসেসিস্টিস ছবিটায় এই ক্ষতদুটো একদম স্পষ্ট। এক মুহূর্তের জন্যেও থামছে না তার হাতের কাঁপুনি, সিডেটিভ ড্রাগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। নিশ্চয়ই রিস্পেরিডোন আর অন্যান্য অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। ভোলা

মুখের ভেতরে লাল জমে একাকার। এটাও ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

এসময় খেয়াল হলো, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ডায়োমেডেস। অ্যালিসিয়ার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার দিকে ফিরলাম। “আমার মনে হয় নিজের পরিচয় তুমি নিজেই সবচেয়ে ভালো করে দিতে পারবে, থিও।” মুখে মৃদু হাসি ফুটেছে তার। “কিছু বলবে না?”

“ধন্যবাদ,” মাথা নাড়লাম একবার। “আসলে নতুন করে খুব বেশি কিছু যোগ করবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এখানে যোগ দিতে পেরে খুশি আমি। সেই সাথে কিছুটা নার্ভাসও বটে। সবার সাথে ভালোমতো যাতে পরিচিত হতে পারি, বিশেষ করে রোগীদের সাথে-সেই চেষ্টা করবো। আমি-”

এসময় হঠাৎ শব্দ করে দরজা খুলে যাওয়ায় থেমে যেতে হলো আমাকে। প্রথমে ভাবলাম, উল্টোপাল্টা দেখছি। দুটো চোখা লাঠি নিয়ে বিশালদেহী এক দৈত্য ভেতরে প্রবেশ করেছে। হাত ওপরে তুলে ও দুটো সামনে ছুঁড়ে দিল সে। মনে হলো আমাদের গায়ের ওপরে এসে পড়বে, তবে শেষমেশ সেরকম কিছু ঘটলো না। চক্রের মাঝখানে এসে পড়লো লাঠিদুটো। চিৎকার করে উঠলো রোগীদের একজন। ভালোমতো খেয়াল করার পর বুঝতে পারলাম ওগুলো আসলে সাধারণ লাঠি নয়, বিলিয়ার্ড খেলার লম্বা ছড়িকেই ভেঙে দু’টুকরো করা হয়েছে।

বিশালদেহী মহিলা নিশ্চিত এখানকার রোগি। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে। তুর্কী। বয়স চল্লিশের আশপাশে। “রাগ লাগে আমার। গত এক সপ্তাহ ধরে এটা ভেঙে পড়ে আছে! কী বাল করেন আপনারা?”

“ভদ্রভাবে কথা বলো, এলিফ।” ডায়োমেডেসের কণ্ঠস্বর একদম স্বাভাবিক। “আগে আমরা আলাপ করবো, তোমাকে আদৌ এত দেরি করে কম্যুনিটি মিটিংয়ে যোগ দেয়ার অনুমতি দেব কি না সে বিষয়ে। এরপর বিলিয়ার্ডের পুল কিউ নিয়ে কথা বলা যাবে।” চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। “তোমার কি মনে হয় থিও?”

কিছুটা সময় নিলাম কথা বলার আগে। “সময়ানুবর্তিতা সবসময়ই জরুরি। তাছাড়া মিটিংয়ে সময়মতো আসলে-”

“যেমনটা তুমি এসেছো আজকে?” চক্রের অন্যপাশ থেকে একজন বলে উঠলো।

ক্রিস্টিয়ানের কণ্ঠস্বরটা চিনতে অসুবিধে হলো না আমার। নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠলো সে।

মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে এলিফের দিকে তাকালাম। “ঠিক বলেছে ও, আজ সকালে আমিও দেরি করে এসেছি। সুতরাং আমাদের দু’জনের জন্যেই একটা শিক্ষা হতে পারে গোটা বিষয়টা।”

“এসব কি বলছো?” এলিফ জিজ্ঞেস করলো। “আমাকে জ্ঞান দেয়ার তুমি কে?”

“এলিফ। ভদ্রভাবে কথা বলো,” আবারো বললেন ডায়োমেডেস। “আবারো তোমাকে টাইম-আউটে পাঠাতে বাধ্য করোনা আমকে। চুপচাপ বসো।”

দাঁড়িয়েই রইলো এলিফ। “আর পুল কিউটার কি হবে?”

প্রশ্নটা ডায়োমেডেসের উদ্দেশ্যে করা হলেও উত্তরের জন্যে আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর।

“এলিফ, আমি বুঝতে পারছি, আপনি লাঠিটা ভেঙে যাওয়ায় রেগে আছেন। তার চোখের দিকে তাকালাম। “লাঠিটা যে ভেঙেছে সে-ও নিশ্চয়ই কোন কারণে রেগে গিয়েছিল। এরকম একটা ইনস্টিটিউশনে রাগের ব্যাপারটা আমরা কিভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সামলাবো, সেটাই মুখ্য বিষয়। তাহলে এ মুহূর্তে আমরা রাগ নিয়ে কিছুক্ষণ। কথা বলি? বসুন, নাকি?”

বিরক্ত হলেও ঠিকই বসে পড়লো এলিফ।

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ইন্দিরা। এরপর রোগীদের সাথে রাগ বিষয়ে আলোচনা শুরু করলাম আমরা দুজন। তাদের প্রত্যেকের অনুভূতি নিয়ে আলাদা আলাদা কথা বললাম কিছুক্ষণ। দুজনের জুটিটা খারাপ হলো না। ডায়োমেডেস যে জল্পরি চোখে আমাকে যাচাই করছেন, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তাকেও সন্তুষ্টই মনে হলো।

একবার অ্যালিসিয়ার দিকে তাকালাম। অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে সে-ও আমাকেই দেখছে। নাহ, ভুল বললাম। আসলে আমি যেখান বসে আছি, তার দৃষ্টি সেদিকেই। নির্দিষ্ট কোনকিছুর প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত অবস্থায় এ মুহূর্তে নেই সে। চোখে বরাবরের মতনই শূন্য দৃষ্টি।

অ্যালিসিয়ার পরিচিত লোকেরা সবসময়ই বলে এসেছে, আগে কী রকম

চটপটে আর উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল সে। এখন কেউ যদি আমাকে এই হত্যোদম মানুষটাকে দেখিয়ে বলে যে তারা একই ব্যক্তি, তাহলে সেটা বিশ্বাস করাটা কষ্ট হবে বৈকি। গ্রোভে আসার সিদ্ধান্তটা একদম ঠিক ছিল, এটা সেই মুহূর্তেই পরিস্কার বুঝতে পারলাম। সব অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল। যত দ্রুত সম্ভব অ্যালিসিয়ার চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে।

সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। সত্যিকারের অ্যালিসিয়া হারিয়ে গেছে।
আর তাকে খুঁজে বের করবো আমি।

প্রফেসর ডায়োমেডেসের অফিসটা হাসপাতালের সবচেয়ে পুরনো এবং জরাজীর্ণ অংশে অবস্থিত। কোণায় কোণায় ঝুল আর মাকড়সার জাল। করিডোরের দুটো বাতি কোনমতে জ্বলছে কেবল। দরজায় ঠকঠক করার কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

“ভেতরে এসো।”

হাতল ঘোরাতে শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। ধক করে প্রথমেই নাকে এসে লাগলো ভেতরের অদ্ভুত গন্ধ। গোটা হাসপাতালের বাকি অংশের চাইতে একদম ভিন্ন। অ্যান্টিসেপ্টিক বা ব্লিচের ঘ্রাণের কোন বালাই নেই। বরং অর্কেস্ট্রা পিটে নানারকম বাদ্যযন্ত্রের মিশেলে যেরকম গন্ধ হয়, সেরকম। ভেতরের আধো অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে কিছুটা সময় লাগলো। বিশাল পিয়ানোটা দেখে থমকে গেলাম আবারো। আর যা-ই হোক, হাসপাতালে এ রকম কিছু আশা করিনি। বিশটারও বেশি মিউজিক স্ট্যান্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা ঘরটার আনাচে কানাচে। একটা টেবিলে গাদা করে রাখা হয়েছে স্বরলিপির কাগজ, আরেকটু হলেই সিলিং ছোঁবে। অন্য টেবিলটায় শোভা পাচ্ছে ভায়োলিন, ওবো আর একটা বাঁশি। সেগুলোর পাশে কাঠের ফ্রেমের বিশাল হার্পটা আসলেও দর্শনীয়।

মুখ হা করে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।

হেসে উঠলেন ডায়োমেডেস। “বাদ্যযন্ত্রগুলো দেখে খুব অবাক হয়েছে, না?”
ডেকের পেছনে বসে আছেন প্রফেসর।

“এগুলো সব আপনার?”

“হ্যাঁ। সঙ্গিত আমার শখ বলতে পারো। নাহ, শখ না, নেশা।” নাটকীয় ভঙ্গিতে

একবার বাতাসে হাত নাড়লেন তিনি। এটা যে তার একটা অভ্যাস, তা বুঝে গেছি। অর্কেস্ট্রার পরিচালক যেরকম হাত নাড়ে, ঠিক তেমনি যে কোন কথা সহজভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে অঙ্গভঙ্গির সহায়তা নেন ডায়োমেডেস। “একটা শখের সংগীতের দল আছে আমার, যে কেউ যোগ দিতে পারে দলটায়। স্টাফ, রোগি সবার জন্যে দরজা খোলা। সঙ্গিত হচ্ছে চিকিৎসার সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার,” এটুকু বলে থামলেন প্রফেসর, পরক্ষণেই গানের সুরে বলেন, “সবচেয়ে হিংস্র প্রাণীটাকেও শান্ত করে তুলতে পারে সঙ্গিত, কি বলো?”

“ঠিক বলেছেন।”

“ভূম।” আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ডায়োমেডেস। “পারো নাকি?”

“কি পারি?”

“কোন কিছু বাজাতে?”

মাথা কাঁকালাম। “সঙ্গিত বিষয়ে বিশেষ ‘অজ্ঞ’ আমি। ছোটবেলায় স্কুলে থাকতে কয়েকদিন রেকর্ডার বাজিয়ে দেখেছিলাম, ওটুকুই।”

“তাহলে তো স্বরলিপি পড়তে পারো? সেটাও কম কি। ভালো। যে কোন একটা বাদ্যযন্ত্র বেছে নাও, আমি বাজানো শেখাবো তোমাকে।”

হেসে আবারো মাথা কাঁকালাম। “আসলে আমার ধৈর্য্য একদমই

“তাই নাকি? সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে ধৈর্য্যের কোন কমতি থাকলে কিন্তু চলবে না। জানো, তরুণ বয়সে আমি অনিশ্চয়তায় ভুগতাম যে পেশা হিসেবে কোনটা বেছে নেবো। সংগীতশিল্পী, ধর্মযাজক নাকি ডাক্তার?” আবারো হাসলেন ডায়োমেডেস। “আর এখন দেখো, একইসাথে তিনটা কাজই করছে।”

“তা বটে।”

“তুমি জানো”-মহতের মধ্যে কথার বিষয়বস্তু পাল্টে ফেললেন তিনি- “ইন্টারভিউয়ের পর থোভে তোমাকে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা কিন্তু আমারই ছিল। তোমার পক্ষে বেশ শক্তভাবেই কথা বলেছিলাম। কেন জানো? বলতে সমস্যা নেই-তোমার মধ্যে নিজের ছায়া খুঁজে পেয়েছি আমি, থিও। কে জানে, হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যাবে থোভ তুমিই পরিচালনা করছে।” একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। “যদি ততদিন টেকে আরকি প্রতিষ্ঠানটা।”

“আপনার সন্দেহ আছে সে ব্যাপারে?”

“রোগির সংখ্যা খুব একটা বেশি না। সে তুলনায় স্টাফ প্রচুর। ট্রাস্টের সাথে মিলে আমরা চেষ্টা করছি খরচ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার। বুঝতে পারছো কি বলছি? সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয় আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ। এরকম পরিস্থিতিতে কি আর চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, বলো? উইনিকট একটা কথা বলেছিল না? যে ভবনের লোকেরা নিজেরাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত, তারা কিভাবে অন্যের সাহায্য করবে?” ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডায়োমেডেস, হঠাৎই যেন বয়স বেড়ে গেছে তার। এরপর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মতন ফিসফিসিয়ে বললেন। “আমার ধারণা ইউনিট ম্যানেজার স্টেফানি ক্লার্ক থোভ বন্ধ করে দেয়ার পক্ষে। ট্রাস্ট থেকেই কিন্তু বেতন দেয়া হয় তাকে। খেয়াল করলে তুমি নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।”

কেন যেন মনে হলো প্রফেসর ডায়োমেডেস একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করছেন ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু তিনি যে অবস্থানে আছেন, এরকমটা হতেই পারে। ইচ্ছে করেই চুপ থাকলাম কিছুক্ষণ, ভুল কিছু বলে তার মেজাজ বিগড়ে দিতে চাচ্ছি না। একটু পর মুখ খুললাম।

“অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন ছিল আমার।”

“অ্যালিসিয়া বেরেনসন?” অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ডায়োমেডেস।
“ওর ব্যাপারে কি?”

“তাকে কিরকম থেরাপি দেয়া হচ্ছে সেসম্পর্কে কৌতূহলী আমি। আলাদা করে থেরাপি দেয়া হয় তাকে?”

“না”

“কোন কারণ আছে?”

“সেই চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সন্তোষজনক ফলাফল না পাওয়ায় বন্ধ করে দেয়া হয়।”

“কেন? কে দেখতো ওকে? ইন্দিরা?”

“না।” মাথা ঝাঁকালেন ডায়োমেডেস। “আমি নিজেই দেখতাম অ্যালিসিয়াকে।”

“ওহ আচ্ছা। কি হয়েছিল?”

উদাসীন ভঙ্গিতে কাধ নাড়লেন প্রফেসর। “আমার অফিসে আসতো না সে, তাই বাধ্য হয়ে আমিই তার রুমে যাই। গোটা সেশনের পুরোটা সময় কিছু না বলে বিছানায় বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। কথা তো বলেইনি, একবারের

জন্যে আমার দিকে তাকায়ওনি।” হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন তিনি। একসময় মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই সময় নষ্ট।”

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। “আচ্ছা, এমনটাও তো হতে পারে “কি?” কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ডায়োমেডেস। “নির্দিধায় বলো।”

“এটাও তো হতে পারে যে অ্যালিসিয়া হয়তো শৈশবের কোন চরিত্রের সাথে আপনার মিল খুঁজে পেয়েছে। এমন কোন চরিত্র যার সামনে মুখ খুলতে ভয় পেতো সে। বাবার সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল, এটা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু...”

মুখে ছোট একটা হাসি একে আমার কথা শুনছেন ডায়োমেডেস, যেন কৌতুকের মজার অংশটা শোনা অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে যে তুলনামূলক কম বয়সি কারো সামনে হয়তো মুখ খুলবে সে? যেমন...তুমি? তোমার ধারণা তুমি ওকে সাহায্য করতে পারবে, থিও? ওকে এই দশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে? আবারো কথা বলাতে পারবে?”

“উদ্ধার করতে পারবে কি না সেটা ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু তাকে আসলেও সাহায্য করতে চাই আমি। অন্তত সেই চেষ্টাটুকু করার সুযোগ পেলে ভালো হতো।”

মুখের হাসিটা এখনও অটুট আছে ডায়োমেডেসের। “তুমিই প্রথম ওকে সুস্থ করার স্বপ্ন দেখোনি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি হয়তো পারবো, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। অ্যালিসিয়াকে একটা নির্বাক মৎসকুমারীর সাথে তুলনা করা যায়। তাকে দেখে সব দক্ষ সাইকোথেরাপিস্টরা ছুটে আসবে সাহায্য করার আশায়।” আবারো শব্দ করে হাসলেন প্রফেসর। “ব্যর্থতার বিষয়ে এই বয়সে আমাকে বেশ কঠিন একটা শিক্ষা দিয়েছে ও। তোমারও হয়তো সেই শিক্ষাটা দরকার।”

দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম না ইচ্ছে করেই। “যদি আমি সফল হই, তাহলে কিন্তু শিক্ষাটা পেতে হবে না।”

এবারে হাসিটা মুছে গেল ডায়োমেডেসের মুখ থেকে। এখন তার মনে কি চলছে, সেটা বোঝা মুশকিল। চুপ থাকলেন কিছু সময়, এর মাঝে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

“তাহলে দেখা যাক কি হয়, নাকি? আগে অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করো। তার সাথে তো বোধহয় পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি তোমাকে?”

“না, এখন অবধি হয়নি।”

“ইউরির সাথে এ ব্যাপারে কথা বলল। আমাকে পরে রিপোর্ট দেবে।”

“ঠিক আছে,” উত্তেজনা চেপে বললাম। “দেব।”

থেরাপি রুমটা তুলনামূলক ছোট, আয়তাকার। জেলখানার কক্ষের মতনই আসবাবপত্রের বালাই নেই। জানালাটাও বন্ধ, খিল দেয়া। ছোট একটা টেবিলের ওপর গোলাপী রঙের টিস্যুবক্স, নিশ্চয়ই ইন্দিরার কাজ। ক্রিস্টিয়ানের মধ্যে ওর রোগীদের টিস্যু দেয়ার সৌজন্যবোধটুকু আছে বলে মনে হয় না।

রুমের প্রাচীন, রঙ উঠে যাওয়া চেয়ার দুটোর একটায় বসে পড়লাম আমি। সময় পার হচ্ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু অ্যালিসিয়ার দেখা নেই। বোধহয় আসবে না সে, কে জানে? আমার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মানা করে দেয়ার পূর্ণ অধিকার তার আছে অবশ্য।

কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে পারলাম না বেশিক্ষণ। নার্ভাস লাগছে ভেতরে ভেতরে। উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়লাম। ধলোমাখা কাঁচ ভেদ করে কোনমতে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়।

মূল চত্বরটা আরো তিন তলা নিচে; একটা টেনিস কোর্টের সমান, চারপাশে লাল ইটের দেয়াল। বেশ উঁচু হওয়াতে দেয়াল টপকানো সম্ভব হবে না ভেতরের অধিবাসীদের পক্ষে। তবে কেউ না কেউ তো চেষ্টা করেছিলই নিশ্চয়ই। রোগীদের প্রতিদিন বিকেলে ত্রিশ মিনিট বাইরের খোলা হাওয়ায় সময় কাটানোর সুযোগ দেয়া হয়। ইচ্ছে থাকুক আর না থাকুক, বের হতেই হবে। তবে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে কেউ যদি বের না হতে চায়, তবে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। কেউ একা দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে, আবার কেউ অপ্রকৃতিস্থের মতন ইতস্তত পায়চারি করছে চত্বরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা অবধি। যাদের অবস্থা তুলনামূলক ভালো, তারা একসাথে জড়ো হয়ে সিগারেট ফুকছে আর আড্ডা দিচ্ছে। তাদের কণ্ঠস্বর আর হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

এবারেও প্রথম দর্শনে অ্যালিসিয়াকে খুঁজে পেলাম না। কিছুক্ষণ খোঁজার পর খেয়াল করলাম চত্বরের একদম কোণার দিকে দেয়াল ঘেঁষে একা দাঁড়িয়ে আছে সে। দেখে মনে হচ্ছে পাথর কুঁদে তৈরি কোন মূর্তি। এসময় ইউরিকে দেখলাম তার দিকে এগিয়ে যেতে। পাশেই দাঁড়ানো নার্সের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল সে। নার্স

অনুমতি দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লে ধীর পদক্ষেপে অ্যালিসিয়ার দিকে এগিয়ে গেল লাটভিয়ান লোকটা।

আমি ওকে বলে দিয়েছি অ্যালিসিয়াকে খুব বেশি কিছু না বলতে। শুধু এটুকু জানালেই চলবে যে নতুন সাইকোথেরাপিস্ট তার সাথে দেখা করতে চেয়েছে। ইউরিকে বিশেষভাবে বলেছি, কথাটা যেন অনুরোধের সুরে বলে। কোন প্রকার জোর-জবরদস্তির প্রশ্নই আসে না। অ্যালিসিয়াকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না যে কেউ ওর সাথে কথা বলছে এটা বুঝতে পারছে। আগের মতনই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করে ইউরি।

আসবে না তাহলে। ধুর, আগেই ভাবা উচিত ছিল ব্যাপারটা। সময় নষ্ট হলো শুধু শুধু।

ঠিক তখনই আমাকে অবাক করে দিয়ে সামনে এগোলো অ্যালিসিয়া। একবার হোঁচট খেয়ে থমকে গেল কিছুক্ষণের জন্যে, তবে হাঁটা থামালো না। একসময় আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল দু'জন।

তাহলে আসছে সে। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করেছি এতদিন। মাথার ভেতরে সেই অশরীরি কণ্ঠস্বরটা শুনতে পাচ্ছি আবারো, পাত্তা দিলাম না।

কয়েক মিনিট পর দরজায় ঠকঠক করলো কেউ।

“ভেতরে আসুন।”

খুলে গেল দরজাটা। ইউরির সাথে করিডোরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালিসিয়া।

“এসেছে।” উজ্জল হেসে বলল ইউরি।

“হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো, অ্যালিসিয়া।”

কোন জবাব পেলাম না।

“ভেতরে আসবেন না?”

ইউরি তাকে ভেতরে ঢোকানোর ইশারা করলো, তবে গায়ে হাত দিল না একবারের জন্যেও। বরং ফিসফিসিয়ে বলল, “যাও, ভেতরে গিয়ে বসো।”

দ্বিধায় ভুগছে অ্যালিসিয়া। এবারে মাথা তুলে তাকালো ইউরির দিকে। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে প্রবেশ করলো ভেতরে। চুপচাপ খালি

চেয়ারটায় এসে বসে পড়লো। যেন ভীতু একটা বিড়ালছানা। কোলের ওপরে রাখা হাতদুটো কাঁপছে।

দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হলেও ইউরি চৌকাঠ থেকে সরলো না। “যেতে পারেন এখন, বাকিটুকু আমি সামলাতে পারবো,” নিচু স্বরে বললাম।

ইউরির চেহারায় স্পষ্ট উদ্ভিগ্নতা। কারো সাথে একা থাকাটা আসলে নিরাপদ নয় ওর জন্যে। আর প্রফেসর বলে দিয়েছেন যে-”

“সমস্যা নেই, সব দায়ভার আমার।” পকেট থেকে পার্সোনাল অ্যাটাক অ্যালার্মটা বের করে দেখালাম। “এটাও আছে সাথে, তবে লাগবে বলে মনে হয় না।”

অ্যালিসিয়ার দিকে তাকালাম। দেখে মনে হচ্ছে না যে আমাদের কথা কানে যাচ্ছে তার।

কাধ ঝাঁকালো ইউরি। খুব একটা খুশি হয়নি বোঝাই যাচ্ছে। “আমি তাহলে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি, যদি হঠাৎ দরকার হয় কোন...”

“সেটার কোন প্রয়োজন দেখছি না, ধন্যবাদ।”

ইউরি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অ্যালার্মটা ডেস্কে রেখে বসে পড়লাম অ্যালিসিয়ার উল্টো দিকের চেয়ারটায়। মাথা তুলল না সে। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। বরাবরের মতনই অভিব্যক্তিহীন চেহারা। হতে পারে যে গোটাটাই একটা মুখোশ। সেক্ষেত্রে মুখোশের নিচে কি আছে কে জানে।

“আমি অনেক খুশি হয়েছি, আপনি আমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন।” উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ, যদিও জানি যে কিছু বলবে না। আমার ব্যাপারে আপনি যতটা না জানেন, তার থেকে আমি আপনার ব্যাপারে অনেক বেশি জানি। এটাই স্বাভাবিক। একজন স্বনামধন্য চিত্রশিল্পীর ব্যাপারে লোকে তো জানবেই। আমি আপনার কাজের ভক্ত।” এবারেও কোন প্রতিক্রিয়া পেলাম না। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম। “প্রফেসর ডায়োমেডেসকে আপনার সাথে দেখা করার ব্যাপারে বলেছিলাম, তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রাজি হবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।”

আশা করেছিলাম হয়তো সামান্য মাথা নাড়বে সে কিংবা চোখ তুলে তাকাবে, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। এবারে কিছুটা দ্বিধা চেপে বসলো আমার চিত্তে। তার

মাথায় কি চলছে তা ভাবার চেষ্টা করলাম। হয়তো এত কড়া ঔষধের কারণে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না কিছু।

আমার পুরনো থেরাপিস্ট, রুথের কথা মনে হলো এসময়। এরকম পরিস্থিতিতে সে কি করতে? সবসময়ই সে বলে এসেছে যে খারাপ-ভালোর মিশেলেই তৈরি আমরা। সুস্থ একজন মানুষের একইসাথে ভালো এবং খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা আছে। কিন্তু যারা মানসিক সমস্যায় ভোগে তারা এই সামঞ্জস্যতাটুকু রক্ষায় অক্ষম। নিজের অপ্রীতিকর দিকগুলোর ব্যাপারে তাদের মস্তিষ্ক কিছু ভাবতে চায় না। এক ধরনের ডিফেন্স মেকানিজম বলা যায় ব্যাপারটা। অ্যালিসিয়াকে যদি আমি সাহায্য করতে চাই, তাহলে সে অবচেতন মনে নিজের কাছ থেকে যে ব্যাপারগুলো লুকোচ্ছে তা খুঁজে বের করতে হবে। একমাত্র তখনই সেই রাতে ঠিক কি ঘটেছিল সেটা জানা যেতে পারে। তবে কাজটা সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন।

সাধারণত নতুন কোন রোগির সাথে কাজ করা শুরু করলে আমাদের মধ্যে কোন তাড়াহুড়ো থাকে না। ঠিক কোন উপায়ে চিকিৎসার কাজ করবো, সেসম্পর্কেও আগে থেকে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে এগোই না। কারণ হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে। তখন একে অপরের সাথে কথা বলি আমরা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অ্যালিসিয়া নিজ থেকেই আমাকে তার ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলতো। শৈশব কিরকম কেটেছে, তার বাবা-মা'র ব্যবহার কেমন ছিল-এসব। সব শোনার পর মনে মনে একটা ছবি দাঁড় করাতাম আমি, সমস্যাটা অনুধাবনের চেষ্টা করতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয় কিছুতেই। এই মৌনতার মধ্যে থেকেই সব তথ্য যোগাড়ের চেষ্টা করতে হবে আমাকে। সাইকোথেরাপির একটা পদ্ধতি হচ্ছে কাউন্টার ট্রান্সফিয়ারেন্স। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন কথা বা কাজের প্রেক্ষিতে রোগির অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করে থেরাপিস্ট। আমাকেও হয়তো সেরকমটা করতে হতে পারে।

মোদা কথা, অ্যালিসিয়াকে আসলে কিভাবে সাহায্য করবো সেটা ঠিক না করেই নৌকায় পা দিয়ে দিয়েছি। এখন যে কোন উপায়ে সফল হতেই হবে আমাকে। শুধু যে ডায়োমেডেসের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে চাইছি, তা নয় কিন্তু একদম মন থেকে অ্যালিসিয়াকে সাহায্য করতে চাই আমি।

উল্টোদিকে ওকে এভাবে ঢুলুঢুলু চোখে, ঔষধের ঘোরে স্থাগুর মত বসে থাকতে

দেখে হঠাৎই গভীর বিষণ্ণতায় ছেয়ে উঠলো মন। ওর মত এরকম পরিস্থিতিতে যারা আছে, তাদের সবার জন্যে খারাপ লাগছে ভীষণ। তারাও তো আমাদের মতনই মানুষ।

তবে মনে মনে এসব ভাবলেও মুখে কিছু বললাম না। বরং আমার জায়গায় রুথ থাকলে যে কাজটা করতো, সেটাই করলাম।

চুপচাপ ঘরটায় বসে রইলাম দুজনে।

ডেস্কের ওপর রাখা অ্যালিসিয়ার ফাইলটা খুললাম। ডায়োমেডেস নিজ থেকেই দিয়েছে এটা। “আমার নোটগুলো অবশ্যই পড়ে নেবে। কাজে আসতে পারে।”

কিন্তু নোটগুলোয় নজর বুলানোর কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার; অ্যালিসিয়া সম্পর্কে তার কি ধারণা সেটা জেনে গিয়েছিলাম ততক্ষণে। আমার নিজের কি ধারণা তা জানা দরকার। তবুও ফাইলটা নিয়েছিলাম চুপচাপ।

“ধন্যবাদ। আসলেও কাজে দিবে এগুলো।”

আমার অফিসটা ছোট হলে বেশ গুছোনো। ভবনের শেষ মাথায়, ফায়ার এসকেপের পাশেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। একটা ছোট কালো পাখি জমে যাওয়া ঘাসের মধ্যেই ঠোকরা ঠুকরি করছে, তবে কিছু পাবে বলে মনে হয় না।

কেঁপে উঠলো আমার শরীর। ঘরটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। জানালার পাশের রেডিয়েটরটা নষ্ট। ইউরি বলেছে সে একবার চেষ্টা করে দেখবে যে ওটা ঠিক করা যায় কি না, কিন্তু স্টেফানিকে বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাতেও লাভ না হলে কম্যুনিটি মিটিংয়ে কথাটা পাড়তে হবে। এলিফের প্রতি হঠাই সহমর্মিতা জেগে উঠলো মনে, লাঠিটা ভেঙে যাওয়ায় তারও নিশ্চয়ই আমার মতনই অনুভূতি হয়েছে।

আনমনে অ্যালিসিয়ার ফাইলটা উল্টাচ্ছি, খুব বেশি কিছু পাবো এখান থেকে সেই আশা করছি না। আমার যা তথ্যের দরকার ছিল তার বেশিরভাগই অনলাইন ডাটাবেজ থেকে পেয়ে গেছি ইতোমধ্যে। কিন্তু ডায়োমেডেস এখনও আদিকালের মতন সবকিছু হাতে লিখতে পছন্দ করেন (স্টেফানির আপত্তি সত্ত্বেও)। আর সেজন্যেই এখন এই পেটমোটা ফাইলটা ওল্টাতে হচ্ছে আমাকে।

ডায়োমেডেসের নোটগুলোয় অ্যালিসিয়া সম্পর্কে তার নিজস্ব সেকেন্দ্রে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে বিস্তর। তবে সেগুলো পাত্তা না দিয়ে আমি নার্সদের লেখা রিপোর্টগুলোয় মনোযোগ দিলাম, এখান থেকে তার দৈনন্দিন জীবনের আচার-

ব্যবহার সম্পর্কে বেশ পরিস্কার ধারণা পাওয়া যাবে। তাই এ সংক্রান্ত সবগুলো তথ্য লক্ষ্য করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যে কাজটা করতে যাচ্ছি, আগে থেকে সে ব্যাপারে বিশদ ধারণা থাকলে কাজে সুবিধা হবে। নতুবা দেখা যাবে হুটহাট নতুন কোন তথ্য সামনে আসাতে চমকে গেছি।

তবে খুব বেশি কিছু জানতে পারলাম না। এখানে ভর্তি হবার পর অ্যালিসিয়া দু'বার কজিতে ছুরি চালানোর চেষ্টা করেছে। এছাড়া হাতে কাছে যা পেতো সেটা দিয়েই নিজের শরীরের ওপর অত্যাচার চালানোর চেষ্টা করতো। তাই প্রথম ছয় মাস সার্বক্ষণিক দু'জন নার্স তার দেখাশোনা করে। এক পর্যায়ে গিয়ে দুজনের বদলে একজন নার্স বরাদ্দ করা হয় অ্যালিসিয়ার জন্যে। থোভের অন্য রোগি বা স্টাফদের সাথে কখনো কথা বলেনি সে। দূরে দূরে থাকতো সবসময়। অন্যান্য রোগিরাও তাকে ঘাটায়নি। কেউ যখন কথার জবাবে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না বা নিজ থেকে কখনো কোন আলাপ কওে না, তখন তার অস্তিত্ব এক প্রকার ভুলেই যায় লোকে। সেরকমই অ্যালিসিয়ার উপস্থিতিও সবাই উপেক্ষা করতে শিখে যায় কিছুদিনের মধ্যে।

তবে একটা ঘটনা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। অ্যালিসিয়া থোভে ভর্তি হবার কয়েক সপ্তাহ পরে ক্যান্টিনে ঘটেছিল ঘটনাটা। এলিফের সিটে বসে পড়েছিল অ্যালিসিয়া, সেটা নিয়েই তাকে দোষারোপ শুরু করে তুর্কী মহিলা। ঠিক কি কারণে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত লেখা নেই, তবে পরিস্থিতি খুব দ্রুত নাগালের বাইরে চলে যায়। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে অ্যালিসিয়া, একটা প্লেট ভেঙে সেটার ধারালো অংশ দিয়ে আক্রমণ করে এলিফকে। আরেকটু হলেই গলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কোনমতে তাকে আটকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে আইসোলেশনে পাঠানো হয়।

ঠিক বলতে পারবো না, ঘটনাটা কেন আগ্রহোদ্দীপক মনে হলো আমার কাছে। শুধু মনে হচ্ছে, কিছু একটা গোলমাল আছে। এলিফকে সেদিনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কলম বের করলাম। এটা আমার বেশ পুরনো অভ্যাস। কাগজে কলমে কিছু না লেখা অবধি শান্তি পাই না। যে কোন ঘটনা সম্পর্কে কাগজে লেখার পরেই পরিস্কারভাবে ভাবতে পারি।

অ্যালিসিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আমার মন্তব্যগুলো টুকে রাখলাম। অ্যালিসিয়াকে সাহায্য করতে চাইলে আমার আগে তাকে বুঝতে হবে। গ্যাব্রিয়েলের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন ছিল সেটাও জানা প্রয়োজন। তাকে কি ভালোবাসত ও? নাকি ঘৃণা করতো? খুনের ঘটনাটা নিয়ে কিছু বলছে না কেন? এখন পর্যন্ত একটা প্রশ্নেরও উত্তর মেলেনি।

একটা শব্দ স্পষ্ট করে লিখে নিচে দাগ দিলাম : অ্যালসেসিস।

ছবিটার সাথে গোটা ঘটনার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে কোন, সেই সম্পর্কটা জানা গেলেই রহস্য উন্মোচন সহজ হয়ে যাবে। অ্যালিসিয়ার তরফ থেকে কিছু বলার বা ইঙ্গিত দেয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পেইন্টিংটা। কিন্তু ইঙ্গিতটা যে কি, সেটা ধরতে হবে আমাকে। লিখে রাখলাম যে আরো একবার গ্যালারিতে যাবো ছবিটা দেখার জন্যে।

আরেকটা শব্দ আলাদা করে লিখলাম একপাশে : শৈশব। গ্যাব্রিয়েল কেন খুন হয়েছে সেটা জানতে হলে শুধু সেই রাতে কি ঘটেছিল তা বের করলেই হবে না, অ্যালিসিয়ার অতীত সম্পর্কেও ঘাটাঘাটি করা প্রয়োজন। ঐ মুহূর্তে কেন স্বামীর ওপর গুলি চালিয়েছিল সে এর মূল প্রোথিত আছে অতীতে। কেন না একজন মানুষ হুট করে খুনে স্বভাবের হয়ে ওঠে না। ধীরে ধীরে তার ভেতরে বাসা বাঁধে ক্ষোভ। খুন সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। মানুষের শৈশব কেমন কেটেছে তার একটা প্রভাব আছে এর ওপরে।

যদি শৈশবে কেউ অত্যাচার বা অসাদাচরণের শিকার হয় তাহলে তার ভেতরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে জিঘাংসা। আর একটা পর্যায়ে এই জিঘাংসারই উদগিরণ ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোধে অন্ধ হয়ে ভুল মানুষের ক্ষতি করে বসি আমরা। এজন্যেই অ্যালিসিয়ার শৈশব কেমন কেটেছে সেটা জানাটা জরুরি। অ্যালিসিয়া যদি নিজে সেসম্পর্কে কিছু জানাতে না পারে, তাহলে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে যে খুনের ঘটনাটা ঘটার অনেক আগে থেকেই ভাল করে চেনে তাকে।

ফাইলে অ্যালিসিয়ার নিকটাত্মীয়ের নাম লেখা লিডিয়া রোজ। সম্পর্কে ওর খালা হন মহিলা। সড়ক দুর্ঘটনায় অ্যালিসিয়ার মা মারা গেলে লিডিয়াই তার দেখাশোনা করা। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে অ্যালিসিয়াও ছিল, তবে বেঁচে যায় সে। সেই বয়সের

একটা মেয়ের মানসিকতার ওপর এরকম একটা ঘটনা নিশ্চয়ই মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। আশা করি লিডিয়া এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে পারবেন।

লিডিয়া বাদে আরেকজন ব্যক্তির নাম পেলাম ফাইলে। ম্যাক্স বেরেনসন, অ্যালিসিয়ার আইনজীবী। ম্যাক্স হচ্ছে গ্যাব্রিয়েল বেরেনসনের বড় ভাই। অ্যালিসিয়া আর গ্যাব্রিয়েলের সম্পর্ক কেমন ছিল এটা নিশ্চয়ই সে বলতে পারবে। তবে আমার সামনে মুখ খুলতে রাজি হবে কি না কে জানে। একজন সাইকোথেরাপিস্ট হয়ে অ্যালিসিয়ার পরিবারের লোকজনের সাথে এভাবে অযাচিত কথা বলতে চাওয়াটা একটু অদ্ভুতই বটে। সচরাচর সাইকোথেরাপিস্টরা এমন কিছু করে না। ডায়োমেডেস অনুমতি দিবেন কি না সে নিয়েও সংশয় আছে। এর চেয়ে বরং তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করাই উত্তম।

অ্যালিসিয়ার জন্যে আমি নিয়মের বাইরে গিয়ে যা যা করেছি, তার সূচনা হয়েছিল এই ঘটনাটার মাধ্যমেই। সেখানেই থামা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যায়। ভাগ্যদেবী ইতোমধ্যে লিখে ফেলেছিলেন যে ভবিষ্যতে আমার জন্যে কি অপেক্ষা করছে, গ্রিক ট্রাজেডিগুলোর মতন।

ফোনের দিকে হাত বাড়ালাম। অ্যালিসিয়ার ফাইলে থেকে ম্যাক্সের নম্বরটা আগেই টুকে নিয়েছি। কয়েকবার রিং হবার পর ফোন ধরলো কেউ।

“এলিয়ট, ব্যারো এবং বেরেনসনের অফিস থেকে বলছি।” রিসিপশনিস্টের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা লেগেছে।

“মি, বেরেনসনকে দিন।”

“কার সাথে কথা বলছি সেটা জানতে পারি?”

“আমার নাম থিও ফেবার। গ্রোভের একজন সাইকোথেরাপিস্ট। মি. বেরেনসনের সাথে অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।”

জবাব আসতে এবারে কিছুটা সময় লাগলো। “ওহ, আচ্ছা। আসলে মি. বেরেনসন এই সপ্তাহটা আর অফিসে আসবেন না। এডিনবার্গে এক মক্কেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন। আপনার নম্বরটা জানিয়ে রাখুন, তিনি ফিরলে আমি বলবো যোগাযোগ করতে।”

নম্বর দিয়ে ফোন কেটে দিলাম।

এরপর ফোন দিলাম লিডিয়া রোজের নম্বরে।

একবার রিং হবার পরেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওপাশ থেকে। “হ্যাঁ? কি চাই?”

“মিস রোজ?”

“কে আপনি?”

“আপনার ভাগ্নি, অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে ফোন দিয়েছিলাম। আমি থোভের একজন সাইকোথে

“যত্নসব বালছাল।” কেটে গেল লাইন।

ঐ কুঁচকে ফেললাম।

পরিস্থিতি সুবিধের মনে হচ্ছে না।

সিগারেটের তেষ্ঠা পেয়েছে ভীষণ। থোভ থেকে বের হবার সময় কোট পকেট হাতড়ে আবিষ্কার করলাম যে প্যাকেটটা নেই।

“কিছু খুঁজছেন নাকি?”

ঘুরে তাকিয়ে দেখি ইউরি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার আসার কোন শব্দই পাইনি, তাই এভাবে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভড়কে গেলাম।

“নার্স স্টেশনে পেয়েছি।” মুখে দরাজ হাসি ঝুলিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা সামনে বাড়িয়ে দিল সে। “আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।”

“ধন্যবাদ।” একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম দেরি না করে। ইউরিকেও সাধলাম কিন্তু হেসে মানা করে করে দিল। “সিগারেটের নেশা নেই আমার। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ড্রিঙ্কসের প্রয়োজন। চলুন, বিয়ারের খরচ আমার।”

ইতস্তত করতে লাগলাম। সহকর্মীদের সাথে যতটা সম্ভব কম মেলামেশা করেই অভ্যস্ত আমি। তাছাড়া ইউরির সাথে আলাপচারিতা চালানোর মত বিষয়ও খুব বেশি নেই। কিন্তু থোভের অন্য যে কারো চাইতে অ্যালিসিয়া সম্পর্কে ইউরিই সবচেয়ে ভালো জানে। তাই তার মন্তব্য আমার কাজে আসতে পারে।

“চলুন তাহলে,” বললাম।

স্টেশনের কাছে অবস্থিত একটা পাবে গেলাম আমরা। পাবের নামটা অদ্ভুত, দ্য টান্ড ল্যান্ড। ভেতরটা আঁধারে আচ্ছন্ন, বেশ বয়স হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। পাবের অধিকাংশ কাস্টোমারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে সিটে বসে ঢুলছে অনেকে। ইউরি দুই ক্যান বিয়ার নিয়ে এলে পাবের একদম পেছনে গিয়ে বসলাম আমরা।

ক্যানে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে মুখ মুছলো ইউরি। “তারপর? অ্যালিসিয়া সম্পর্কে বলুন দেখি।”

“অ্যালিসিয়া?”

“কেমন বুঝলেন ওকে?”

“আসলে বুঝেছি কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই।”

ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্তি খেলে যায় ইউরির চোখে, পরমুহূর্তেই আবারো হেসে ওঠে। “সে বোধহয় চায় না যে কেউ তাকে বুঝুক, নাকি? ইচ্ছে করেই দেয়াল তুলে রেখেছে চারপাশে।”

“তার বেশ ঘনিষ্ঠ আপনি, বুঝতে পারছি।”

“ওর বিশেষ খেয়াল রাখার চেষ্টা করি। এখানে আমার চেয়ে ভালো করে অ্যালিসিয়াকে কেউ চেনে না, এমনকি প্রফেসর ডায়োমেডেসও না।”

ইউরির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন গর্ব। কিছুটা বিরক্ত হলাম ব্যাপারটায়। আসলেও ভালো করে চেনে কি না সে ব্যাপারে এখন সন্দেহ হচ্ছে।

“সে যে এখানে আসার পর থেকে কারো সাথে কোন বিষয়ে কথা বলেনি, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? কেন এই নীরবতা?”

কাঁধ ঝাঁকালো ইউরি। “এখনও বোধহয় কথা বলতে তৈরি নয় সে। যখন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে, তখন বলবে।”

“স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে মানে?”

“সত্যটা বলতে কোন সমস্যা থাকবে না যখন, বন্ধু।”

“আর সেই সত্যটা কি?”

একদিকে ঘাড় কাত করলে আমাকে কিছুক্ষণ দেখলো ইউরি। কিছুক্ষণ পর যে প্রশ্নটা করলো তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না।

“আপনি কি বিবাহিত, থিও?”

“হ্যাঁ,” মাথা নেড়ে বললাম।

“সেটাই ভেবেছিলাম। আমিও বিবাহিত ছিলাম এক সময়। লাটভিয়া। থেকে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছি। কিন্তু এখানে আসার পর আমি যেভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছি, সে পারেনি। চেষ্টাও করেনি আসলে। ইংরেজি শেখার ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না। যাইহোক, আমি নিজেও যে খুব খুশি ছিলাম, তা নয়। তবে সেটা

কখনো মুখ ফুটে স্বীকার করতাম না। নিজেকে নিজেই ভুলভাল বোঝাতাম...” বাকি বিয়ারটুকু এক চুমুকে খালি করে ফেললো সে। “কিন্তু একসময় সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান পাই।”

“আর সেটা নিশ্চয়ই অন্য কারো মধ্যে?”

হেসে মাথা নাড়লো ইউরি। “হ্যাঁ, আমাদের প্রতিবেশী এক মহিলা। খুব সুন্দরি। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যাই বলতে পারো,” আমাকে তুমি করে বলা শুরু দিয়েছে সে। বিরক্ত হলেও চেপে গেলাম। একদিন হঠাৎই রাস্তায় দেখি তাকে। এরপর প্রথমবার কথা বলার মত সাহস যোগাতে বেশ সময় লাগে। প্রায়ই অনুসরণ করতাম, দূর থেকে দেখতাম তার অগোচরে। আবার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, যাতে জানালায় আসলে দেখতে পাই তাকে।” হাসলো ইউরি।

গল্পটা আর ভালো ঠেকছে না এখন। অবশিষ্ট বিয়ারটুকু শেষ করে হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। আশা করছিলাম যে ইঙ্গিতটা ধরতে পারবে সে, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না।

“একদিন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি আমি। কিন্তু আমার প্রতি একদমই আগ্রহী ছিল না সে। এরপরেও আরো কয়েকবার চেষ্টা করি, শেষমেষ আমাকে জানিয়ে দেয় যাতে ওভাবে বিরক্ত না করি।”

মহিলাকে দোষ দেয়া যাবে না, ভাবলাম। আমিও কোন একটা অজুহাত দিয়ে উঠে যাবো শিঘ্রই। ইউরির কথা থামার কোন লক্ষণ নেই।

“ব্যাপারটা মেনে নিতে বেশ কষ্ট হয়। ধরেই নিয়েছিলাম যে সে আমার একদম আদর্শ জীবনসঙ্গি। হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যায়। প্রচণ্ড রাগ হয় তার প্রতি। ভয়াবহ রাগ।”

“এরপর?” না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

“কিছুই না।”

“কিছুই না? তোমার স্ত্রীর সাথেই সংসার করেছে এর পরে?”

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল ইউরি। “না। ওর প্রতি টানটুকু তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ মহিলার প্রেমে পড়ার আগ অবধি ব্যাপারটা মানতে পারতাম না। মাঝে মাঝে সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। সাহসও দরকার।”

“বুঝলাম। তোমার ধারণা অ্যালিসিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য? সে তার বিয়ের ব্যাপারে সত্যটা স্বীকার করে নিতে তৈরি নয় এখনও? হতেও পারে।”

কাঁধ ঝাঁকালো ইউরি। “এখন হাংগেরির একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক আমার। সবকিছু ঠিক থাকলে সামনে বিয়েও করবো। এক স্পা সেন্টারে চাকরি করে, ভালো ইংরেজি বলে। আমাদের জুটিটা একদম ঠিকঠাক। একসাথে ভালো সময় কাটাই।”

মাথা নেড়ে আবারো ঘড়ির দিকে তাকালাম। এবার আর কোটটা তুলে নিতে দ্বিধা করলাম না। “যেতে হবে এখন। আমার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে দেরি হয়ে যাবে নাহলে।”

“ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তোমার স্ত্রীর নামটা যেন কি?”

কোন একটা অদ্ভুত কারণে ইউরিকে নামটা বলতে ইচ্ছে করছে না। চাইনা যে ওর ব্যাপারে সে কিছু জানুক। কিন্তু এটা ছেলেমানুষী।

“ক্যাথরিন। ওর নাম ক্যাথরিন। কিন্তু আমি ক্যাথি বলে ডাকি।”

অদ্ভুত একটা হাসি ফোটে ইউরির মুখে। “একটা উপদেশ দেই, কিছু মনে করো না। বাড়িতে তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও। ক্যাথির কাছে, যে ভালোবাসে তোমাকে...আর অ্যালিসিয়াকে নিয়ে মাথা ঘামিও না।”

সাউথ ব্যাঙ্কের ন্যাশনাল থিয়েটার ক্যাফেতে গেলাম ক্যাথির সাথে দেখা করতে। রিহার্সেলের পর অভিনেতা অভিনেত্রীরা সাধারণত এখানেই সমবেত হয়ে আড্ডা দেয়। ক্যাফের একদম পেছনের দিকে কয়েকজন সহঅভিনেত্রীর সাথে গভীর আলোচনায় মত্ত সে। আমাকে এগোতে দেখে মুখ তুলে তাকালো সবাই।

“কান গরম হয়ে গেছে নাকি, ডার্লিং?” চুমু খেয়ে বলল ক্যাথি।

“কেন, গরম হবার কথা?”

“ওদের তোমার ব্যাপারে বলছিলেন।”

“ওহ। আমি আসি তাহলে?”

“বোকার মত কথা বোলো না তো। একদম ঠিক সময়ে এসেছে। আমাদের প্রথম দেখার ঘটনাটা বলা শুরু করেছি কেবলই।”

আমি বসার সাথে সাথে আবার গল্পে ফিরে গেল ক্যাথি। এই গল্পটা সবাইকে খুব আগ্রহ নিয়ে বলে সে। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে, আমিও যে গল্পটার অংশ সেটা বোঝানোর জন্যেই বোধহয়। তবে সত্যি বলতে গল্পটা

আগাগোড়াই ওর, আমার না।

“একদিন বারে বসে ছিলাম, এসময় জনাবের আগমন ঘটে সেখানে। স্বপ্নের মানুষটাকে খুঁজে পাবার সব আশা ততদিনে ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের লিখন, না যায় খণ্ডন। তবে দেরি করে হলেও সন্ধান তো পেয়েছিলাম, এই বা কম কি? বয়স পঁচিশ হবার আগেই বিয়ের শখ ছিল আমার, জানো? ত্রিশ বছরের মধ্যে দু’টা বাচ্চা হয়ে যাবে। এরপর সুখের সংসার। কিন্তু কিসের কি, তেত্রিশে পা দেয়ার পরেও সেই স্বপ্নের টিকিটিরও দেখা মেলেনি।” বলে অন্য সবার উদ্দেশ্যে একবার হাসলো ক্যাথি।

“যাইহোক, তখন ড্যানিয়েল নামের একটা অস্ট্রেলিয়ান ছেলের সাথে ইটিস পিটিস চলছে আমার। কিন্তু ওর খুব শিগগির বিয়ে বা বাচ্চা নেয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না। সুতরাং আমি এক প্রকার জানতাম যে সময় নষ্ট করছি। ওর সাথেই এক রাতে ঘুরতে বেরিয়েছি এসময় থিও’র দেখা পাই।” এবারে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায় ক্যাথি। “সাথে ওনার গার্লফ্রেন্ডও ছিল কিন্তু।”

গল্পের এই অংশটুকু বেশ সাবধানে বলতে হয় যাতে শ্রোতাদের কেউ ভুলভাল না বোঝে। হ্যাঁ, ক্যাথির সাথে যখন পরিচয় হয় তখন আমরা দু’জনই আলাদা আলাদা সম্পর্কে ছিলাম। এই তথ্যটা অনেকের জন্যে অস্বস্তিদায়ক। আমার তখনকার গার্লফ্রেন্ড আর ক্যাথির বয়ফ্রেন্ড একে ওপরকে কিভাবে যেন চিনতো, ঠিক মনে নেই। মূলত তারাই আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। যাইহোক, ক্যাথিকে প্রথমবার দেখেই হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায় আমার। যেন কেউ হাজার ভোল্টের শক দিয়েছে আমাকে। ওর ঘন কালো চুল, টানা টানা সবুজ চোখ, পাতলা ঠোঁট-মনে হচ্ছিল যেন এক দেবী নেমে এসেছিল মতে।

গল্পের এই পর্যায়ে রুটিন মারফিক একটা বিরতি দিয়ে আমার হাত ধরলো ক্যাথি। “তোমার মনে আছে, থিও? কোন প্রকার জড়তা ছাড়াই আলাপ শুরু করি আমরা। তুমি বলেছিলে যে সাইকোথেরাপিস্ট হবার জন্যে পড়ছে। আর আমি বলি যে আমার মত পাগলের জন্যে এরকম মানুষই দরকার।”

এই কথা শুনে হেসে উঠলো মেয়েরা। ক্যাথিও একবার হেসে আমার চোখের দিকে তাকালো। “একদম প্রথম দেখাতেই প্রেম, তাই না ডার্লিং?”

এবারে আমার পালা। মাথা নেড়ে সাই জানিয়ে ওর গালে চুমু খেলাম। “হ্যাঁ।

একদম সত্যিকারের ভালোবাসা।”

ওর বান্ধবীদের চোখেও সম্মতি দেখতে পেলাম। তবে সত্যি বলতে আমি কিন্তু অভিনয় করছি না, মন থেকেই বলেছি কথাটা। আসলেও প্রথম দেখায় একে অপরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। প্রেম না বলি কামনাও বলা যায় অবশ্য। ক্যাথির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। দূর থেকে বার বার ওকেই দেখছিলাম। এক পর্যায়ে বুঝতে পারি, ওর বয়স্ফেণ্ডের সাথে ঝগড়া করছে। কিছুক্ষণ পর হনহন করে বার ছেড়ে বেরিয়ে যায় ড্যানিয়েল।

“তোমাকে আজ বড্ড বেশি চুপচাপ লাগছে,” ম্যারিয়ান বলে আমার উদ্দেশ্যে।
“কি হয়েছে?”

“কিছু না।”

“চলো বাসায় যাই। আমি ক্লান্ত।”

“আরেকটু থাকি,” ওর কথা আসলে ঠিকমতো কানেও ঢুকছিল না আমার।
“আরেক রাউন্ড ড্রিস্ক নেই।”

“আমি এখনি বাসায় যাবো।”

“তাহলে যাও।”

আহত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় ম্যারিয়ান, কিন্তু কিছু বলে না। একটু পর জ্যাকেট তুলে নিয়ে চলে যায় বার থেকে। জানতাম যে পরদিন এ নিয়ে ঝগড়া হবে আমাদের মাঝে, কিন্তু তাতে আর কিছু যায় আসে না।

বার কাউন্টারে ক্যাথির পাশে গিয়ে দাঁড়িলাম। “ড্যানিয়েল কি ফিরবে?”

“না। ম্যারিয়ান?”

মাথা ঝাঁকানি আমি। “না। আরেকটা ড্রিস্ক নেবে নাকি?”

“হ্যাঁ।”

ড্রিস্কসের অর্ডার দিয়ে ওখানে দাঁড়িয়েই গল্প করতে শুরু করি আমরা। আমার সাইকোথেরাপি ট্রেনিং নিয়ে কথা বলি কিছুক্ষণ। ক্যাথির ওর নাট্যকলায় আগ্রহের ব্যাপারে বলে। এই বিষয়ে পড়াশোনাও করছে। প্রথম বর্ষে থাকাকালীন সময় থেকেই এক এজেন্টের সহায়তায় নিয়মিত মঞ্চনাটকে অভিনয় করে। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, সে আসলেও একজন ভালো অভিনেত্রী।

“পড়াশোনা করতে ভালো লাগতো না একদমই,” কথার এক পর্যায়ে বলে

ক্যাথি।

“তাহলে কী করতে ভালো লাগতো?”

“জীবনটাকে নিজের মত করে উপভোগ করতে।” ঘাড় কাত করে ক্যাথি। ওর গাঢ় সবুজ চোখজোড়ায় দুষ্টমি খেলা করছিল। “তো, থিও সাহেব, আপনার এত পড়াশোনার ধৈর্য্য এলো কোথা থেকে?”

“হয়তো জীবনটাকে এখনও ‘উপভোগ করার মত সাহস জোগাড় করে উঠতে পারিনি। কাপুরুষ আমি।”

“নাহ, কাপুরুষ হলে তো সুড়সুড় করে গার্লফ্রেন্ডের সাথে বাড়ি চলে যেতে,” এবারে ক্যাথির হাসিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত।

ইচ্ছে হচ্ছিলো ওকে শক্ত করে চেপে ধরে চুমু খাই। এর আগে কখনো কারো প্রতি এরকম কামনা অনুভব করিনি। আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করতে চাইছিলাম খুব করে।

“সরি,” হঠাৎই বলে ওঠে ক্যাথি। “আমার আসলে কথাটা বলা উচিত হয়নি। সবসময় মাথায় যা আসে বলে ফেলি। বলেছিলাম না, আমি আসলেও পাগল।”

ক্যাথির এই অভ্যাসটা এখনও আছে। কথায় কথায় নিজের পাগলামির দোহাই দেয়। ‘আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে’, ‘আস্ত পাগল আমি’। ওর মুখের হাসিটা একদম দিলখোলা। অবসাদ বা বিষণ্ণতায় ভোগা কারো হাসি এরকম হয়না। অন্তত তখন সেটাই মনে হয়েছিল আমার। একটা স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল ওর মধ্যে, হাসিখুশি মানুষের চারপাশে যেরকম একটা আভা থাকে-আশা করি বোঝাতে পারছি কথাটা। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্যেই ওর জন্ম। মুখে যা-ই বলুক ওর মতো ভালো মানসিক স্বাস্থ্য খুব কম মানুষেরই আছে। এমনকি ওর আশপাশে থাকলে আমার নিজেকেও স্বাভাবিক মনে হয়।

ক্যাথি আমেরিকান। বড় হয়েছে ম্যানহাটানের দক্ষিণে। ওর মা ব্রিটিশ হওয়ায় দুই দেশের নাগরিকত্বই পেয়েছিল। তবে সত্যি বলতে ব্রিটিশদের কোন গুণাবলীই ক্যাথির মধ্যে ছিল না। কথাবার্তা, চালচলন, জীবনদর্শন-সব ছিল ব্রিটিশদের বিপরীত। ওর মতন আত্মবিশ্বাসী আর প্রাণোচ্ছল কারো সাথে এর আগে পরিচয় হয়নি আমার।

বার থেকে বেরিয়ে একটা ক্যাব ডেকে সরাসরি আমার ফ্ল্যাটে চলে আসি

দু'জনে। আসার পথটুকু কোন কথা হয় না। বাসায় ঢোকান আগে আমার ঠোঁটে চুমু খায় ও। সব বাঁধ ভেঙে যায়, কাছে টেনে নেই ক্যাথিকে। কোন মতে পকেট থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটে পা দিয়েই দু'জনের ওপর হামলে পড়ি দু'জনে। মেতে উঠি নরনারীর সেই আদিম খেলায়।

ক্যাথির সাথে কাটানো সেই রাতটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা মুহূর্তগুলোর একটা। ওর শরীরের প্রতিটা বাঁক উপভোগ করেছিলাম। রাত পেরিয়ে যায় কিন্তু আমাদের ভালোবাসা শেষ হয়নি। সবকিছুতেই সাদার আধিক্য ছিল যেন সেদিন। সূর্যের আলো, দেয়াল, বিছানার চাদর, ওর চোখ, দাঁত-সব। কারো ত্বক যে এতটা দীপ্তিময় হতে পারে, এটা আগে জানতাম না। বারবার মনে হচ্ছে যেন কোন গ্রিক দেবীর মূর্তির মধ্যে প্রাণের সঞ্চারণ হয়েছে আমার হাতে।

একে অপরের বাহুডোরে কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম, জানি না। একদম কাছ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ক্যাথি। বারবার হারিয়ে যাচ্ছিলাম ওর সবুজ চোখের গভীরে।

“এখন?”

“এখন কি?”

“ম্যারিয়ানের কি হবে?”

“ম্যারিয়ান?”

“তোমার গার্লফ্রেন্ড।” মুখে হাসি ফোটে ক্যাথির।

“ওহ হ্যাঁ।” ইতস্তত করি কিছুক্ষণ। “আসলে জানি না আমি। ড্যানিয়েলের কি হবে?”

চোখ নাচায় ক্যাথি। “ওর কথা ভুলে যাও। আমি আর ওকে নিয়ে কিছু ভাবছি না।”

“আসলেই?”

জবাবে আমাকে চুমু খায় ক্যাথি।

যাবার আগে গোসল করতে টোকে সে। সেই সুযোগে ম্যারিয়ানকে ফোন দেই আমি। আমি চাচ্ছিলাম দেখা করে কথাটা ওকে বলতে। কিন্তু আগের রাতের ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি বিরক্ত ছিল সে, তাই যা বলার ফোনেই বলি। ম্যারিয়ান অবশ্য ভাবতে পারেনি যে ব্রেক-আপ করার জন্যে ফোন দিয়েছি আমি। কিন্তু সেটাই

করি আমি, যতটা ভদ্রভাবে সম্ভব। এক পর্যায়ে রাগে-দুঃখে কাঁদতে শুরু করে ও, আমি ফোন কেটে দেই। জানি, বড্ড বেশি নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে। সেদিনের সেই ফোনকলটা নিয়ে ভাবলে এখনও অস্বস্তিবোধ হয় আমার। কিন্তু এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারতাম, বলুন?

আমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক ডেটে কিউ গার্ডেনে দেখা করি ক্যাথির সাথে। ওর আইডিয়া ছিল পুরোটাই।

আমি যে ওখানে কখনো যাইনি, এটা শুনে যারপরনাই অবাক হয়েছিল। “এটা কি করে সম্ভব? কখনো গ্রিনহাউজগুলো দেখতে যাওনি? অর্কিড যেখানে রাখে সেখানটা একদম চুলোর মতন গরম। অভিনয়ের ক্লাস করার সময় শরীর গরমের জন্যে কিউ গার্ডেনে প্রায়ই যেতাম। তোমার কাজ শেষে ওখানে দেখা করলে কেমন হয়?” এরপরই অনিশ্চয়তা ভর করে ওর কণ্ঠে। “নাকি তোমার জন্যে বড় বেশি দূরে হয়ে যাবে?”

“তোমার জন্যে পৃথিবীর শেষ সীমানায় যেতে হলেও যাবো আমি, ক্যাথি।”

“গর্দভ।” ফোনেই একবার চুমু খেয়ে ফোন রেখে দেয় ও।

কিউ গার্ডেনে পৌঁছে দেখি গেটের বাইরে গায়ে বড় একটা কোট জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথি। গলায় স্কার্ফ। আমাকে দেখে বাচ্চাদের মতন হাত নাড়তে শুরু করে। আমার সাথে এসো।”

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শক্ত কাদার ওপর দিয়ে কাঁচের ঘরগুলোর দিকে আমাকে নিয়ে যায় ক্যাথি। নানারকমের গ্রীষ্মমন্ডলীয় গাছ চারদিকে। ভেতরে পা দেয়ার সাথে সাথে টের পাই যে তাপমাত্রা লাফ দিয়ে বেড়ে গেছে অনেকটা। স্কার্ফ আর কোট খুলে ফেলি দ্রুত।

“দেখেছো? বলেছিলাম না গরম লাগবে?” হাসি চওড়া হয় ক্যাথির মুখে।

হাত ধরাধরি করে গ্রীনহাউজের ভেতরে হাঁটি আমরা। ফুলগুলো আসলেও খুব সুন্দর ছিল।

ওর সাহচর্যে অদ্ভুত এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করছিলাম, এরকম অনুভূতির সাথে আগে পরিচয় ছিল না। মনে হয় যেন আমার ভেতরে একটা গোপন দরজা খুলে গেছে। আর সেই দরজা দিয়ে জাদুকরী, উষ্ণ এক জগতে নিয়ে এসেছে

ক্যাথি। চারদিকে রঙের স্ফুরণ।

সেই উষ্ণতার প্রভাবে আমার ভেতরে এতদিনের জমে থাকা আবেগের যে প্রস্ফুটন হচ্ছে, তা টের পাচ্ছিলাম। যেন দীর্ঘ শীতন্দ্ৰিা শেষে সূর্যের আলয় খোল থেকে মুখ বের করছে কোন কচ্ছপ। আমার জীবনটাকে নতুনভাবে সাজানোর পুরো কৃতিত্ব ক্যাথির।

এটাই সত্যিকারের ভালোবাসা, ভেবেছিলাম সেদিন। কোন সন্দেহই ছিল না ব্যাপারটায়। এর আগে কখনো এরকম অনুভূতি হয়নি আমার ভেতরে। ক্যাথির সাথে দেখা হবার আগ অবধি যতগুলো সম্পর্কে জড়িয়েছি, সবগুলোই ছিল সংক্ষিপ্ত। কোন তৃপ্তিও পাইনি সেগুলো থেকে। জীবনে প্রথমবার সেক্স করি কানাডিয়ান মেয়ে মেরেডিথের সাথে; বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। তবে বিছানায় যাবার আগে নার্ভ শক্ত রাখার জন্যে গলা অবধি মদ গিলেছিলাম। মেরেডিথের দাঁতের ব্রেসের কারণে চুমু খাবার সময় ঠোঁট কেটে গিয়েছিল আমার। এরপর আরো কয়েকজনের সাথে সম্পর্ক হয়, কিন্তু কারো প্রতিই সেরকম টান অনুভব করিনি। ভাবতাম, আমার মত মানুষের পক্ষে সত্যিকারের ভালবাসা খুঁজে পাওয়া বুঝি সম্ভব নয়। কিন্তু এখন প্রতিবার যখন ক্যাথির হাসি শুনি, ভালোলাগায় ছেয়ে ওঠে মন। ওর প্রফুল্লতায় ছুঁয়ে যায় আমাকেও। সেজন্যেই ওর সব আবদারে হ্যাঁ বলেছি সবসময়। নিজেকে নিজেই চিনতে পারতাম না মাঝে মাঝে। নতুন আমাকে নিয়ে অবশ্য কোন আক্ষেপও ছিল না। সুযোগ পেলেই সেক্স করতাম। ওর চারপাশে থাকার প্রতিটা মুহূর্ত কামনায় আচ্ছন্ন। থাকতো আমার শরীর। আর সেই ক্ষুধা মেটানোর একমাত্র উপায় ওর সংস্পর্শ।

সেবছর ডিসেম্বরে আমার এক বেডরুমের ফ্ল্যাটটায় উঠে পড়ে ক্যাথি। নিচতলায় অবস্থিত সে ফ্ল্যাটে জানালা থাকলেও বাইরে দেখার মত কোন দৃশ্য ছিলনা। সিদ্ধান্ত নেই যে আমাদের দুজনের একসাথে কাটানো প্রথম ক্রিসমাসটা ভালো করে উদযাপন করবো। একটা ক্রিসমাস ট্রি কিনে ফেলি মেট্রোরেল স্টেশনের পাশের স্টল থেকে। তারপর দুজন মিলে সাজাই।

সেই গাছটার তাজা সুবাস এখনও মনে আছে আমার। মোমের আলোয় জুলুজুলু চোখে আমার দিকে তাকায় ক্যাথি। সেই দৃষ্টির গভীরে যে কোন সময় হারিয়ে যেতে পারি আমি। “আমাকে বিয়ে করবে?” সাত-পাঁচ না ভেবেই বলে উঠি।

অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় ক্যাথি। “কি?”

“আমি তোমাকে ভালোবাসি, ক্যাথি। আমাকে বিয়ে করবে?”

মুখে হাসি ফোটে ক্যাথির। “হ্যাঁ।” এই একটা মাত্র শব্দ আমার ভেতরে যেরকম অনুভূতির সঞ্চার করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

পরদিন দোকানে গিয়ে ওর জন্যে একটা আঙুটি কিনে ফেলি। বাস্তবতাটুকু আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করি তখন। ক্যারি আমার বাগদত্তা।

অদ্ভুত হলেও এটা সত্যি, ওর হাতে আঙুটি পরানোর পর প্রথমেই মা বাবার কথা মনে হয়েছিল। ক্যাথিকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছিলাম। চাইছিলাম যে তারা দেখুক আমি কতটা সুখি। অবশেষে অতীতের শেকল ছিঁড়ে সামনে এগোতে সক্ষম হয়েছি। একদম মুক্ত। তাই সারের উদ্দেশ্যে একটা ট্রেনে চেপে বসি আমরা দুজনই। এখন বুঝি যে, গোড়া থেকেই বোকামি ছিল ব্যাপারটা।

বরাবরের মতনই আমাকে দেখে শীতল হয়ে যায় বাবার অভিব্যক্তি। “চেহারার এ কি দশা তোমার, থিও। একদম শুকিয়ে গেছো, চুল এত ছোট কেন? নেশাখোরদের মত লাগছে।”

“ধন্যবাদ বাবা। আশা করি তুমিও ভালো আছো।”

মা’কে গতানুগতিকের তুলনায় সেদিন আরো বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল সেদিন। আগের চেয়ে আরো চুপচাপ হয়ে গেছে। বাবার অসহিষ্ণু উপস্থিতি সে তুলনায় অনেক বেশি প্রবল, মনের ওপর চাপ ফেলে। শীতল দৃষ্টিটা একবারের জন্যেও ক্যাথির দিক থেকে সরায়নি সে। বড় বেশি অস্বস্তিকর পরিবেশে দুপুরের খাবার সারি সবাই। ক্যাথিকে পছন্দ হয়নি, ওদের। আমাকে সুখি দেখে তারা যে খুশী হবে, এটা কেনই বা আশা করেছিলাম কে জানে।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হলে বাবা তার স্টাডিরুমে চলে যায়। এরপর আর মুখ দেখায়নি। বিদায় জানানোর সময় আমাকে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিষ্কণ শক্ত করে জাপটে ধরে থাকে মা। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছিল না সে। পুরনো সেই বিষণ্ণতা আবারো জেঁকে বসে আমার চিত্তে। ক্যাথিকে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসি, বঝতে পারি যে আমার ভেতরের সেই সদা ভীত, দুর্বল সঙ্কটটা এখনও বাড়িটায় বন্দি। চিরকাল বন্দিই থাকবে। আশা হারিয়ে ফেলি, চোখের কোণায় বাঁধ ভাঙার অপেক্ষা করতে থাকে অশ্রু। এসময় বরাবরের মতনই আমাকে অবাক করে দেয়

ক্যাথি। হাত বাড়িয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। “বুঝতে পারছি,” কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে। “সব বুঝতে পারছি। আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি তোমাকে এখন।”

ভুট করে সেদিন এই কথাগুলো কেন বলেছিল এটা ব্যাখ্যা করেনি ক্যাথি। ব্যাখ্যার দরকারও ছিল না।

এপ্রিলে ইউস্টোন স্কয়ারের একটা রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করি আমরা। কারো বাবা মা ই আসেনি অনুষ্ঠানে। ক্যাথির অনুরোধে ধর্মীয় রীতিনীতিরও কোন বালাই ছিল না। তবে মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ঠিকই কৃতজ্ঞতা জানাই। তার জন্যেই এরকম হঠাৎ করে জীবনে সুখ নামের সোনার হরিণের দেখা পেয়েছি। তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হয়ে যায় একদম। শৈশবে সেই দুর্বিষহ সময়ে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি তিনি। গোটা সময়টা ক্যাথিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন সময়মতো ঠিকই দূত স্বরূপ ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

ওর সাথে কাটানো প্রতিটা মুহূর্তের জন্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি। ভাগ্য খুব ভালো বলেই এরকম ভালোবাসার সংস্পর্শ পেয়েছি। পৃথিবীতে এমন অনেকেই আছে যারা আমার মত ভাগ্যবান নয়। আমার বেশিরভাগ রোগীদের কেউ কখনো ভালোবাসেনি। অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ভাগ্যেও ভালোবাসা জোটেনি।

ক্যাথি আর অ্যালিসিয়া একদম আলাদা। ন্যূনতম মিলটুকুও নেই তাদের। ক্যাথিকে দেখলে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিকগুলোর কথা মনে হয় আমার-উজ্জ্বল হাসি, সম্পর্কের উষ্ণতা। আর অ্যালিসিয়ার কথা ভাবলা চোখের সামনে ফুটে ওঠে অন্ধকার, যেন বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি সে। মৌনতার প্রতিমূর্তি।

দ্বিতীয় পর্ব

অব্যক্ত অনুভূতিগুলো কখনো পুরোপুরি চাপা পড়ে না। মনের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে। জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তে বেরিয়ে এসে তছনছ করে দেয় সবকিছু।

-সিগমুন্ড ফ্রয়েড

অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ডায়েরি থেকে জুলাই ১৬

আমি কখনো ভাবিনি, বৃষ্টির আশায় এভাবে চাতক পাখির মত বসে থাকতে হবে আমাকে। তাপদাহের চতুর্থ সপ্তাহে এসে এখন আর টেকা যাচ্ছে না। দিন দিন বেড়ে চলেছে তাপমাত্রা। মনেই হচ্ছে না যে ইংল্যান্ডে আছি। যদি গ্রিস বা অন্য কোন গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশে থাকতাম, তাহলে অভিযোগ করতাম না।

আজ হ্যাম্পস্টেড হিথ পার্কে বসে লিখছি ডায়েরিতে। পুরো পার্কজুড়ে অর্ধনগ্ন মানুষের অবাধ বিচরণ, সৈকত বা যুদ্ধক্ষেত্র বলে ভুল হতে পারে প্রথম দর্শনে। যে যার মত বেঞ্চে বা ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে বসে আছে। আমি বড় দেখে একটা গাছের ছায়া খুঁজে নিয়েছি আগেভাগেই। ছ'টা বাজতে চললো, এখন তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। ডুবন্ত সূর্যের উজ্জ্বল লাল-সোনালী আলোয় পার্কটাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। ঘাসগুলো দেখে মনে। হচ্ছে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওগুলোর গায়ে।

এখানে আসার পথে পা থেকে স্যান্ডেল খুলে ফেলেছিলাম। ছোটবেলায় বাইরে খেলতে বেরুলে এরকমটা করতাম মাঝে মাঝে। হাঁটতে হাঁটতে এরকমই এক গ্রীষ্মের কথা মনে পড়ে গেল, মা মারা যায় সে বছর। বাইরে। বের হলে পল সবসময় আমার সাথে আসতো, দুজন একসাথে সাইকেল চালাতাম সোনালি মাঠে। চারপাশে বুনো ডেইজির মেলা। আমার স্মৃতিতে সেবারের গ্রীষ্মটা অমলিন। মার কথা মনে হলেই তার রঙিন পোশাকগুলোর ছবি স্মৃতির চোখে ফুটে ওঠে। টপসের ফিতাগুলো দেখে মনে হতো একদম নাজুক, ঠিক মা'র মতন। বড্ড বেশি চিকন ছিল সে। রেডিও ছেড়ে দিয়ে পপ গানের তালে তালে আমাকে নিয়ে নাচতো। তার শরীর থেকে যে শ্যাম্পু আর নিভিয়া ক্রিমের সুবাস আসতো, তা এখনও আমার

নাকে লেগে আছে। তবে এ দুটোর সাথে ভদকা আর সিগারেটের গন্ধও পেতাম। তার বয়স কত ছিল তখন? আটশ? উনত্রিশ? এখন আমার যে বয়স, তার থেকে কম।

একটু অদ্ভুত না ব্যাপারটা?

এখানে আসার সময় একটা ছোট পাখিকে রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখি, গাছের কোণ ঘেঁষে। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো বাসা থেকে কোন কারণে পড়ে গেছে। একদমই নড়ছিল না দেখে ভাবলাম পাখনা ভেঙে যেতে পারে। আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার পরেও যখন কিছু হলো না, তখন সাবধানে উল্টিয়ে দিলাম। দৃশ্যটা দেখে আরেকটু হলেই বমি হয়ে যেত। পাখিটার পেটের ভেতরে পোকা কিলবিল করছে। গা গুলিয়ে উঠেছিল।

এখনও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না দৃশ্যটা।

জুলাই ১৭

এই প্রচণ্ড গরমে বাধ্য হয়ে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফের ভেতরে আশ্রয় নিতে শুরু করেছি। ক্যাফে দি আরটিস্টা। ভেতরটা একদম কনকনে ঠাণ্ডা, মনে হয় যেন ফ্রিজের ভেতরে ঢুকে বসে আছি। প্রতিদিন জানালার পাশে নির্দিষ্ট একটা সিটে বসে আইস কফি খাই। মাঝে মাঝে কফি খাওয়ার পাশাপাশি বই পড়ি বা টুকটাক জিনিস নোট করি। ইচ্ছে হলে ছবিও আঁকি। তবে বেশিরভাগ সময়ই নিজের গরজে চলতে দেই মনটাকে, হারিয়ে যাই ভাবনায়। কাউন্টার স্ট্যান্ডের পেছনে বসে থাকা সুন্দরি মেয়েটা সারাক্ষণ একঘেয়ে ভঙ্গীতে ফোন গুঁতায়, মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকায় আর নিয়মিত বিরতিতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তবে গতকাল ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ও দেখে বুঝতে পারি যে আমার চলে যাওয়ার অপেক্ষা করছে সে, তাহলে দোকান বন্ধ করতে পারবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ি।

এই গরমে হাঁটা আর কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া একই কথা। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি। আমাদের শরীর অভ্যস্ত নয় এরকম আবহাওয়ার সাথে। তাছাড়া গ্যাব্রিয়েল আর আমার বাসায় এসিও নেই, আসলে এখানকার কারো বাসাতে যে এসির দরকার হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। কিন্তু ইদানীং গরমের চোটে রাতে ঘুমোতেও অসুবিধে হয়। গা থেকে চাদর ফেলে দিয়ে অন্ধকারে ঘর্মাক্ত, নগ্ন শরীরে শুয়ে থাকি। জানালা খোলা রেখেও কোন লাভ নেই, বাইরে একটা গাছের পাতাও

নড়ে না। শুধুই ভ্যাপসা গরম।

গতকাল একটা ইলেকট্রিক ফ্যান কিনেছি। রাতের বেলা সেটা বিছানার পায়ের দিকটাই বসিয়ে দেই।

গ্যাব্রিয়েল গাইগুই শুরু করে দেয় সাথে সাথে। “বড় বেশি শব্দ। আমাদের ঘুমই হবে না।”

“ঘুম না আসুক। অন্তত গরমে সিদ্ধ হতে হবে না।”

কিছুক্ষণ গজগজ করলেও আমার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে ও। কিন্তু আমার চোখে ঘুম আসে না, চুপচাপ শুয়ে ফ্যানের আওয়াজ শুনতে থাকি। খারাপ লাগে না কিন্তু শব্দটা। শব্দের তালে তালে একসময় আমিও হারিয়ে যাই ঘুমের দেশে।

বাড়ির ভেতরে সবখানে ফ্যানটাকে সাথে নিয়ে ঘুরি। আজ বিকালে বাগানের শেষ মাথায় আমার স্টুডিওতেও নিয়ে যাই। ওটা না থাকলে ভেতরে টিকতেই পারতাম না। তবুও কিছু আঁকা সম্ভব হয় না। এই গরমে কাজ করা যায় নাকি?

তবে একটা উপকার হয়। জিগুর ছবিটা নিয়ে কেন খচখচ করছিল মন, তা বুঝতে পারি। রঙ বা আঁকার ধরণে কোন সমস্যা নেই। মূল সমস্যাটা অন্য জায়গায়। ক্রুশবিদ্ধ লোকটার চেহারার সাথে জিগুর চেহারার কোন মিল নেই।

মিল আছে গ্যাব্রিয়েলের।

এত বড় একটা ব্যাপারে কিভাবে চোখ এড়িয়ে গেল বুঝলাম না। অবচেতন মনেই গ্যাব্রিয়েলের ছবি আঁকা শুরু করেছি। ওর চেহারা, ওর শরীর। অদ্ভুত না ব্যাপারটা? তবে এখন আর কিছু করার নেই, এভাবেই আঁকতে হবে। মাঝে মাঝে শিল্পই শিল্পীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আরেকটা ব্যাপার পরিস্কার হয়ে গেল, আগে থেকে একদম নির্দিষ্ট কোন আইডিয়ার ওপর ভিত্তি করে আমার পক্ষে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তাহলে ছবিতে কোন প্রাণ থাকে না। কিন্তু আমি যদি মনোযোগ দিয়ে নিজের মত করে আঁকতে থাকি, তাহলে আর কোন ঝামেলা হয় না। অদৃশ্য কোন শক্তি আমাকে পথে দেখিয়ে নিয়ে যায়। এমন কোথাও, যেখানটায় যাবার কথা আমি হয়তো কল্পনাও করিনি, কিন্তু সেখানে সবকিছু জীবন্ত, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর।

তবে অনিশ্চয়তাটুকু আমাকে ভোগায়। কি হতে যাচ্ছে সেটা না জানা থাকলে অস্বস্তি লাগে। আর সেজন্যেই আগে থেকে কিছু খসড়া স্কেচ একে রাখি, তবে খুব

একটা লাভ হয় না। স্কেচগুলো একদমই নিশ্চল লাগে দেখতে। সুতরাং চূড়ান্ত ফলাফল কি হবে সেটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করাই আমার জন্যে ভালো। এখন যেহেতু জেনেই গিয়েছি যে গ্যাব্রিয়েলের ছবি আঁকছি, তাহলে আবার শুরু করতে পারবো।

ওকে বলবো আমার জন্যে পোজ দিতে। শেষ কবে আমার পেইন্টিংয়ের জন্যে মডেল হয়েছিল, ভুলেই গেছি। আশা করি ও ছবির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে কিছু মনে করবে না।

মাঝেমধ্যে একটু অদ্ভুত আচরণ করে বসে গ্যাব্রিয়েল।

জুলাই ১৮

আজ সকালে হাঁটতে হাঁটতে ক্যামডেন মার্কেটে চলে গিয়েছিলাম। বেশ কয়েক বছর ওখানে পা পড়েনি আমার। শেষবার যাই গ্যাব্রিয়েলের তরুণ বয়সের স্মৃতি রোমন্থনে। বন্ধুদের সাথে ওখানে প্রায়ই আড্ডা দিত আর ড্রিঙ্ক করতো ও। মাঝে মাঝে নাকি পুরো রাত কাটিয়ে ভোরে বাসায় ফিরতো। আবার কাকডাকা ভোরে মার্কেটের সামনে জড়ো হয়ে দোকানিদের স্টল সাজানো দেখতো। অবশ্য আমার ধারণা স্টল সাজানোর দেখার চাইতে গাঁজার ডিলারের কাছ থেকে গাঁজা সংগ্রহ করার প্রতিই ওদের আগ্রহ ছিল বেশি। ক্যামডেন লেকের পাশে ব্রিজের ওদিকটায় মাদক বিক্রেতাদের আখড়া। আমি আর গ্যাব্রিয়েল যেবার যাই, তখন অবশ্য তাদের কেউ ছিল না। একটু হতাশাই মনে হয় ওকে। “চেনাই যায় না। পর্যটক আকর্ষণের জন্যে সবকিছু নষ্ট করে ফেলেছে।”

আজকে ইতস্তত হেঁটে বেড়াবার সময় ভাবছিলাম পরিবর্তন কার বেশি হয়েছে। গ্যাব্রিয়েল, নাকি মার্কেটটার? এখনও ষোল-সতেরো বছরের ছেলেমেয়েরা স্বপ্নবসনে ঘুরে বেড়ায় জায়গাটাতে। ছেলেদের পরনে শর্টস আর মেয়েদের বেশিরভাগেরই গায়ে বিকিনি টপস। গরমের চোটে সবার চেহারাই রক্তিম। তবে এই বয়সি ছেলেমেয়েদের সহজাত কামনা-লালসা একদম পরিষ্কার অনুভব করা যায়। জীবনকে উপভোগ করার অমিয় তাড়না। হঠাৎ করেই গ্যাব্রিয়েলকে কাছে পেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমার ওপরে ওর নগ্ন শরীর...শক্ত পা জোড়া চেপে ধরে আছে আমাকে...আর ভাবতে পারছিলাম না। সেক্সের সময় গ্যাব্রিয়েলের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায় সবসময়। ওকে নিজের ভেতরে অনুভব করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাটুকু ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমাদের সম্পর্কের এই অংশটুকু বরাবরই অপার্থিব

মনে হয়। পবিত্র।

এসব ভাবনার মাঝখানেই হঠাৎ আবিষ্কার করি যে এক ভবঘুরে ফুটপাথ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ফিতা দিয়ে কোন মতে বাঁধা তার ট্রাউজারটা, পায়ের জুতো টেপ দিয়ে আটকানো। গা ভর্তি ঘা, মুখটা একদম লাল হয়ে আছে। হঠাৎই লোকটার জন্যে বড় মায়া হয় আমার। সচরাচর এরকম পরিস্থিতিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়াই আমার অভ্যাস। কিন্তু আজকে পার্স থেকে খুচরো কিছু পয়সা বের করে তার সামনে রাখি। একবার মনে হয় আমার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলে উঠেছে সে, কিন্তু পরবর্তীতে টের পাই একা একাই কথা বলছে।

এরপর ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরি। আমাদের বাসাটা একটু উঁচু জায়গায় হওয়ায় ফেরার পথে বরাবরই কষ্ট বেশি হয়। কিন্তু আজকে রাস্তাটা গতানুগতিকের চেয়ে বেশি খাড়া মনে হচ্ছিলো। তার ওপর বিশ্রী গরম। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভবঘুরে লোকটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। করুণার পাশাপাশি মনের ভেতরে আরেকটা অনুভূতির উপস্থিতি টের পাই-ভয়। কিন্তু ভয়টা যে কিসের তা বলতে পারবো না। লোকটাকে তার মায়ের কোলে কল্পনা করছিলাম। মহিলা কি কখনো ভেবেছিল যে তার সন্তান এরকম মানবেতর জীবন যাপন করবে এক সময়? সারা শরীরে ময়লা মেখে নিজমনে বিড়বিড় করবে?

আমার মার কথা মনে হলো এসময়। তার মাথায় কি কোন সমস্যা ছিল? সেজন্যেই কাজটা করেছিল? আমাকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে স্বেচ্ছায় সরাসরি গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল সামনের লাল দেয়াল লক্ষ্য করে? তার হলুদ গাড়িটা বরাবরই পছন্দ ছিল আমার। তখন হলুদ রংটাকে প্রফুল্লতার প্রতীক মনে হতো। কিন্তু এখন যতবার হলুদ কিছু দেখি, মৃত্যুর কথা ভাবি।

কাজটা কেন করেছিল সে? এর উত্তর বোধহয় কখনোই পাবো না। একসময় ভাবতাম যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল মা, কিন্তু এখন মনে হয় আমাকে হত্যা করাই মূল উদ্দেশ্যে ছিল তার। আমিও তো ছিলাম গাড়িতে, তাই না? কিন্তু এই ভাবনাটা অমূলক। আমাকে কেন হত্যা করতে চাইবে সে?

হাঁটতে হাঁটতেই চোখের কোণে পানি জমে আমার। আসলে মার জন্যে কাঁদছিলাম না। এমনকি আমার নিজের জন্যে বা ঐ ভবঘুরে লোকটার জন্যেও না। আসলে কাঁদছিলাম আমাদের সবার জন্যে। খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাটা? চারদিকে

এত কষ্ট, অথচ আমরা কিছু না দেখার ভান করি। সত্যটা হচ্ছে, আমরা সবাই ভীতু। নিজেকে ভয় পাই আমি। আমার ভেতরে থাকা মায়ের ছায়াটাকে ভয় পাই। পাগলামি কি আমার রক্তে? আমিও কি তার মতন

না। আর কিছু লেখা যাবে না এই বিষয়ে।

নিজেকে কথা দিয়েছিলাম যে ডায়েরিতে এসব ব্যাপারে কিছু লেখবো না।

জুলাই ২০

গত রাতে আমি আর গ্যাব্রিয়েল বাইরে খেতে গিয়েছিলাম। প্রতি শুক্রবারেই সাধারণত এই কাজ করি আমরা। গ্যাব্রিয়েল মজা করে আমেরিকানদের মত ‘ডেট নাইট’ বলে ব্যাপারটাকে।

ওর মধ্যে এই ব্যাপারটা আছে। আবেগী যে কোন কিছু নিয়ে ঠাট্টা করবে। নিজেকে আবেগহীন আর শক্ত মনের ভাবতে পছন্দ করে ও। কিন্তু সত্যি বলতে ভেতরে ভেতরে দারুণ রোমান্টিক একটা ছেলে গ্যাব্রিয়েল। তবে সেটা তার কাজে বোঝা যায়, কথায় নয়। গ্যাব্রিয়েলের কর্মকাণ্ডে আমার প্রতি ওর ভালোবাসাটুকু টের পাই।

“কোথায় যেতে চাও?” জিজ্ঞেস করি।

“বলো দেখি কোথায় যেতে চাই, তিনটা সুযোগ দিলাম।”

“অগাস্টোস?”

“বাহ, একবারেই পেরেছে।”

অগাস্টোস হচ্ছে আমাদের এখানকার স্থানীয় ইতালিয়ান রেস্টোরাঁ। সেরকম আহামরি কোন জায়গা না, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল আর আমার অনেক পছন্দের। অনেকগুলো সন্ধ্যা সেখানে একসাথে কাটিয়েছি আমরা।

আটটা নাগাদ পৌঁছে যাই। এসি কাজ করছিল না তাই ঠাণ্ডা ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে জানালার পাশের টেবিলটায় বসি। ডিনার শেষ হতে হতে উল্টোপাল্টা বকা শুরু করি বেশি ওয়াইন গেলার ফলে। অল্পতেই হেসে উঠছিলাম বাচ্চাদের মতন। রেস্টোরাঁ থেকে বের হয়েই একজন আরেকজনকে চেপে ধরে চুমু খাই আর বাসায় এসে সেক্স করি।

এ কদিনে ফ্যানটার সাথে মানিয়ে নিয়েছে গ্যাব্রিয়েল। অন্তত বিছানায় থাকার সময় কিছু বলে না। ফ্যানটা পায়ের কাছে বসিয়ে শীতল হাওয়ায় নগ্ন শরীরে ওর

বাহুড়োরে শুয়ে থাকি। ‘আই লাভ ইউ’-কিছুক্ষণ পর আমার কপালে চুমু খেয়ে ফিসফিসিয়ে বলে গ্যাব্রিয়েল। জবাবে আমি কিছু বলিনি, বলার দরকারও নেই। ও জানে আমার মনের কথা।

কিন্তু ছবি আঁকার জন্যে মডেল হতে বলে সুন্দর মুহূর্তটার গায়ে পানি ঢেলে দেই আমি।

“তোমার ছবি আঁকবো।”

“আবার? ঐকৈছো তো।”

“সেই চারবছর আগে। আবারো আঁকতে চাই।”

“ওহ।” খুব একটা উৎসাহী মনে হয় না ওকে। “কী রকম ছবি আঁকবে?”

এক মুহূর্ত দ্বিধাবোধ করে জিশুর ছবিটার ব্যাপারে বলি! শুনে উঠে বসে গ্যাব্রিয়েল। মুখের হাসিটা যে জোর করে আনা সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

“কী যে বলল না।”

“কেন? কী হয়েছে?”

“আমার মনে হয় না এই আইডিয়াটা ভালো।”

“ভালো না হবার কী আছে?”

“দ্রুশবিদ্ধ অবস্থায় আমাকে দেখে লোকে কী বলবে?”

“লোকে কি বলবে সেটা নিয়ে তুমি পরোয়া করা শুরু করলে কবে থেকে?”

“কিছু ব্যাপারে পরোয়া না করলে চলে না। ওরা হয়তো ভাববে, আমাকে এরকমটা দেখতেই পছন্দ করো তুমি।”

হেসে উঠেছিলাম। “তোমাকে কেউ জিশু ভাববে না, এসব ভেবো না। শুধুই একটা ছবি। অবচেতন মনেই তোমাকে আঁকা শুরু করেছিলাম, জানো? সাতপাঁচ ভাবিনি।”

“হয়তো ভাবা উচিত।”

“কেন? ছবিটা দ্বারা তো আমি তোমাকে নিয়ে বা আমাদের বিয়ে সম্পর্কে কিছু বোঝাতে চাচ্ছি না।”

“তাহলে কি বোঝাতে চাচ্ছে?”

“সেটা আমি কি করে বলবো?”

এই কথা শুনে হেসে ফেলে গ্যাব্রিয়েল। “আচ্ছা বাবা, ঐকো! এত করে চাইছো

যখন তোমার কাজের ওপর ভরসা আছে আমার ।

কথাটা হয়তো একটু প্রাণহীন ঠেকতে পারে, কিন্তু আমি জানি যে আমার আর আমার ছবি আঁকার প্রতিভার ওপর বিশ্বাস আছে গ্যাব্রিয়েলের । ও না থাকলে আমি কখনোই পেইন্টার হতে পারতাম না । ও যদি আমাকে বারবার উৎসাহ না দিত তাহলে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই দমে যেতাম । দেখা যেত এখনও জিন-ফিলিক্সের সাথে দেয়ালে দেয়ালে ছবি এঁকে বেড়াচ্ছি । গ্যাব্রিয়েলের সাথে দেখা হবার আগে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, আর সেই সাথে নিজেকে । সেই সময়ের নেশাখোর বন্ধুদের প্রতি কোন টান কাজ করে না আমার । শুধুমাত্র রাতেই দেখা পাওয়া যেত ওদের, দিনের বেলা উধাও হয়ে যেত বাদুড়দের মতন ।

গ্যাব্রিয়েল আমার জীবনে আসার পর ওরা ব্রাত্য হয়ে পড়ে, সে নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথাও ছিল না । আসলে এরকম একজন মানুষকে পেলে আর কাউকে দরকার হয় না । আমাকে ভুল পথ থেকে আলোর পথে এনেছে গ্যাব্রিয়েল, জিশুর মতন । এজন্যেই বোধহয় ছবিতে ওর চেহারাই ফুটিয়ে তুলেছি আনমনে । গ্যাব্রিয়েলই আমার জীবন, আমাদের দেখা হবার একদম প্রথম দিন থেকেই । ও যা-ই করুক বা যা-ই বলুক না কেন, ওকে সবসময় ভালোবেসে যাবো আমি । সবসময় । ও যেমন, সেভাবেই ওকে আপন করে

একমাত্র মৃত্যুর আমাদের আলাদা করতে পারবে ।

জুলাই ২১

আজকে গ্যাব্রিয়েল স্টুডিওতে আমাকে সময় দিয়েছে ।

“দিনের পর দিন কিন্তু এভাবে বসে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে,” বলে সে ।

“কতদিন লাগতে পারে?”

“এক-দুই দিনে হবে না, এটা নিশ্চিত ।”

“গোটাটাই তোমার আমাকে কাছে পাবার চক্রান্ত নয় তো? সেক্ষেত্রে এসব ধনফুন বাদ দিয়ে বিছানায় চলো ।”

হেসে ফেললাম । “দাঁড়াও, আগে কাজ শেষ করি । যদি ভদ্র ছেলের মত চুপচাপ বসে থাকো, তাহলে পুরস্কার পাবে ।

গ্যাব্রিয়েলকে ফ্যানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম । বাতাসে ওর চুলগুলো

উড়ছিল।

“কেমন পোজ দেব?”

“কোন পোজ দেয়া লাগবে না, স্বাভাবিক থাকো।”

“খুব কষ্ট পাচ্ছি, এরকম বোঝাব?”

“জিশু ত্রুশবিদ্ধ অবস্থায় কষ্ট পাচ্ছিলেন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার। কিংবা কষ্ট পেলেও কাউকে বুঝতে দেননি। আহ, মুখ ওরকম করো না তো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। নড়বে না একদম।”

“জি, বস।”

বিশ মিনিট ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে গ্যাব্রিয়েল। এরপর বলে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

“বসো তাহলে। কিন্তু কথা বলবে না। চেহারাটা আঁকছি এখন।”

চুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে গ্যাব্রিয়েল, আর কিছু বলে না। ওর চেহারা এঁকে আসলেও মজা পাচ্ছিলাম। কি সুন্দর একটা চেহারা! শক্ত চোয়াল, চাপার হাড়িগুলোর একদম পরিষ্কার বোঝা যায়। নাকটাও সুন্দর। মনে হচ্ছিল যে এক গ্রিক দেবতা বসে আছে আমার সামনে।

কিন্তু কী যেন একটা ঠিক নেই। কী, সেটা বলতে পারবো না। হয়তো নিজের ওপরে বেশি চাপ দিচ্ছি। ওর চোখটা অনেকবার চেষ্টা করেও ঠিকমতো আঁকতে পারলাম না। অথচ প্রথমবার যখন গ্যাব্রিয়েলকে দেখি, ওর উজ্জ্বল চোখ দুটোই আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশি। সেটা হাজার চেষ্টা করেও ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না, হয়তো এরকম কিছু আঁকার প্রতিভাই নেই আমার। অথবা এমনটাও হতে পারে যে গ্যাব্রিয়েলের সৌন্দর্য ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। ছবির চোখগুলো বড় বেশি প্রাণহীন লাগছিল, কিছু একটা নেই। বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম ধীরে ধীরে।

“ধুর, হচ্ছে না।” হতাশ সুরে বলি কিছুক্ষণ পর।

“বিরতি নেবে?”

“হ্যাঁ, বিরতি নেয়া যাক।”

“সেক্সের বিরতি।”

হেসে ফেললাম আবারো। “ঠিক আছে।”

লাফিয়ে সামনে এসে আমাকে তুলে নিল গ্যাব্রিয়েল। স্টুডিওর মেঝেতেই একজন আরেকজনকে আদর করতে শুরু করি আমরা।

কিন্তু আমার নজর বারবারই ইজеле আটকানো ক্যানভাসটার দিকে চলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন গ্যাব্রিয়েলের প্রাণহীন চোখটা সেখান থেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেই।

তবুও টের পাচ্ছিলাম যে আমাকেই দেখছে চোখজোড়া।

অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করার ব্যাপারে রিপোর্ট দেয়ার জন্যে ডায়োমেডেসের অফিসে গেলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি স্বরলিপিগুলো গোছগাছ করছেন।

“তারপর,” মুখ না তুলেই বললেন। “কেমন বুঝলে?”

“কিছু বোঝার সুযোগই পাইনি।”

বিভ্রান্তি ভর করলো তার দৃষ্টিতে।

“অ্যালিসিয়ার সাহায্য তখনই করা যাবে, যখন ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারবে সে। আশপাশে কি হচ্ছে সেটা না বুঝলে কিছুই সম্ভব নয়।”

“ঠিক। কিন্তু তুমি এই কথাগুলো বলছে, কারণ...”

“আসলে ওকে যে ঔষধগুলো দেয়া হচ্ছে, সেগুলো এত কড়া ডোজের যে কারো কোন কথা সে মোটামুটি বুঝতেই পারছে না।”

ড্র কুঁচকে গেল প্রফেসর ডায়োমেডেসের। “এটা একটু বেশি বেশি বলে ফেললে। ওকে কি ঔষধ দেয়া হচ্ছে, সেটা অবশ্য ঠিক জানি না।”

“ইউরির সাথে কথা বলেছি আমি। ষোল মিলিগ্রাম রিস্পিরিডোন। এই তোজে তো একটা ঘোড়াও কারু হয়ে যাবে।”

ড্র নাচালেন ডায়োমেডেস। “এটা তো আসলেই বেশি। কমানো যেতে পারে। অ্যালিসিয়ার চিকিৎসা দলের প্রধান হচ্ছে ক্রিস্টিয়ান। ওর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারো।”

“আপনি বললেই ভালো হয়।”

“হুম।” সন্দেহ ভর করলো ডায়োমেডেসের দৃষ্টিতে। “তুমি আর ক্রিস্টিয়ান আগে থেকেই একে অন্যকে চেনো, তাই না? ব্রডমুরে পরিচয় হয়েছিল বোধহয়?”

“আসলে খুব ভালো করে চিনি বলাটা ঠিক হবে না।”

তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না ডায়োমেডেস। সামনে রাখা চিনি দেয়া কাঠবাদামের

বাটি থেকে একটা বাদাম তুলে নিয়ে আমাকে সাধলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলাম।

বাদামটা মুখে দিয়ে সময় নিয়ে চিবুলেন। আমার দিক থেকে চোখ সরালেন না।
“তোমার আর খ্রিস্টিয়ানের মধ্যে সব ঠিকঠাক তো?”

“প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন?”

“আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একে অপরকে সহ্য করতে পারো না তোমরা।”

“আমার তরফ থেকে কোন সমস্যা নেই।”

“কিন্তু ওর তরফ থেকে?”

“সেটা খ্রিস্টিয়ানকেই জিজ্ঞেস করতে হবে আপনাকে। ওর সাথে কাজ করতে কোন অসুবিধে নেই আমার।”

“ঠিক আছে। হয়তো ভুল ভেবেছি। তবুও একটু কেমন যেন লাগছে...ভেবো ব্যাপারটা নিয়ে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বা ব্যক্তিগত রেষারেষি কিন্তু ভালো ফল বয়ে আনে না। একসাথে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে তোমাদের।”

“জি, জানি সেটা।”

“বেশ, খ্রিস্টিয়ানের সাথেও এই ব্যাপারে আলাপ করা উচিত। তুমি চাইছে যাতে অ্যালিসিয়া চেতনা ফিরে পাক। কিন্তু মনে রেখো, এটা ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারে।”

“কার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ?”

“অ্যালিসিয়া, আর কার?” আমার উদ্দেশ্যে আঙুল নাচাতে শুরু করলেন। ডায়োমেডেস। “ভুলে গেলে চলবে না, বেশ কয়েকবার আত্মঘাতী কাজ করেছে অ্যালিসিয়া। নিজের জীবন শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সেজন্যেই কিন্তু কড়া ডোজের ঔষধ দেয়া হয়েছে ওকে। অনুভূতিগুলো ভোঁতা হলে আর এরকম চিন্তা মাথায় ভর করবে না। এখন যদি ভোজ কমানো হয়, তাহলে আবারো উল্টোপাল্টা কিছু করে বসতে পারে। এই ঝুঁকিটা নিতে রাজি তুমি?”

প্রফেসরের কথায় যুক্তি আছে। তা সত্ত্বেও মাথা নাড়লাম। “এই ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে, প্রফেসর। নতুবা অ্যালিসিয়াকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।”

কাঁধ ঝাঁকালেন ডায়োমেডেস। “তাহলে তোমার হয়ে খ্রিস্টিয়ানের সাথে কথা বলবো।”

“ধন্যবাদ।”

“ও ব্যাপারটাকে কিভাবে নেয়, সেটা দেখার বিষয়। সাইকিয়াট্রিস্টরা সচরাচর তাদের নিজের কাজে অন্য কারো নাক গলানোর ব্যাপারটা ভালোভাবে নেয় না। তবে আমার কথার ওপরে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু এরকমটা সাধারণত করিনা আমি। কৌশলে বলতে হবে। তোমাকে জানানো কি হলো?”

“আমার কথা না উল্লেখ করলেই বোধহয় ভালো হবে।”

“তাই?” অদ্ভুত হাসি ফুটলো ডায়োমেডেসের মুখে। “ঠিক আছে, তোমার ব্যাপারে কিছু বলবো না।”

ডেস্ক থেকে একটা ছোট বক্স বের করলেন প্রফেসর, ভেতরে সারি করে রাখা বেশ কয়েকটা চুরুট। আমাকে সাধলেন একটা। না করে দিলাম।

“ধূমপান করো না?” কিছুটা অবাক মনে হলো তাকে। “তোমাকে দেখে তো মনে হয়েছিল স্মোকার।”

“না, না। কালেভদ্রে খাই আর কি...চেষ্টা করছি অভ্যাসটা ছেড়ে দিতে।”

“বাহ্, ভালো তো।” জানালা খুললেন ডায়োমেডেস। “থেরাপিস্টদের কেন ধূমপান করা সাজে না, সেই কৌতুকটা শুনেছো না? ধূমপানের অর্থ তোমার নিজেরই কোন সমস্যা আছে।” হেসে একটা চুরুট মুখে দিলেন। “এখানে আমাদের সবার মাথাতেই এক আধটু সমস্যা আছে, কি বলো?”

আবারো হাসলেন ডায়োমেডেস। চুরুট জ্বালিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে বাইরে ধোয়া ছাড়লেন। ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ মুহূর্তে কিছু করার নেই আমার।

লাঞ্চেঞ্জের পর করিডোরে পায়চারি করতে লাগলাম। আসলে বাইরে যাবার ছুতো খুঁজছি, একটা সিগারেট না খেলেই নয়। এসময় ইন্দিরার সাথে দেখা হয়ে গেল, ভাবলেন আমি বুঝি হারিয়ে গেছি।

“চিন্তা কোরো না থিও,” আমার হাত ধরে বললেন। “এখানকার সব রাস্তা চিনতে আমরা কয়েক মাস লেগে গেছে। গোলকধাঁধা মনে হয় মাঝে মাঝে। এখনও প্রায়ই হারিয়ে যাই, চিন্তা করো!” হাসি ফুটলো তার মুখে। আমি কিছু বলার আগেই চট করে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। না করতে পারলাম না।

“কেতলিটা গরম দেই, দাঁড়াও। এত্ত বাজে আবহাওয়া। এর চেয়ে তুষারপাত হলেই ভালো। আমার কি ধারণা জানো? তুষারপাতের সাথে মানুষের মানসিক

অবস্থার একটা সম্পর্ক আছে। অনেকক্ষণ টানা তুষারপাতের পর সবকিছু কিন্তু একদম সাদা হয়ে যায়, মনে হয় যে নতুন করে শুরু করতে হবে সবকিছু। কিন্তু তুষারের নিচে আগের জিনিসগুলো কিন্তু ঠিকই থাকে। মানুষও এরকম নতুন করে শুরু করতে চায়। তুষারপাতের সময় রোগীদের দেখো ভালো করে, বুঝতে পারবে।”

আমাকে অবাক করে দিয়ে ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়ানো মোটা এক স্লাইস কেক বের করলেন তিনি। ওটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, “এই নাও। ওয়ালনাট কেক, গতরাতে বানিয়েছি।”

“আরে এটার কি দরকার ছিল।”

“আমি জানি ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, কিন্তু রোগীদের হাতে একটা কেক ধরিয়ে দিয়ে সবসময় ভালো ফলাফলই পেয়েছি।”

হাসলাম। “এরকম সুস্বাদু কেক দিলে তো ফলাফল ভালো পাবেনই। আমি রোগি হিসেবে ঝামেলার নাকি?”

ইন্দিরার মুখেও হাসি ফুটলো। “আরে নাহ্। কিন্তু মাঝে মাঝে গোমড়া স্টাফদের হাতে কেক দিলে, তারাও খুশি হয় কিন্তু। তুমি অবশ্য মুখ গোমড়া করে রাখে না। একটু মিষ্টি কিছু খেলে কাজের উদ্যোগ বেড়ে যায়। আগে তো আমি প্রায়ই ক্যান্টিনে দেয়ার জন্যে কেক বানাতাম, কিন্তু স্টেফানি আসার পর থেকে বাইরের খাবার নিয়ে বেশি কড়াকড়ি শুরু করেছে। তবুও মাঝে মাঝে কেক নিয়ে আসি ব্যাগে করে। নীরব প্রতিবাদ বলতে পারো। এখন খাও তো”।

এরকম আদেশ অমান্য করা যায় না। কেকে কামড় দিলাম। আসলেও দারুণ খেতে।

“আপনার রোগীদের মন নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যায় কেক খাওয়ার পর,” মুখে কেক নিয়েই বললাম।

সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো ইন্দিরার মুখে। কেন তাকে ভালো লাগে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, একটা মা মা ভাব আছে তার মধ্যে। অনেকটা আমার পুরনো থেরাপিস্ট রুথের মতন। এরকম মানুষের মন কোন কারণে খারাপ, এটা ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

আমরা এখন নার্স স্টেশনে। এখানকার সবাই জায়গাটাকে ‘গোল্ডফিশ বোউল

বলে। চারপাশের কাঁচের জন্যেই এই নাম। যে কোন সাইকিয়াট্রিক ইউনিটের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নার্স স্টেশন। চারদিকে নজর রাখা যায় কাঁচ ভেদ করে। কিন্তু উল্টোটা ঘটে সাধারণতবাইরে থেকে রোগিরাই সবসময় তাকিয়ে থাকে ভেতরের অধিবাসীদের দিকে। ছোট জায়গাটায় পর্যাপ্ত চেয়ার নেই। যেগুলো আছে, সেগুলোয় সাধারণত নার্সরা বসে টুকটাক কাজ করে। সুতরাং আমাদের বেশিরভাগ সময় দাঁড়িয়ে বা ডেস্কে হেলান দিয়ে থাকতে হয়। ভেতরে লোক যতই থাক, সবসময়ই মনে হবে যে অনেক ভিড়।

“এই নাও তোমার চা।” বড় একটা মগ আমার হাতে ধরিয়ে দিল ইন্দিরা।

“ধন্যবাদ।”

এসময় ক্রিস্টিয়ান ঢুকলো ভেতরে। আমার সাথে চোখাচোখি হওয়ায় একবার মাথা নাড়লো। সবসময় পিয়ারমিন্ট চুইংগাম চিবোনো ওর একটা অভ্যাস। ওটার গন্ধই নাকে এসে লাগলো। ব্রডমরে থাকতে দেখতাম কিছুক্ষণ পরপরই সিগারেট টানছে; এই একটা ব্যাপারেই মিল ছিল আমাদের। এরপর অবশ্য ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে ক্রিস্টিয়ান। বিয়ে করেছে, একটা মেয়েও আছে। বাবা হিসেবে সে কিরকম, কে জানে। ওকে কখনোই খুব একটা সহনশীল মনে হয়নি আমার।

“আবারো কোন একটা নার্স স্টেশনে তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে এটা কখনো ভাবিনি, থিও,” শীতল হেসে বলল ক্রিস্টিয়ান।

“আমিও ভাবিনি। দুনিয়াটা বড় ছোট।”

“মানসিক স্বাস্থ্য খাতের চিন্তা করলে, আসলেও ছোট।” এমনভাবে কথাটা বলল যেন এর বাইরেও বড় একটা দুনিয়া আছে ওর। সেটা জিম বা রাগবি খেলার মাঠ বাদে আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয়না।

কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্রিস্টিয়ান। ওর এই অভ্যাসটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিছু বলার বা করার আগে প্রায়ই সময় নিয়ে ভাবে ও, ইচ্ছে করে অপেক্ষা করায়। ব্রডমুরে থাকতে খুবই বিরক্ত লাগতো ব্যাপারটা, এখনও লাগছে।

“এরকম একটা সময়ে থোভে যোগ দিলে কেন বুঝতে পারছি না,” এক পর্যায়ে বলল সে। “যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।”

“অবস্থা এতটাই খারাপ?”

“সময়ের ব্যাপার মাত্র। ট্রাস্টের তরফ থেকে খুব শিঘ্রই ঘোষণা এসে পড়বে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, জেনে বুঝে এরকম একটা ইউনিটে যোগ দিলে কেন তুমি?”

“মানে?”

“ডুবন্ত জাহাজ থেকে সাধারণত লাফিয়ে পড়ে বাঁচার চেষ্টা করে ইঁদুরের দল, চড়ে বসে না।”

ক্রিস্টিয়ানের এরকম সরাসরি আক্রমণে অবাক না হয়ে পারলাম না। তবে প্রতিক্রিয়া দেখানোটা বোকামি হবে। বরং কাঁধ ঝাঁকিয়ে উড়িয়ে দিলাম প্রচ্ছন্ন অভিযোগটা। “হতে পারে। কিন্তু আমি তো আর ইঁদুর নই।”

ক্রিস্টিয়ান কিছু বলার আগেই ধপ করে একটা শব্দ হওয়ায় চমকে উঠলাম আমরা। বাইরে থেকে কাঁচের গায়ে কিল বসাচ্ছে এলিফ। মুখটাও চেপে রেখেছে শক্ত করে। রীতিমত একটা দানবীর মতন দেখাচ্ছে।

“এই বালের ওষধ আমি আর খাবো না। মাথা খারাপ করে দেয়।

গ্লাসের মধ্যেই একটা হ্যাঁচ খুলে দেয় ক্রিস্টিয়ান। “এখন তো আমাদের এসব নিয়ে আলাপ করার সময় নয়, এলিফ।”

“বললাম না, খাবো না। অসুস্থ লাগে সারাদিন-”

“যদি কথা বলতে চাও তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করো। এখন সরে দাঁড়াও এখান থেকে, প্লিজ।”

গড়িমসি করলেও কিছুক্ষণ পর চলে গজরাতে গজরাতে চলে যায়। এলিফ। যেখানে মুখ ঠেকিয়েছিল সেখানে ওর চেহারার একটা অবয়ব ফুটে উঠেছে।

“রোগি বটে একখান,” বললাম।

“এরকম রোগি সামলানো মুশকিল,” চিবিয়ে বলে ক্রিস্টিয়ান।

মাথা নেড়ে সায় জানায় ইন্দিরা। “বেচারা এলিফ।”

“এখানে পাঠানো হয়েছে কেন ওকে?”

“জোড়া খুন,” ক্রিস্টিয়ান বলল। “ওর মা আর বোনকে খুন করেছিল ঘুমের মধ্যে।”

কাঁচ ভেদ করে বাইরে তাকাই। অন্যান্য রোগীদের সাথে যোগ দিয়েছে। এখন এলিফ। সবার তুলনায় লম্বা সে। একজনকে দেখলাম ওর হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে

দিতে, সেটা পকেটে খুঁজে ফেললো তৎক্ষণাৎ।

এসময় অ্যালিসিয়াকে খেয়াল করলাম বাইরে এক কোণায়। জানালা দিয়ে আনমনা দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ দেখলাম ওকে।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকালো ক্রিস্টিয়ান। “ওহ আচ্ছা, অ্যালিসিয়ার ওষুধের ব্যাপারে ডায়োমেডেসের সাথে কথা হয়েছে আমার। রিস্পেরিডোনের ডোজ কমিয়ে দেয়ার ফলাফল কি হয় সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি। এখন প্রতিদিন পাঁচ মিলিগ্রাম করে দেয়া হয় ওকে।”

“আচ্ছা।”

“ভাবলাম তোমাকে জানিয়ে রাখি, যেহেতু ওর সাথে এক সেশনে দেখা করেছে।”

“হ্যাঁ।”

“এখন নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে অ্যালিসিয়াকে, ব্যবহারে কোন পরিবর্তন আসে কি না বুঝতে হবে। আরেকটা কথা, এর পরে যদি কখনো আমার কোন রোগির ওষুধের ডোজ পরিবর্তনের কথা বলতে হয়, তাহলে সরাসরি আমার কাছে আসবে। ডায়োমেডেসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহারের কোন দরকার নেই,” চোখ পাকিয়ে কথাটা বলল ক্রিস্টিয়ান।

জবাবে হাসলাম ওর দিকে তাকিয়ে। “কাউকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করিনি আমি। তোমার সাথে সরাসরি কথা বলতেও কোন সমস্যা নেই। আমার, ক্রিস্টিয়ান।”

বেশ একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে ঘরটায়। মনস্থির করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ক্রিস্টিয়ান। “তুমি তো এটা বুঝতে পারছো যে অ্যালিসিয়া রোগি হিসেবে বর্ডারলাইন। একটু এদিক সেদিক হলেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। থেরাপিতে কোন লাভই হবে না ওর। সময় নষ্ট করছে।”

“তুমি কিভাবে বুঝলে ও বর্ডারলাইন? কথাই তো বলতে পারে না।”

“বলতে পারে না বলাটা ভুল হবে। বলে না।”

“তোমার ধারণা গোটাটাই অভিনয়?”

“হ্যাঁ।”

“যদি অভিনয়ই হয়ে থাকে তাহলে তো বর্ডারলাইন হবার প্রশ্নই ওঠে না।”

বিরক্তির ছাপ ফুটলো ক্রিস্টিয়ানের চেহারায়।

তবে সে কিছু বলার আগেই ইন্দিরা হাত ওঠায়। “তোমাদের দুজনের মতের ওপরেই সম্মান রেখেই বলছি, বর্ডারলাইন’ কথাটা দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার করে কিছু কিছু বোঝা যায় না।” ক্রিস্টিয়ানের দিকে তাকালেন তিনি। এই ব্যাপারটা নিয়ে আগেও ক্রিস্টিয়ানের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে।”

“তাহলে আপনার অ্যালিসিয়াকে নিয়ে কি ধারণা?” জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুক্ষণ প্রশ্নটা নিয়ে ভাবলেন ইন্দিরা। “আসলে ওর প্রতি মাতৃসুলভ একটা টান অনুভব করি আমি। কাউন্টার ট্রান্সফিয়ারেন্স বলতে পারো। ওকে দেখলেই আমার ভেতরের মাতৃসত্ত্বা জেগে ওঠে, মনে হয় কারো উচিৎ ওর দেখভাল করা।” আমার উদ্দেশ্যে একবার হাসি দেয় ইন্দিরা। “আর এখন ওর যত্ন নেয়ার মত মানুষ এসেছে এখানে। তুমি।”

হেসে উঠলো ক্রিস্টিয়ান, ওর বিরক্তিকর সেই হাসি। শুনলেই পিত্তি জ্বলে ওঠে। “বোকার মত প্রশ্ন করার জন্যে মাফ করবেন, কিন্তু অ্যালিসিয়া যদি কথাই না বলে তাহলে থেরাপি থেকে কি লাভ হবে তার?”

“থেরাপির ক্ষেত্রে কথা বলাটাই সবকিছু নয়,” ইন্দিরা বললেন। “বরং বলতে পারো থেরাপির মাধ্যমে রোগীদের এটা বোঝানো হয় যে তাদের মত প্রকাশের জন্যে পরিবেশটা নিরাপদ। কথা বলা ছাড়াও মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে মানুষ, সেটা নিশ্চয়ই ভালো করেই জানো তুমি।”

চেহারায় সবজাস্তা একটা ভাব এনে আমার দিকে তাকায় ক্রিস্টিয়ান। “ভালো কোন জ্যোতিষী দেখিয়ে নিও। কপালে শনি আছে নাহলে।”

“হ্যালো, অ্যালিসিয়া,” বললাম।

ওষুধের ডোজ কমানোর খুব বেশিদিন হয়নি, কিন্তু এই কদিনেই ওর মধ্য দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। চলাফেরায় আগের জড়তা নেই। চোখের দৃষ্টিও আগের তুলনায় পরিষ্কার। মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষকে দেখছি।

দরজায় ইউরির সাথে দাঁড়িয়ে আছে ও, দোটানায় ভুগছে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো, যেন এই প্রথম আমাকে খেয়াল করেছে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে মানুষ হিসেবে আমি কেমন। ভেতরে ঢুকলে কোন সমস্যা হবে মেনে নিয়ে পা বাড়ালো সামনে। আজকে আর বসতে বলতে হলো না।

ইউরিকে চলে যাবার ইশারা করলাম। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল সে।

অ্যালিসিয়ার মুখোমুখি বসে আছি আমি। ঘরের নীরবতা ছাপিয়ে কানে আসছে বাইরের অবিরাম বর্ষণের শব্দ।

“আজকে কেমন লাগছে আপনার?”

কোন জবাব পেলাম না। অ্যালিসিয়া একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখে পলক পড়ছে না।

মুখ খুলে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। ঠিক করেছি ওর চুপ করা থাকা সময়টায় আমিও যতটা সম্ভব কম কথা বলবো। এতে হয়তো ও নিজেকে আমার চারপাশে নিরাপদ অনুভব করবে, বুঝতে পারবে যে আমাকে ভরসা করা যায়। অর্থাৎ ওর কাছে এই বার্তাটা পৌঁছানোর জন্যে মুখ খোলার কোন দরকার নেই আমার। ওকে কথা বলাতে চাইলে আগে ভরসা অর্জন করতে হবে। তবে সেজন্যে সময় দরকার, রাতারাতি কিছু হয় না।

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে মাথার দুই পাশে দপদপ করতে থাকে আমার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথাব্যথা শুরু হয়ে যাবে। রুথের কথা মনে হলো। প্রায়ই বলতো যে ভালো একজন থেরাপিস্ট হিসেবে রোগির অনুভূতিগুলো বুঝতে হবে তোমাকে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে অনুভূতিগুলো আসলে তোমার নয়, অন্য কারো। অর্থাৎ এখন যে আমার মাথা দপদপ করছে, এই কষ্টটা আসলে আমার নয়; অ্যালিসিয়ার। আর হঠাৎ করেই চিত্তে চেপে বসা এই তীব্র বিষণ্ণতা, মরে যাবার ইচ্ছেটাও ওর। চুপচাপ বসে অ্যালিসিয়ার হয়ে এগুলো অনুভব করতে লাগলাম আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল পঞ্চাশ মিনিট।

আমার ঘড়ির দিকে তাকালাম। “আজকের সেশন এখানেই শেষ।”

মাথা নামিয়ে কোলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো অ্যালিসিয়া। দৃশ্যটা দেখে নিজের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলাম না। পরবর্তী কথাগুলো একদম মন থেকেই বললাম।

“আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমি, অ্যালিসিয়া। বিশ্বাস করুন কথাটা। সত্যিটা হচ্ছে, আমি চাই আপনি যাতে ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারেন।”

এবারে মুখ তোলে অ্যালিসিয়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

আমাকে সাহায্য করার যোগ্যতা তোমার নেই, দৃষ্টিটা যেন চিৎকার করে বলে।
নিজেকেই তো সাহায্য করতে পারোনি। এমন ভাব ধরো যেন বিরাট জ্ঞানী। আমার
জায়গায় এখানে তোমার বসা উচিত। ভন্ড, মিথ্যুক, মিথ্যুক-

হঠাৎই একটা বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়। গত পঞ্চাশ মিনিট এ ব্যাপারটাই
খেঁচাচ্ছিল আমাকে। কথাটা বলে বোঝানো মুশকিল, একজন সাইকোথেরাপিস্ট
চোখের দৃষ্টি বা অঙ্গভঙ্গি দেখে খুব দ্রুত তার রোগির মানসিক কষ্ট চিহ্নিত করতে
শিখে যায়। আর এখানেই অ্যালিসিয়া ব্যতিক্রম। গত ছয় বছর ধরে এত চিকিৎসা,
এত রকমের ঔষধ-এসব কিছু সত্ত্বেও তার চোখের দৃষ্টিটা এখন একদম টলটলে
হৃদের পানির মত পরিস্কার। পাগল নয় সে। তাহলে কি? চোখের এরকম দৃষ্টির
মানেই বা কি? এটা

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই চেয়ার থেকে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
অ্যালিসিয়া। সরে যাবার সময়টুকুও পেলাম না। তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে
পড়ে যাই ওকে সহ।

মেঝেতে মাথা ঠুকে যায়। আমার ওপর চেপে বসেছে অ্যালিসিয়া। চুলগুলো মুঠি
করে ধরে মাথাটা বারবার মেঝের সাথে বাড়ি দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর উপর্যুপরি
থাপড়াতে আর খামচাতে শুরু করলো। খুব কষ্ট করে ওকে আমার ওপর থেকে
সরালাম।

কোনমতে টেবিল অবধি পৌঁছে পার্সোনাল অ্যালার্মটা হাতে নিয়েছি, এসময়
আবারো আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় অ্যালিসিয়া। অ্যালার্মটা ছুটে যায়।

“অ্যালিসিয়া-”

সাড়াশির মত ওর হাতজোড়া চেপে বসে আমার গলায়। আবারো অ্যালার্মটা
হাতে নেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু লাভ হয় না। আরো শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে ওর
আঙুলগুলো, নিশ্বাস নিতে পারছি না। এবারের অ্যালার্মটার নাগাল পাই, বোতামটা
সাথে সাথে চেপে ধরি সর্বশক্তিতে।

বিকট শব্দে বেজে ওঠে অ্যালার্ম। দূর থেকে ইউরির দরজা খোলার শব্দ ভেসে
আসে। চিৎকার করে অন্যদের ডাক দেয় সে। টেনে হেঁচড়ে আমার ওপর থেকে
সরানো হয় অ্যালিসিয়াকে। এতক্ষণে বুক ভরে শ্বাস নেই।

চারজন নার্স মিলে শক্ত করে ধরে রেখেছে ওকে। তবুও সমানে হাত পা ছুঁড়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন অশরীরি, জান্তব কিছু ভর করেছে। দ্রুত ক্রিস্টিয়ান এসে একটা ইঞ্জেকশন দেয়। জ্ঞান হারায় অ্যালিসিয়া।

অবশেষে আবারো নীরবতা নেমে আসে ঘরটায়।

“একটু জ্বলবে।”

অ্যালিসিয়ার নখের আঁচড়ে ছিলে যাওয়া জায়গাগুলোয় অ্যান্টিসেপ্টিক লাগানোর সময় বলল ইউরি। নার্স স্টেশনে আমরা। অ্যান্টিসেপ্টিকের ঘ্রাণটা আমাকে স্কুলের ফাস্ট এইড জোনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। খেলার সময় পড়ে গিয়ে হাত পা ছিলে গেলে সেখানে নিয়ে যাওয়া হতো আমাদের। এরপর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিয়ে সাহসিকতার জন্যে প্রত্যেকের হাতে একটা করে ক্যান্ডি ধরিয়ে দিতেন নার্স। অ্যান্টিসেপ্টিকের তীব্র জ্বলুনি বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এল আমাকে। এখন আর আগের মত সহজেই ক্ষতগুলোর কথা ভুলে যাওয়া যায় না।

“মনে হচ্ছে কেউ যেন হাতুড়িপেটা করেছে আমাকে।”

“ভালো জোরেই মেরেছে, আরো ফুলে যাবে একটু পর। খেয়াল রেখো,” মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইউরি। “তোমাকে ওর সাথে একা ছাড়াটাই উচিৎ হয়নি আমার।”

“আসলে দোষটা আমারই।”

“তা অবশ্য ঠিক।” নাক দিয়ে শব্দ করলো ইউরি।

“আগেই সাবধান করেছিলাম তোমাকে”-এটা না বলার জন্যে ধনবাদ। মনে থাকবে আমার।”

কাঁধ ঝাঁকালো ইউরি। “আমার কিছু বলতে হবে না, প্রফেসর সাহেবই যা বলার বলবেন। তোমাকে অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন ডায়োমেডেস।”

“এহহে।”

“তোমার জায়গায় আমি হলে কাপতাম এই কথা শোনার পর।”

বেশ কসরত করে উঠে দাঁড়ালাম।

খেয়ালী চোখে আমাকে দেখছে ইউরি। “এত তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাও। মাথা ঘোরালে বা ব্যথা করলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে।”

“ঠিক আছি আমি।”

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, তবে দেখে যতটা খারাপ মনে হচ্ছে আমার অবস্থা

তার চেয়ে ভালো। গলার যেখানটায় অ্যালিসিয়া চেপে ধরেছিল সেখানে কালশিটে ফুটে উঠতে শুরু করেছে। পুরো চেহারায় নখের আচড়ের দাগ। কয়েকটা ক্ষতস্থান থেকে বেশ ভালোই রক্ত ঝরেছে।

প্রফেসরের দরজায় নক করলাম। আমাকে দেখে চোখ বড়বড় হয়ে গেল তার। “আহারে। সেলাই লাগবে নাকি?”

“না, না। আমি ঠিক আছি।”

মনে হলো না আমার কথা বিশ্বাস করলেন তিনি। “ভেতরে এসে বসো, থিও।”

অন্যেরা আগেই সেখানে জড়ো হয়েছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টিয়ান আর স্টেফানি। ইন্দিরা জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে আমাকে দেখছেন। মনে হচ্ছে যেন আমাকে নতুন চাকরিতে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়েছে সবাই। কিন্তু বাস্তবতা এর উল্টো, হয়তো চাকরিটা খোয়াতে হবে আজকেই।

ডায়োমেডেস তার ডেস্কের পেছনে বসে আছেন। আমাকে হাত দিয়ে উল্টোদিকের খালি চেয়ারটায় বসার ইশারা করলেন। বসে পড়লাম। কিছু না বলে চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, আঙুলগুলো ডেস্কের ওপর নড়ছে অবিরাম। হয়তো ভাবছেন যে কথাটা কি করে বলবেন। তবে তাকে সে সুযোগ দিল না স্টেফানি।

“খুবই খারাপ হলো ব্যাপারটা,” আমার দিকে তাকিয়ে বলল ইউনিট ম্যানেজার। “আপনি যে সুস্থ আছেন, সেটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার, তবুও...কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। অ্যালিসিয়ার সাথে একা কেন দেখা করেছিলেন আপনি, বলুন তো?”

“আসলে দোষটা আমারই। আমিই ইউরিকে বলি যে ওকে একা সামলাতে পারবো।”

“এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছিল? আপনাদের কেউ যদি মারাত্মক আহত হতেন-”

“একটু বেশি বেশি বলে ফেলছে স্টেফানি,” ডায়োমেডেস বলে উঠলেন এই সময়ে। “সৌভাগ্যবশত তেমন কিছু হয়নি কারোই। এরকম জেরার প্রয়োজন দেখছি না,” ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন প্রফেসর।

“ঘটনাটাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই, প্রফেসর।” থমথমে কণ্ঠে বলল স্টেফানি। “একদমই নেই।”

“খাটো করে দেখছি কে বলল?” আমার দিকে তাকালেন ডায়োমেডেস।
“আমার কথা উল্টোপাল্টা অর্থ বের করবে না, স্টেফানি। থিও, তুমি বলো তো কি হয়েছিল।”

সবাই চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। খুব সাবধানে পরবর্তী কথাগুলো বললাম। “আমাকে হঠাৎ করেই আক্রমণ করে বসে অ্যালিসিয়া। ঘটনা বলতে এটুকুই।”

“সেটা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন? কোন রকমের উসকানি ছাড়াই কাজটা করেছিল বোধহয় সে?”

“হ্যাঁ। অন্তত সজ্ঞানে উসকানিমূলক কিছু বলিনি আমি।”

“তাহলে হয়তো নিজের অজান্তেই কিছু একটা করে ফেলেছিলে?”

“অ্যালিসিয়ার ওরকম প্রতিক্রিয়া দেখানর কোন না কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। এটা থেকে বোঝা যায় অ্যালিসিয়া নিজের মনের ভাব প্রকাশে আগ্রহী।”

হেসে উঠলো ক্রিস্টিয়ান। “এভাবে?”

“হ্যাঁ। স্কোভের বহিঃপ্রকাশ দ্বারাও কিন্তু অনেক কিছু বোঝাতে পারে মানুষ। অন্যান্য রোগীদেরই দেখো, চুপচাপ বসে থাকে সারাদিন, হাল ছেড়ে দিয়েছি পুরোপুরি। কিন্তু অ্যালিসিয়া সেরকম না। ওর আমার ওপর এভাবে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে এটা বোঝা যায় যে ভেতরে ভেতরে কোন একটা কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছে। আর ওটাই আমাদের বোঝানোর জন্যে মরিয়া সে।”

চোখ বাঁকালো ক্রিস্টিয়ান। “এত কাব্যিক ব্যাখ্যা দেয়ার কিছু নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঔষধের ডোজ কমানোয় এই কাজ করেছে সে।” ডায়োমেডেসের দিকে ঘুরলো ও। “আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, প্রফেসর। বলেছিলাম যে ডোজ কমালে হিতে বিপরীত হতে পারে।”

“তাই ক্রিস্টিয়ান?” বললাম। “তুমি না বললে তো জানতামই না।”

আমার কথা আমলে নিল না ক্রিস্টিয়ান। এখানেই সাইকোথেরাপিস্ট আর সাইকিয়াট্রিস্টের মধ্যে পার্থক্য। রোগীদের মানসিকতার পরিবর্তন কিভাবে করা যায়, সেটা প্রায়ই ভুলতে বসে ক্রিস্টিয়ানের মত লোকেরা। শুধু ঔষধ খাইয়ে ঠাণ্ডা করে রাখতে পারলেই খুশি। প্রতিবেলা খাবার শেষে নিয়ম করে তাই কয়েকটা ট্যাবলেট দেয়া হয় অ্যালিসিয়াকে। ক্রিস্টিয়ানের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে না যে আমার কোন

পরামর্শ শুনবে সে।

তবে ডায়োমেডেস চেহারা ভাবনার ছাপ। “ঘটনাটা তাহলে দমিয়ে দেয়নি তোমাকে, থিও।”

“না, এখন তো মনে হচ্ছে ঠিক পথেই এগোচ্ছি,” মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম।

সন্তুষ্টি ফুটলো ডায়োমেডেসের চেহারা। “ভালো। আমি তোমার সাথে একমত। এরকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণ খুঁজে বের করা উচিত। তুমি কাজ চালিয়ে যাও।”

আর নিজেকে সামলাতে পারলো না স্টেফানি। “প্রশ্নই ওঠে না,” বলে উঠলো সে।

“তোমার কি মনে হয়? অ্যালিসিয়াকে কথা বলাতে পারবে?” স্টেফানির কথা যেন কানেই ঢোকেনি প্রফেসরের।

“আমার বিশ্বাস, পারবে,” পেছন থেকে ইন্দিরা বললেন এসময়। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে ঘরে তিনিও আছেন। “একভাবে চিন্তা করলে, অ্যালিসিয়া কিন্তু কথা বলতে শুরু করেছে। থিও’র মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে সে। অর্থাৎ থিও হচ্ছে তার যোগাযোগের মাধ্যম।”

মাথা নেড়ে সাই জানালেন ডায়োমেডেস। এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তিত দেখালো তাকে। মাথায় কি চলছে বুঝতে পারছি। অ্যালিসিয়া নামকরা একজন পেইন্টার, সুতরাং গ্রোভকে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে সে-ই হতে পারে ডায়োমেডেসের তুরূপের তাস। আমরা যদি দেখাতে পারি যে অ্যালিসিয়ার মানসিক অবস্থায় উন্নতি হচ্ছে, তাহলে হয়তো গ্রোভ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে ট্রাস্ট।

“কতদিনের মধ্যে ফলাফল আশা করতে পারি আমরা?” জানতে চাইলেন ডায়োমেডেস।

“এর উত্তর নেই আমার কাছে,” সত্যটাই বললাম। “আপনিও নিশ্চয়ই জানেন সেটা। এসব ব্যাপারে আগে থেকে কোন কিছু আন্দাজ করা যায় না। ছয় মাস, এক বছর-কিংবা তার চেয়েও বেশি।”

“ছয় সপ্তাহ সময় দিলাম তোমাকে।”

সামনে এগিয়ে এলো স্টেফানি। “আমি এই ইউনিটের ম্যানেজার, এরকমটা হতে দিতে”।

“আর আমি থোভের ক্লিনিকাল ডিরেক্টর। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার একমাত্র আমারই আছে, আর কারো নয়। থিও’র যদি কোন কিছু হয়, তাহলে সেটার দায় পুরোপুরি আমার,” বলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন ডায়োমেডেস।

আর কথা বাড়ালো না স্টেফানি। দৃষ্টিবাণে কিছুক্ষণ আমাদের ভাস্ম করে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

“আশ্চর্য, মেয়েটা রেগে গেল কেন?” আমুদে কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। “তুমি দেখি ইউনিট ম্যানেজারের শত্রু হয়ে গেলে থিও, কপালটাই খারাপ তোমার,” ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসি দিলেন তিনি। খানিক বাদেই চেহারায়ে গান্ধীর্ষ ফুটিয়ে বললেন, “ছয় সপ্তাহ, আমার তত্ত্বাবধায়নে। বুঝেছো?”

রাজি হয়ে গেলাম-আসলে রাজি না হয়ে আর কোন উপায়ও ছিল না। “ছয় সপ্তাহ,” বললাম।

“বেশ।”

ক্রিস্টিয়ান উঠে দাঁড়ালো, দৃশ্যতই বিরক্ত। “ছয় সপ্তাহ কেন, ছয়শো বছরেও কথা বলবে না অ্যালিসিয়া। সময় নষ্ট করছেন আপনারা।”

চলে গেল সে। আমার ব্যর্থতার ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত কিভাবে সে?

মনের মধ্যে জেদ চেপে গেল। সফল হতেই হবে আমাকে।

রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অভ্যাসবশত হলওয়ার সুইচবোর্ডে চলে গেল হাত। বালবটার ফিউজ কেটে গেছে বেশ কিছুদিন হতে চললো, বদলাবো বদলাবো করেও বদলানোনা হচ্ছে না।

বাসায় পা দেয়া মাত্র বুঝতে পারলাম যে ক্যাথি বাইরে। বড় বেশি চুপচাপ ভেতরটা; ক্যাথি থাকলে এরকমটা হবার কথা নয়। ও শোরগোল পছন্দ করে এমনটা বলা উচিত হবে না, কিন্তু ওর জগতটা আর যা-ই হোক, নিশ্চুপ নয়। হয় ফোনে কথা বলবে, নয়তো সাউন্ড জোরে দিয়ে টিভি দেখবে-কিছু না কিছু একটা তো করবেই। আজ ফ্ল্যাটের ভেতরটা কবরস্থানের মতন নীরব। তবুও অভ্যাসবশত ওর নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার। জানতাম যে কোন জবাব পাবো না, তবুও বোধহয় নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম যে বাসায় আসলেও সম্পূর্ণ একা আমি।

“ক্যাথি?”

জবাব নেই।

অন্ধকারেই কোনরকমে লিভিং রুম অবধি চলে এলাম। বাতি জ্বালতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চারপাশ। নতুন আসবাবপত্র সবসময়ই চমকে দেয় আমাকে। অভ্যস্ত হবার আগ অবধি মনে হয় অন্য কারো বাসায় এসে পড়েছি বুঝি। চারপাশে নতুন চেয়ার, নতুন কুশন আর রঙের সমারোহ। কে বলবে যে আগে এখানটায় কোন রঙই ছিল না? টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে ক্যাথির পছন্দের গোলাপি লিলি সাজিয়ে রাখা। ওগুলোর কড়া মিষ্টি গন্ধে থকথক করছে চারপাশ।

কটা বাজে? সাড়ে আটটা। এতক্ষণে তো ওর বাসায় থাকার কথা। রিহাসাল আছে নাকি? ওদের নাটকের দলটা ওথেলো' করছে এখন, কিন্তু দর্শকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পায়নি। অতিরিক্ত পরিশ্রমের খেসারত দিতে হচ্ছে সবাইকে। বাসায় আসার পর ভীষণ ক্লান্ত থাকে ক্যাথি। চেহারায় শুকিয়ে গেছে। মরার ওপর খড়ার ঘায়ের মত ঠাণ্ডা লেগেই থাকে বেচারির। “সবসময় অসুস্থ,” প্রায়ই বলে ও। “শরীর আর চলছে না।”

কথাটা সত্য; রিহাসাল থাকলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে কতটা পরিশ্রম গেছে সারাদিনে। হাই তুলতে তুলতে বিছানায় উঠে পড়ে। অন্তত আরো দুঘন্টার আগে ফিরবে না নিশ্চিত। তাহলে ঝুঁকিটা নেয়াই যায়।

গাঁজার বয়ামটা বের করে একটা জয়েন্ট বানানো শুরু করে দেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই এই বদভ্যাসের শুরু আমার। প্রথম সেমিস্টারে একটা পার্টিতে গিয়ে যখন কারো সাথে কথা বলার সাহস করে উঠতে পারছিলাম না, তখন নিজেকে সপে দিয়েছিলাম গাঁজার ধোয়ার মধ্যে। আমি বাদে সেখানে উপস্থিত অন্য সবাইকে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী আর সুদর্শন বলে মনে হচ্ছিল। আর আমি হলাম সেই কুৎসিত হাঁসের ছানা। পার্টি থেকে পালাবো এমন সময় পাশের মেয়েটা একটা জিনিস হাতে ধরিয়ে দেয় আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম সিগারেট, কিন্তু কড়া গন্ধটায় ভুল ভেঙে যায়। জয়েন্টটা যে ফিরিয়ে দেব, সেই সাহসও ছিল না। অগত্যা ঠোঁটে নিয়ে টান দেই। ভালো করে রোল করা হয়নি জয়েন্টটা, খুলে খুলে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও প্রভাবটা ঠিকই বুঝতে পারি। সিগারেটের ধোঁয়া থেকে একদম আলাদা, মাথায় গিয়ে লাগে। তবে হ্যাঁ, লোকে যেরকম বাড়িয়ে বলে সেরকম কিছু মনে হয়নি। অনেকটা সেক্সের মতন ব্যাপারটা, নিজের অভিজ্ঞতা না হবার আগ অবধি মনে হবে না জানি কত দারুণ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

তবে কিছুক্ষণ যেতেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কী যেন একটা হয়ে গেল। কোথেকে এক রাশ প্রশান্তি এসে ভর করলো আমার চিত্তে। নিজেকে খুবই সুখি মনে হচ্ছিল সেসময়। যাবতীয় দুশ্চিন্তা ভেসে গেল বানের জলে।

সেই থেকেই শুরু। কয়েকদিনের মধ্যে পাক্কা গাঁজাখোর হয়ে গেলাম। আমার নিত্যদিনের সঙ্গি। জয়েন্ট রোল করার সময় মনে হতো দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো কাজটার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কাগজ ভাঁজ করার শব্দ কানে আসতেই নেশা ধরে যেত যেন।

নেশার উৎপত্তি কিভাবে সেটা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। ব্যাপারটা বংশগত হতে পারে; বিশেষ রাসায়নিকের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থেকেও হতে পারে; আবার মানসিকও হতে পারে। কিন্তু গাঁজা যে শুধু আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করছিল এমনটা নয়। বরং বলা যায় আমার আবেগগুলো সামলানোর ধরনই পাল্টে দিয়েছিল। মায়েরা যেভাবে বাচ্চাদের আগলে রাখে, ঠিক তেমনি আমাকে আগলে রেখেছিল গাঁজা। জানি, কতটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাটা।

সোজা কথায়, আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল গাঁজার নেশা।

বিখ্যাত সাইকোঅ্যানালিস্ট ডঃ বিয়ন শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের বিপদ থেকে রক্ষা করার মায়েরা যে তাগিদ, সেটাকে আখ্যায়িত করেছেন ‘সংযমন হিসেবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে, শৈশবকাল কিন্তু নিছক আনন্দের খোরাক নয়। বরং এর প্রতি পদে পদে আছে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। একটা বাচ্চা শুরুতে নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না। ক্ষুধা লাগলেও ভয় পায় আবার বাথরুম পেলেও ভয় পায়। সেজন্যেই আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন আমাদের মায়ের। কারণ মায়েরা যখন এসব চাহিদা পূরণ করে, তখন থেকেই নিজেদের খুঁজে পেতে শুরু করি আমরা। এক পর্যায়ে গিয়ে নিজেদের সাহায্য নিজেরাই করতে পারি। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতাটা নির্ভর করে মায়ের ‘সংযমন ক্ষমতা কতটা নির্ভরযোগ্য সেটার ওপরে। ডঃ বিয়নের মতে কেউ যদি শৈশবে এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে বাকিটা জীবন একধরনের অজানা আশঙ্কা নিয়ে কাটাতে হবে তাকে। আর চিত্তের সেই অস্থিরতা কমানোর জন্যেই মাদক বা নেশাজাতীয় বস্তুর শরণাপন্ন হয় মানুষ। অনেককেই বলতে শুনবেন যে নার্ভ ঠিক রাখার জন্যে ড্রিঙ্ক করে তারা। আমার গাঁজার প্রতি আসক্তির কারণও

এটাই।

থেরাপি চলাকালীন সময়ে রুথের সাথে গাঁজার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি। বারবার ছেড়ে দেয়ার কথা ভেবেছি, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারিনি। রুথ তখন বলে, জোর করে কোন কিছু করার ফল কখনোই ভালো হয় না। এর চেয়ে বরং জোর করে গাঁজার নেশা ছাড়ার চেষ্টা করার চাইতে আমার এটা মেনে নেয়া উচিত যে স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্যে নেশাটার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি আমি। আমার জীবনে গাঁজার প্রভাবটা তখন অবধি ইতিবাচকই ছিল। এমন একটা সময় আসবে যখন আর স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে গাঁজার কোন প্রয়োজন হবে না। তখন নেশাটা খুব সহজেই পরিত্যাগ করতে পারবো।

ঠিকই বলেছিল রুথ। ক্যাথির প্রেমে পড়ার পর গাঁজার নেশা কেটে যায়। তখন বরং ওর প্রেমে নেশাতুর থাকতাম সারাটা সময়, তাই মন ভালো করার জন্যে বাড়তি কোন কিছুই দরকার ছিল না। তাছাড়া ক্যাথির ধূমপানের অভ্যাস না থাকায় ব্যাপারটা আরো সহজ হয় আমার জন্যে। ক্যাথির মতে গাঁজাখোরদের ইচ্ছেশক্তি বলতে কিছু নেই আর তাদের পরোটা জীবন একটা ঘোরের মধ্যেই কাটে। যদি ছয়দিন আগে তাদের শরীরের কোথাও কেটে যায়, তাহলে ছয়দিন পরে গিয়ে সেটা বুঝতে পারবে। ক্যাথি আমার অ্যাপার্টমেন্টে ওঠার দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গাঁজা ফোকা ছেড়ে দেই আমি।

ক্যাথির বান্ধবী নিকোলের পার্টিটায় না গেলে আমি হয়তো জীবনে আর কখনো ঠোঁটে গাঁজা ছোঁয়াতাম না। নিউ ইয়র্কে চলে যাবার আগে বড় একটা পার্টি দেয় সে। কিন্তু ওখানে ক্যাথি বাদে আমার পরিচিত আর কেউ না থাকায় কিছুক্ষণ বাদেই একা হয়ে পড়ি। এসময় গোলাপী চশমার এক গাউগোটা লোক আমার দিকে জয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে চলবে নাকি? না করে দিতে গিয়েও কেন যেন থেমে যাই। কারণটা ঠিক বলতে পারবো না। হয়তো ক্যাথি জোর করে ওরকম একটা পার্টিতে নিয়ে যাওয়ায় অবচেতন মনে অসন্তুষ্টি কাজ করছিল। চারপাশে তাকিয়ে যখন ওকে দেখলাম না, মাথায় জেদ চেপে গেল। জয়েন্টটা ঠোঁটে নিয়ে লম্বা একটা টান দিলাম।

আর ঠিক এভাবেই আবারো পুরনো নেশাটা পেয়ে বসলো আমাকে। মাঝখানে যে লম্বা একটা সময় গাঁজা ছাড়া ছিলাম, এমনটা মনেই হচ্ছিল না। যেন বিশ্বস্ত

কুকুরের মত নেশাটা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। ক্যাথিকে অবশ্য কিছু বলিনি এ ব্যাপারে। বরং তক্কে তক্কে ছিলাম। ছয় সপ্তাহ পর নিজ থেকেই হাজির হলো সুযোগ। নিকোলের সাথে দেখা করতে এক সপ্তাহের জন্যে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল ক্যাথি। তার অনুপস্থিতিতে একাকীত্ব আর একঘেয়ে সময় কাটানোর জন্যে গাঁজার শরণাপন্ন হই আবারো। পরিচিত কোন ডিলার নেই আমার। তাই ছাত্র বয়সে যা করতাম, সেই পথেই হাঁটলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হয়ে গেলাম ক্যামডেন টাউন মার্কেটের উদ্দেশ্যে।

স্টেশন থেকে বাইরে পা দিতেই গাঁজার ঘ্রাণ এসে লাগলো নাকে। সেই সাথে ধপ আর নানারকম খাবারের গন্ধ। ক্যামডেন লকের পাশে অবস্থিত ব্রিজটায় পৌঁছে যাই খানিক বাদেই। পর্যটকদের ভিড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। চারপাশে বেশিরভাগই কিশোর-কিশোরী।

ইতিউতি তাকিয়ে কোন ডিলারের দেখা পেলাম না। আগে ব্রিজ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পাশ থেকে ডাকাডাকি করতে ডিলারের দল। এসময় লক্ষ্য করলাম জনতার ভিড়ে দু'জন পুলিশ অফিসার হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারা স্টেশনের দিকে চলে যেতেই ভোজবাজির মত আমার পাশে উদয় হলো একজন।

“লাগবে নাকি, বস?”

ভালোমতো তাকানোর পর খেয়াল করলাম খাটো করে একটা লোক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দূর থেকে দেখলে অবশ্য শারীরিক গঠনের কারণে কিশোর মনে হবে। সামনের দুটো দাঁত না থাকায় কথা বলার সময় মখ থেকে বাতাস বেরিয়ে শিষের মতন শব্দ হয়।

“একদম টাটকা জিনিস। লাগবে?”

মাথা নেড়ে সাই জানালাম।

মাথা নাড়িয়ে তাকে অনুসরণের ইশারা করে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটা দিল। গলি-ঘুপটি পেরিয়ে একটা পাবে উপস্থিত হলাম কিছুক্ষণ পর। ভেতরটা মোটামুটি খালি হলেও পরিবেশ একদম নোংরা। বমি আর সিগারেটের গন্ধে টেকা দায়।

“বিয়ার, বার কাউন্টারের কাছে গিয়ে বলে সে। উচ্চতা আরেকটু কম হলেই কাউন্টারের ওপরের জিনিস দেখতে পেত না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে আধুগ্ধাস বিয়ার কিনে দেই। গ্লাস নিয়ে একদম পেছনের টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে...আমি বসি তার

উল্টোদিকে। এরপর টেবিলের নিচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে সেলোফেনে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দেয় সে। দাম চুকিয়ে উঠে পড়ি।

বাসায় এসে দ্রুত প্যাকেটটা খুলে ফেলি, মনে মনে আশঙ্কা করছিলাম হয়তো আমাকে ঠকিয়ে দিয়েছে লোকটা। কিন্তু পরিচিত গন্ধটা নাকে আসতেই বুঝলাম যে ভেতরে ঠিক জিনিসটাই আছে। মনে হচ্ছিল যেন হারানো কোন বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি।

তখন থেকে ফ্ল্যাটে একা সময় কাটানোর সুযোগ পেলেই আপনা আপনি গাঁজা বের করে ফেলি।

সেই রাতে যখন ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে দেখলাম ক্যাথি নেই, একটা জয়েন্ট তৈরি করে ফেললাম। বাথরুমের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শেষ করি জয়েন্টটা। কিন্তু খুব অল্প সময়ে বেশি গাঁজা টানার ফলটাও পেলাম হাতেনাতে। মাথাটা একদম হালকা হয়ে গেল। নেশা ধরেছে খুব ভালোভাবেই। এমনকি হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবুও ধীরে ধীরে গন্ধ দূর করার জন্যে এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করলাম চারপাশে, দাঁত মাজলাম। সব শেষে গোসল করে লিভিং রুমের সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

টিভি রিমোটটা খুঁজে পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকানোর পর খেয়াল করলাম কফি টেবিলে ক্যাথির ভোলা ল্যাপটপের পেছনে রাখা ওটা। কাঁপাকাঁপা হাতে রিমোট নিতে গিয়ে নড়ে গেল ল্যাপটপটা। সাথে সাথে জ্বলে উঠলো স্ক্রিন। ইমেইল অ্যাকাউন্ট থেকে লগ-আউট করেনি ক্যাথি। কোন এক অদ্ভুত কারণে নজর সরাতে পারছিলাম না স্ক্রিন থেকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লেখাগুলো পড়তে শুরু করলাম; মনে হলো কেউ ভারি কোন কিছু দিয়ে সজোরে বাড়ি বসিয়েছে আমার মুখ বরাবর। ইমেইলের হেডিং আর সাবজেক্টে ‘সেক্সি’, ‘সেক্স’-কথাগুলো বড় অচেনা ঠেকছিল। ইঅউইউণ২২ নামের এক ইউজার পাঠিয়েছে ইমেইলগুলো।

ওখানেই থেমে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু থামিনি।

সর্বশেষ যে ইমেইলটা এসেছে সেটায় ক্লিক করলাম।

Subject: RE: লিটল মিস সেক্সি

From: Katerama_1

To: BADBOY22

আমি বাসে। তোমার জিনিসটাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে এখনই। ওটার

স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত ভালো লাগবে না। নিজেকে একটা বেশ্যা মনে হচ্ছে!

Sent from my iPhone

Subject: RE: re: wjUj wgm tmw.

From: BADBOY22

To: Katerama 1

তুমি তো বেশ্যাই! আমার বেশ্যা। তোমার রিহার্সেলের পর দেখা করি?

Subject: RE: re: re: re: লিটল মিস সেক্সি

From: Katerama 1

To: BADBOY22

ঠিক আছে।

Sent from my iPhone

Subject: RE: re: লিটল মিস সেক্সি

From: BADBOY22

To: Katerama 1

দেখা যাক কখন বের হতে পারি। জানাবো।

Subject: RE: re: re: re: re: লিটল মিস সেক্সি

From: Katerama 1

To: BADBOY22

ঠিক আছে। ৮.৩০? ৯.০০?

Sent from my iPhone

ল্যাপটপটা সাথে করে সোফায় নিয়ে এলাম। কোলের ওপর রেখে কতক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম বলতে পারবো না। দশ মিনিট? বিশ মিনিট? আধা ঘন্টা? হয়তো এর চেয়েও বেশি। সময় যেন বড় ধীর হয়ে গেছে।

এতক্ষণ যা দেখলাম সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। কিন্তু মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না। ভুল দেখিনি তো? নাকি গাঁজার প্রভাবে স্বাভাবিক কথোপকথনের উল্টোপাল্টা মানে বের করছি।

জোর করে আরেকটা ইমেইল পড়লাম। এরপর আরেকটা।

একসময় ক্যাথির BADBOY22-কে পাঠানো সবগুলো ইমেইলই পড়ে ফেললাম। অনেকগুলোয় যৌনতার ইঙ্গিত, অশ্লীল কথাবার্তায় ভরপুর। আর বাকিগুলোয় প্রাণ খুলে কথা বলেছে ক্যাথি, কোন রাখঢাক করেনি। কথাগুলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন

মাতাল অবস্থায় লেখা, হয়তো আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর। নিজের ঘুমন্ত অবস্থার ছবি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। আর পাশেই ক্যাথি বসে অন্য একটা লোককে এই অন্তরঙ্গ মেসেজগুলো পাঠাচ্ছে। যার সাথে শারীরিক সম্পর্কও আছে ওর।

ভুট করে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নেশা কেটে গেছে পুরোপুরি।

পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেই ল্যাপটপটা পাশে সরিয়ে রেখে বাথরুমে দৌড় দেই। কমোডের সামনে ঠিকমত হাঁটু গেড়ে বসার আগে বমি করে ফেললাম।

“গতবারের চেয়ে একটু অন্যরকম লাগছে,” বললাম।

কোন সাড়া পেলাম না।

আমার উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে আছে অ্যালিসিয়া, নজর জানালার দিকে। পিঠ শক্ত করে একদম সোজা হয়ে বসেছে আজ। অনেকটা চেলো বাদকদের মত লাগছে দেখতে। কিংবা সদা সতর্ক কোন সেনা।

“গত সেশনটা কিভাবে শেষ হয়েছিল, সেটাই ভাবছিলাম। আমাকে ওভাবে আঘাত করেছিলেন দেখেই বাধ্য হয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়েছিল আপনাকে।”

এবারেও কোন জবাব পেলাম না। একটু ইতস্তত বোধ করছি এখন।

“ব্যাপারটা কি আমার জন্যে কোন পরীক্ষা ছিল? আমি কেমন ধাতুতে গড়া সেটাই দেখতে চাইছিলেন? খুব সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নই, এটা জেনে রাখুন। সব রকম পরিস্থিতি সামলে নেয়ার ক্ষমতা আছে।”

এখনও জানালার বাইরের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালিসিয়া। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম আমি।

“আপনাকে একটা কথা বলতে চাই অ্যালিসিয়া। আমি কিন্তু আপনার পক্ষে। আশা করি একদিন এটা বিশ্বাস করবেন। ভরসা তৈরি হতে সময় লাগে, জানি। আমার পুরনো থেরাপিস্ট প্রায়ই বলতেন যে ঘনিষ্ঠতার জন্যে নিয়মিত মনের ভাব আদান প্রদানের প্রয়োজন। আর সেটা রাতারাতি হয় না।”

শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া। সময় কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এখন মনে হচ্ছে এটা থেরাপি সেশন তো নয়, ধৈর্য্য পরীক্ষা।

এখন পর্যন্ত কোন দিক দিয়েই অগ্রগতি হয়নি। বোধহয় সময় নষ্ট করছি। ডুবন্ত জাহাজ থেকে ইঁদুরদের লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারে ভুল বলেনি ক্রিস্টিয়ান। এরকম

একটা জায়গায় যোগ দিয়ে মাস্তুল ধরে কোনমতে ভেসে থাকার মানে হয় না। কি আছে এখানে?

উত্তরটা আমার সামনেই। যেমনটা ডায়োমেডেস সতর্ক করেছিলেন, মৎসকুমারীর বেশে অ্যালিসিয়া আমাকে আমার সর্বনাশের দিকে ডেকে এনেছে।

মনে মনে হঠাই ভীষণ মরিয়া হয়ে উঠলাম। ইচ্ছে করছে চিৎকার করি, কিছু একটা বলুন। যা খুশি। একবারের জন্যে মুখ খুলুন।

কিন্তু সেরকম কিছু করলাম না। বরং থেরাপির স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। ধীরে সুস্থে না এগিয়ে সরাসরি কাজের কথা তুলোমঃ

“আপনার নীরবতা নিয়ে কথা বলতে চাই। এই নীরবতার পেছনের অর্থটা বুঝতে চাই...আশা করি বোঝাতে পারছি আপনাকে। কথা বলা কেন বন্ধ করলেন সেটা জানাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি।”

আমার দিকে তাকালোও না অ্যালিসিয়া। কথা কানে যাচ্ছে তো?

“জানেন, আমার মাথায় একটা ছবি ভাসছে এখন। মনে হচ্ছে কেউ যেন জোর করে নিজেকে দমিয়ে রেখেছে, ফেটে পড়বে যে কোন মুহূর্তে, অনবরত ঠোঁট কামড়াচ্ছে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। প্রথম যখন থেরাপি শুরু করেছিলাম, কাঁদতে পারতাম না কোনভাবেই। মনে হতো সেই অশ্রুপ্রবাহে আমি নিজেই হারিয়ে যাবো। আপনারও বোধহয় সেরকমই অনুভূত হচ্ছে। এটা জেনে রাখুন যে এই যাত্রায় আপনার সঙ্গি আমি। আমাকে ভরসা করতে পারেন।”

মৌনতা।

“আমি নিজেকে একজন রিলেশনাল থেরাপিস্ট ভাবতে পছন্দ করি। এর অর্থ কি জানেন?”

মৌনতা।

“এর অর্থ আমার ধারণা ফ্রেড কিছু ব্যাপারে ভুল বলেছিলেন। একজন থেরাপিস্টকে কোনভাবেই সাদা কাগজের সাথে তুলনা করা যাবে না। সচেতন বা অবচেতন মনে নিজেদের সম্পর্কে অনেক কিছুই আমরা প্রকাশ করে ফেলি। মানে কেউ কেমন মোজা পরেছে, কিভাবে কথা বলছে, কিভাবে বসেছে-এগুলো দেখেও তো অনেক কিছু বোঝা যায়। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি লুকোতে পারবো না আমি।”

মুখ তুলল অ্যালিসিয়া। ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখন- আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে? অন্তত তার মনোযোগ আকর্ষণে তো সক্ষম হয়েছি। নড়েচড়ে বসলাম চেয়ারে।

“মূলত যেটা বলতে চাচ্ছি, এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি? চাইলে সত্যটাকে উপেক্ষা করতে পারি। ধরে নিতে পারি যে এই থেরাপিটার মধ্যমণি কেবলই আপনি। অথবা এটা মেনে নিতে পারি যে গোটা ব্যাপারটাই দ্বিপাক্ষিক। এভাবে সামনে এগোনোই বোধহয় সুবিধের হবে।”

আমার বাম হাতটা সামনে মেলে ধরে আঙুটি পরা আঙুলটা নাচালাম।

“এই আঙুটিটা দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার?”

ধীরে ধীরে আঙুটিটার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া।

“নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি বিবাহিত। আমার একজন স্ত্রী আছে যার সাথে নয় বছর ধরে সংসার করছি।”

কোন জবাব পেলাম না এবারেও, তবে আঙুটিটার দিক থেকে দৃষ্টি সরায়নি অ্যালিসিয়া।

“আপনার বিবাহিত জীবন তত সাত বছরের ছিল, তাই না?”

জবাব নেই।

“আমার স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি। আপনি কি স্বামীকে ভালোবাসতেন?”

নড়ে উঠলো অ্যালিসিয়ার চোখজোড়া। আমার মুখের ওপর এসে স্থির হলো দৃষ্টি। একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকি লম্বা একটা সময়।

“ভালোবাসা কিন্তু নানারকম অনুভূতির মিশেল, তাই না? ভালো খারাপ দুটোই। আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, ওর নাম ক্যাথি। মাঝে মাঝে কিন্তু ভীষণ রাগও হয়...সেই সময়গুলোয় ওকে ঘৃণা করি।

এখনও অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালিসিয়া; নিজেকে রাস্তা পার হবার সময় হেডলাইটের সামনে জমে যাওয়া ছোট খরগোশের মতন মনে হচ্ছে আমার। পার্সোনাল অ্যাটাক অ্যালার্মটা আজকে হাতের কাছেই রেখেছি। ওটার দিকে না তাকাতে বেশ কসরত করতে হলো।

জানি যে এভাবে কথা চালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু নিজেকে থামাতে পারলাম না। গোঁয়ারের মতন বলতেই থাকলাম:

“এই ঘৃণার অর্থ কিন্তু এটা নয় যে পুরোপুরি মন থেকে অপছন্দ করি ওকে। বরং বলা যায় আমার মনের একটা ক্ষুদ্র অংশ এরকম অনুভূতির জন্যে দায়ি। সেসময়টা ভালোবাসা আর ঘৃণা সহাবস্থান করে। গ্যাব্রিয়েলের ক্ষেত্রেও বোধহয় ওরকম কিছুই হয়েছিল। আপনার একটা অংশ তাকে ভালোবাসতো, আবার একটা অংশ তাকে ঘৃণাও করতো।

মাথা ঝাঁকায় অ্যালিসিয়া। যেন অমত প্রকাশ করছে আমার কথার সাথে। ভালো করে খেয়াল না করলে ধরতেই পারতাম না। অবশেষে! অবশেষে একটু হলেও প্রতিক্রিয়া দেখালো অ্যালিসিয়া। উত্তেজিত হয়ে উঠলাম ভেতরে ভেতরে। জানি যে থেমে যাওয়া উচিত, কিন্তু থামলাম না।

“আপনার একটা অংশ তাকে ঘৃণা করতো,” আগের তুলনায় দৃঢ়কণ্ঠে বললাম।

আবারো মাথা ঝাঁকালো অ্যালিসিয়া। চোখে আগুন জ্বলছে রীতিমতো। রেগে উঠছে, ভাবলাম।

“এটাই সত্য, অ্যালিসিয়া। নাহলে তাকে খুন করতেন না আপনি।”

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো অ্যালিসিয়া। ভাবলাম এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে আবারো। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে দরজার দিকে হনহন করে হেঁটে গেল সে। হাত মুঠো করে সজোরে কিল দিল কয়েকবার।

নবে চাবি ঘোরানোর শব্দ কানে এলো সাথে সাথে-বাইরেই অপেক্ষা করছিল ইউরি। অ্যালিসিয়া যে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েনি এটা দেখে স্বস্তি ফুটলো তার চেহায়ায়। তাকে পাশ কাটিয়ে করিডোরে বেরিয়ে যায় অ্যালিসিয়া।

“আস্তে যাও, আস্তে আমার দিকে তাকালো নজর ফেরায় ইউরি। “সব ঠিক আছে তো? কি হয়েছে?”

কিছু বললাম না জবাবে। উদ্ভট দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে যায় সে। এখন ঘরে একা আমি।

গর্দভ, মনে মনে বলে উঠলাম। আস্ত গর্দভ। এটা কি করলাম আমি? তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বেশি বেশি বলে ফেলেছি। পেশাদার কোন সাইকোথেরাপিস্টের এরকম ভুল করা সাজে না। অ্যালিসিয়ার মানসিক অবস্থা জানতে গিয়ে নিজেকে উন্মোচিত করে দিয়েছি পুরোপুরি।

কিন্তু অ্যালিসিয়ার ব্যাপারটাই এমন। তার মৌনতা অনেকটা আয়নার মতন-যে

আয়নায় নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

আর দশ্যটা সবসময় সুখকর হয় না।

ক্যাথির ল্যাপটপটা এভাবে খুলে রেখে যাওয়ার পেছনে যে কোন কারণ আছে সেটা বোঝার জন্যে আপনাকে সাইকোথেরাপিস্ট হতে হবে না। হয়তো অবচেতন মনে হলেও সে চাইছিল যাতে আমি তার পরকীয়ার বিষয়টা জানতে পারি।

পদ্ধতিটা কাজে দিয়েছে। জেনে গেছি আমি।

সেই রাতের পর থেকে এখন অবধি ওর সাথে কথা হয়নি আমার। ও বাসায় আসার পর ঘুমের অভিনয় করেছি, এরপর সকাল সকাল ও ওঠার আগেই বেরিয়ে গেছি। ওকে এড়িয়ে চলছি-নিজেকে এড়িয়ে চলছি। পুরো ব্যাপারটা মেনে নিতে এখনও কষ্ট হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সত্যটার মুখোমুখি হতে হবে, নতুবা নিজেকে হারিয়ে ফেলবো আবারো। শক্ত হও, একটা জয়েন্ট রোল করতে করতে নিজেকে বিড়বিড় করে বললাম। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জয়েন্টটা শেষ করে চলে এলাম রান্নাঘরে। কেবিনেট থেকে ওয়াইনের বোতল বের করে একটা গ্লাসে ঢেলে নিলাম। মাথায় নেশা ধরে গেল এতক্ষণে।

চেপ্টা করেও গ্লাসটা তুলতে পারলাম না। বরং হাত থেকে ছুটে কাউন্টারের ওপর পড়ায় ভেঙেই গেল। কাঁচের টুকরো লেগে একটা আঙুল কেটে গেছে।

হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। কাঁচের টুকরোয় রক্ত, আমার হাতে রক্ত, সাদা টেবিলের ওপর রক্ত। একটা কিচেন ন্যাপকিন ছিঁড়ে নিয়ে কাটা আঙুলে গিঁট দিয়ে বেঁধে রক্তের ধারা সামাল দেয়ার চেষ্টা করলাম। হাতটা ওপরে তুলে রেখেছি। আঙুল থেকে রক্ত টুঁইয়ে টুঁইয়ে পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে চামড়ার ভেতরের শিরাগুলো কেউ উল্টে দিয়েছে।

ক্যাথির ব্যাপারে ভাবছি।

এরকম একটা মুহূর্তে সবার আগে ক্যাথির কথাই মনে আসে আমার। যখনই কোন বিপদে পড়ি বা সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়, ওর কাছে সপে দেই নিজেকে। গালে একবার চুমু খেয়েই আমার ভেতরের সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে পারে ক্যাথি। আমি চাই, সবসময় আমার খেয়াল রাখুক ও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রাতারাতি আমাদের মাঝে একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে। ওকে হারিয়ে ফেলেছি আমি। অদ্ভুত বিষয়, সত্যটা জানার পর এখন অবধি চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়ায়নি আমার, আপ্রাণ

চেপ্টা করেও কাঁদতে পারছিলাম না। ভেতরটা যেন কেউ কাঁদা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

“কেন, বারবার বলতে থাকি আমি, “কেন।”

ঘড়ির কাটার শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। স্বাভাবিকের চাইতে জোরে মনে হচ্ছে আওয়াজটা। সেই আওয়াজের ওপর মনোযোগ দিয়ে বিক্ষিপ্ত মনটাকে স্বাভাবিক করতে চাইলাম; কিন্তু আমার মাথার ভেতরে একসাথে কয়েকটা কণ্ঠ তারস্বরে চিৎকার করেই চলেছে। এরকমটাই তো হবার কথা ছিল, ভাবলাম। তার জন্যে যে আমিই যথেষ্ট, এটা ধরে নেয়াই তো মারাত্মক ভুল। আমি একটা আস্ত অপদার্থ। বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়ালেই কি চাঁদটাকে পাওয়া যায়? আমার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে ওর কাছে। আসলে ওকে নিজের করে পাবার যোগ্যতা আমার কখনোই ছিল না। মাথার ভেতরে এই চিন্তাগুলোই ঘুরপাক খেতে লাগলো বারবার।

ওকে চিনতে ভুল করেছিলাম। ইমেইলগুলো পড়ার পর থেকে মনে হচ্ছে এতদিন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তির সাথে সংসার করেছি আমি। এখন সত্যটা বুঝতে পারছি। ক্যাথি আমাকে আমার দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেনি-আসলে কাউকে উদ্ধার করার ক্ষমতাই নেই ওর। কোন দেবী নয়। সে, বরং খারাপ চরিত্রের ব্যাভিচারী একটা মেয়ে। ওকে আর আমাকে নিয়ে সুখি জীবনের আকাশ কুসুম যেসব কল্পনা করে এসেছি এতদিন, তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়লো সব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের সেই দিনগুলোয় যেন ফিরে গেলাম আবারো। প্রতিনিয়ত নিজেকে শেষ করে দেয়ার কথা মনে হতো যখন। সেই ভোতা অনুভূতিটা ফিরে এসেছে। মার কথা মনে হলো এসময়। তাকে ফোন দিব? আমার এরকম একটা পরিস্থিতিতে তার কাছে আশ্রয় চাইবো? কল্পনা করলাম যে ফোনের ওপাশ থেকে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আমার সাথে কথা বলছে সে। গলার স্বর কতটা কাঁপবে, সেটা নির্ভর করে বাবার মেজাজ আর সে কতটা মাতাল, এই দুটো বিষয়ের ওপর। হয়তো সহানুভূতি নিয়েই আমার কথা শুনবে সে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকবে অন্যখানে। বাবা আর তার বদমেজাজ নিয়েই ভাববে সারাক্ষণ। এরকম একটা মানুষ কিভাবে আমার সাহায্য করবে? একজন ডুবন্ত ব্যক্তি তো আরেকজনকে বাঁচাতে পারে না।

বাসা থেকে বের হতে হবে। ভেতরে রীতিমতো দম আটকে আসছে এখন। তার ওপর লিলিগুলোর উটকো গন্ধ। খোলা বাতাসে শ্বাস নেয়া প্রয়োজন।

বেরিয়ে এলাম ফ্ল্যাট থেকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকি। কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছি এদিক সেদিক। মনে মনে ক্যাথি আর আমার সম্পর্কের কথা ভাবছি। বোঝার চেষ্টা করছি কবে থেকে এসবের শুরু। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘনঘন কথা কাটাকাটি হতো আমাদের, প্রায়ই দেরি করে বাসায় ফিরতো ও। কিন্তু আমার প্রতি তার আবেগে তো কখনো ঘাটতি ছিল বলে মনে হয়নি। এটা কি করে সম্ভব? পুরোটা সময়ই অভিনয় করেছে ও? আমাকে কি আদৌ কখনো ভালোবেসেছিল?

ওর বন্ধুদের সাথে প্রথম দেখা হবার দিনে ক্ষণিকের জন্যে হলেও সন্দেহ ভর করেছিল আমার মনে। ওরা সবাই অভিনেতা-অভিনেত্রী। নিজেদের ছাড়া কিছু বোঝে না, অন্যদের সমালোচনা করতেই থাকা ক্রমাগত। হঠাৎই স্কুলের দিনগুলোয় ফিরে গেলাম, দূর থেকে অন্য বাচ্চাদের খেলা করতে দেখতাম তখন। আমাকে কেউ খেলায় নিত না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে ক্যাথি ওদের মতো নয়, কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। যে রাতে বারে ওর সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল, তখন যদি ওর বন্ধুরা উপস্থিত থাকতো, তাহলে কি আমাদের সম্পর্কটা হতো না? অবশ্যই হতো। ক্যাথির ওপর প্রথমবার চোখ পড়ার পর থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম যে আমার ভাগ্যটা ওর সাথেই বাঁধা।

কী করা উচিত এখন আমার?

অবশ্যই ক্যাথিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা উচিত এ ব্যাপারে। যা দেখেছি, সেগুলো খুলে বলা উচিত। প্রথমে হয়তো অস্বীকার করবে, কিন্তু প্রমাণের কথা বললে সত্যটা স্বীকার না করে পারবে না। অনুশোচনার বশবর্তী হয়ে তখন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে সে, তাই না?

আর যদি না চায়? যদি উল্টো আমাকেই কথা শোনায়ে? পুরো বিষয়টা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কি করবো?

দুজনের কথা চিন্তা করলে, হারানোর ঝুঁকিটা আমারই বেশি। ক্যাথির মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না, সবসময়ই বলে এসেছে যে ওর নার্ভ খুব শক্ত। নিজেকে ধাতস্থ করে আমাকে ভুলে যাবে একসময়। কিন্তু আমি তো ভুলতে পারবো না। কি

করে ভুলবো? ক্যাথিকে ছাড়া আমাকে আবাবো ফিরে যেতে হবে সেই একাকীত্ব আর শূন্যতা ভরা জীবনে। ওর মত কারো সাথে আর কখনো পরিচয়ও হবে না। কারো প্রতি এরকম আত্মিক বন্ধনও টের পাবো না। ও হচ্ছে আমার জীবনের সত্যিকারের ভালোবাসা, আমার জীবন। ওকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ও, এটা সত্য। তবুও ভালোবাসি ওকে।

আমার মাথা বোধহয় আসলেও খারাপ।

পাখির ডাকে হুঁশ ফিরে পেলাম। চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখি বাসা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি হাঁটতে হাঁটতে। অবাক হয়ে খেয়াল করলাম যে এখন যেখানে আছি, তার কয়েকটা রাস্তা পরেই রুথের বাসা।

কোনরকমের পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই বিপর্যয়ের মুহূর্তে অবচেতন মনে হাঁটতে হাঁটতে আমার থেরাপিস্টের কাছে চলে এসেছি। অতীতেও এমনটাই করতাম। আমার অবস্থা কতটা খারাপ, তা আরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখন।

কিন্তু এটা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তার কি আছে? ভাবলাম। হ্যাঁ, একজন সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে কাজটা অপেশাদার, কিন্তু এ মুহূর্তে আমি মরিয়া, সাহায্য দরকার। রুথের সবুজ দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে কলিংবেলে চাপ দিলাম।

দরজা খুলতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো তার। হলওয়াতে বাতি জ্বলে দরজা খুলল, চেইনটা অবশ্য সরায়নি।

দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে মাথা বের করলো রুথ। বয়সের ছাপ পড়েছে। চেহারায়। আশির কোঠায় এখন তার বয়স। আগের তুলনায় ভেঙে পড়েছে শরীর। ফ্যাকাসে গোলাপী রঙের নাইট গাউনের ওপরে একটা ধূসর কার্ডিগান পরে আছে।

“হ্যালো?” বিচলিত কণ্ঠে বলল রুথ। “কে ওখানে?”

“হ্যালো, রুথ,” আলোয় বেরিয়ে এলাম।

আমাকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে গেল সে। “খিও? তুমি হঠাৎ-” আমাকে আপাদমস্তক দেখলো একবার, হাতে কোনরকমে জড়ানো ব্যান্ডেজটার ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। “ঠিক আছো তুমি?”

“না, ঠিক নেই। ভেতরে আসতে পারি? আমি...আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।”

একমুহূর্তের জন্যেও দ্বিধা দেখতে পেলাম না রুথের দৃষ্টিতে, বরং আমার জন্যে

উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। “অবশ্যই,” মাথা নেড়ে বলল। “ভেতরে এসো।” চেইনটা আলগা করে সরে দাঁড়ালো সে।

ভেতরে পা দিলাম আমি।

আমাকে লিভিং রুমে নিয়ে এলো সে।

“চা খাবে?”

রুমটার কিছুই বদলায়নি। সেই আগের কার্পেট, ভারি পর্দা, ম্যান্টেলের ওপর রাখা রূপালী ঘড়ি, আর্মচেয়ার, নীল কাউচ। ভেতরে ভেতরে স্বস্তি অনুভব করলাম।

“সত্যি বলতে, চায়ের থেকে শক্ত কিছু হলেই ভালো হবে।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেও কিছু বলে না রুথ। মানাও করলো না। অবশ্য মানা যে করবে এরকমটা আশাও করিনি।

একটা গ্লাসে শেরি ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। কাউচে বসেছি আমি। আগে থেরাপির জন্যে আসলেও এখানেই বসতাম সবসময়। একদম বামদিকে, হাতলে হাত রেখে। আমার হাতের নিচের কাপড়টা এতদিনের ব্যবহারে পাতলা হয়ে এসেছে। থেরাপির জন্যে আসা অন্য রোগিরাও নিশ্চয়ই আমার মত আঙুল দিয়ে অনবরত খুটিয়েছে জায়গাটা।

গ্লাসে চুমুক দিলাম একবার। উষ্ণ আর অতিরিক্ত মিষ্টি তরলটুকু গিলতে কষ্ট হলেও কোন রা করলাম না। গোটা সময়টা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো রুথ। তবে দৃষ্টিটার মধ্যে অস্বস্তিদায়ক কিছু নেই। গত বিশ বছরে এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেনি সে। শেরির গ্লাসটা শেষ করার আগ পর্যন্ত মুখ খুললাম না।

“গ্লাস হাতে তোমার সামনে বসে থাকতে অদ্ভুত লাগছে, রুথ। জানি যে রোগিদের ড্রিং করাটা পছন্দ নয় তোমার।”

“তুমি তো আর আমার রোগি নো, থিও। এখন আমরা বন্ধু। আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, কোমল কণ্ঠে বলল রুথ, “এ মুহূর্তে একজন বন্ধুর খুব দরকার তোমার।”

“আমার অবস্থা এতটাই শোচনীয়?”

“হ্যাঁ। আর গুরুতর কিছু না হলে তো এভাবে আমার কাছ ছুটে আসতে না। তাও এত রাতে।”

“ঠিক ধরেছো। আসলে, আসলে আমার আর কোন উপায় ছিল না।”

“কি হয়েছে থিও? খুলে বলো সবকিছু।”

“জানি না কীভাবে বলবো। কোথা থেকে শুরু করবো।”

“একদম প্রথম থেকেই বলল নাই?”

মাথা নেড়ে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে শুরু করলাম। যা ঘটেছে, একে একে সব খুলে বললাম ওকে। কিভাবে আবারো গাঁজার নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছি, ক্যাথির ইমেইল চালাচালি, বাসায় দেরি করে আসা, পরকীয়া-সব। টের পাচ্ছিলাম যে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত কথা বলছি। আসলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে এগুলো বলে বুকটাকে হালকা করতে চাইছিলাম।

আমার কথার মাঝে কিছু বলল না রুথ। একমনে শুনে গেল পুরোটা। চেহারা দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না মনে কি চলছে। “তোমার জন্যে খুব কষ্ট লাগছে থিও। জানি যে ক্যাথি তোমার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কতটা ভালোবাসো ওকে।”

“হা। আমি-” ক্যাথির নামটা মুখে আনতে পারলাম না। গলা কেঁপে উঠলো। সেটা বুঝতে পেরে একটা টিস্যু বক্স আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো রুথ। এর আগে আমাদের সেশনের মাঝে ও এই কাজ করলে রেগে উঠতাম। বলতাম যে ইচ্ছে করে আমাকে কাঁদানোর চেষ্টা করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য সফলও হতো। কিন্তু আজ নয়। আজ যেন চোখের পানি শুকিয়ে গেছে আমার।

ক্যাথির সাথে পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই রুথের এখানে নিয়মিত যাতায়ত করতাম আমি। এমনকি আমাদের সম্পর্কের প্রথম তিন বছরেও থেরাপির জন্যে এসেছি। ক্যাথির সাথে পরিচয় হবার কিছুদিন পর একটা কথা বলেছিল রুথ। “জীবনসঙ্গি বেছে নেয়া অনেকটা থেরাপিস্ট বাছাই করার মতন। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, এই ব্যক্তি কি জীবনের প্রতিটা ধাপে সৎ থাকবে আমার প্রতি আমার অভিযোগগুলো শুনবে? ভুল স্বীকার করে নেবে? মিথ্যে ওয়াদা করবে না তো?”

ক্যাথিকে এই কথাগুলো বলেছিলাম আমি। তখন ও পরামর্শ দেয় নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করার। একে অপরকে আমরা কথা দেই যে কখনো পরস্পরের সাথে মিথ্যে বলবো না, কিছু লুকোবো না। সত্যিটাই বলবো সবসময়।

“কি হলো এটা?” বললাম। “ভুলটা কি আমার?”

মুখ খোলার আগে কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো রুথ। ও যা বলল শুনে অবাক না

হয়ে পারলাম না।

“এর জবাব জানাই আছে তোমার। সত্যটা কেবল স্বীকার করে নিতে হবে নিজের কাছে।”

“আমি জানি না,” মাথা ঝাঁকিয়ে বলি। “আসলেও জানি না।”

অস্বস্তিদায়ক একটা নীরবতা ভর করলো ঘরে। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম হাসিমুখে ইমেইলগুলো টাইপ করে চলেছে ক্যাথি। তৃপ্তি খেলা করছে চোখেমুখে। অচেনা লোকটার সাথে সম্পর্কে কোন রাখঢাক নেই। ওর। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করার বিষয়টা ওর কাছে একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতন। বাস্তব জীবনে অভিনয় করার মজাই আলাদা।

“আমাদের সম্পর্কটা একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে ওর কাছে।”

“এরকমটা মনে হবার কারণ?”

“কারণ জীবনে উত্তেজনার প্রয়োজন ওর। সোজা বাংলায়, নাটকীয়তা। প্রায়ই বলতো যে, আমাদের সম্পর্কটা পানসে হয়ে গেছে, সবসময় ক্লান্ত থাকি আমি, বেশি কাজ করি। বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে গত কয়েক মাসে। জ্বলে ওঠা শব্দটা ব্যবহার করেছে বারবার।”

“জ্বলে ওঠা?”

“একে অপরের সংস্পর্শে আমরা নাকি আর জ্বলে উঠি না।”

“ওহ, আচ্ছা।” মাথা নাড়ে রুথ। “এই ব্যাপারে তো আগেও কথা হয়েছে আমাদের, তাই না?”

“জ্বলে ওঠার ব্যাপারে?”

“ভালোবাসার ব্যাপারে। প্রায়ক্ষেত্রেই ভালোবাসার মধ্যে নাটকীয়তা খুঁজতে চাই আমরা। যেন বারবার একে অপরের জন্যে নাটুকে কিছু করাই ভালোবাসার নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা নীরব, নির্লিপ্ত।” লম্বা শ্বাস ছাড়ে রুথ। “ভালোবাসা হচ্ছে গভীর, প্রশান্ত একটা অনুভূতি। ধ্রুব। ক্যাথির প্রতি তোমার ভালোবাসার মধ্যে কোন খাদ নেই। কিন্তু সেই ভালোবাসাটুকু তোমাকে সে ফিরিয়ে দিতে পারছে কি না, এটা ভিন্ন প্রশ্ন।”

টিস্যুর বক্সটার দিকে চেয়ে আছি। রুথের কথার ধারণা ভালো লাগছে না। বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করি।

“আমারও দোষ আছে। মিথ্যে তো আমিও বলেছি, গাঁজার ব্যাপারটায়।”

হাসলো রুথ। “মারো মারো নেশা করা আর অন্য এক ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আমার। এই ব্যাপারটা থেকে কিন্তু আমরা মানুষটার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারি-সে এমন একজন, যে অবলীলায় মিথ্যে বলে যেতে সক্ষম। কোন প্রকার অনুতাপ ছাড়াই ভালোবাসার মানুষটাকে ঠকিয়ে চলেছে-”

“এটা তো নিশ্চিতভাবে বলতে পারো না তুমি।” কথাটা নিজের কানেই বড় খেলো শোনাচ্ছে। “হয়তো ভেতরে ভেতরে খারাপ লাগে ওর।”

মুখে বললেও কথাটা আমি নিজে বিশ্বাস করি না।

রুথও করলো না। মনে হয় না। আমার ধারণা মানসিক সমস্যায় ভুগছে সে। সহমর্মিতা, সততা, মায়া-ওর কাছে কিছু শব্দ মাত্র। কিন্তু তোমার মধ্যে কিন্তু এগুলোর কোন অভাব নেই।”

মাথা ঝাঁকালাম। “এটা সত্যি না।”

“এটাই সত্যি, থিও।” জোর দিয়ে বলল রুথ। “তোমার কি মনে হচ্ছে না যে আগেও এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছো?”

“ক্যাথির কারণে?”

মাথা ঝাঁকায় রুথ। “না, তোমার বাবা-মার কথা বলছি। আবারো সেই একই ঘটনা ঘটছে তোমার সাথে। হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন, কিন্তু অনুভূতিগুলো তো একই?”

“না,” হঠাৎই বিরক্তি ভর করলো আমার চিত্তে। “ক্যাথির সাথে যা ঘটছে, তার সাথে আমার শৈশবের কোন সম্পর্ক নেই।”

“আসলেই কি?” রুথের কণ্ঠে অবিশ্বাস। “সবসময় একজনকে খুশি করার অবিরাম চেষ্টা। এমন একটা মানুষ, যার মধ্যে মায়া বা আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই- তার ভালোবাসার পাত্র হবার চেষ্টা। আগের কথা মনে হচ্ছে না তোমার, থিও?”

হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল আমার, কিছু বললাম না।

দ্বিধাশ্রিত স্বরে পরবর্তী কথাগুলো বলল রুথ। “আমি জানি তোমার কতটা খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি চাই যেন বাস্তবতাটুকু বুঝতে পারো। ক্যাথির সাথে দেখা হবার অনেক আগে থেকেই এই বেদনাটা তোমার সঙ্গি। অনেক বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে কষ্টটাকে। খুব পছন্দের কেউ আমাদের পাল্টা ভালোবাসেনা, এই সত্যটা

স্বীকার করে নেয়া প্রচণ্ড কষ্টের, থিও। অসহ্য একটা অনুভূতি।”

ঠিক বলেছে সে। আসলে আমার ভেতরে জড়ো হওয়া বিশ্বাসঘাতকতার এই অনুভূতিটাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিলাম না এতক্ষণ। রুথের বলা-”খুব পছন্দের কেউ আমাদের পাল্টা ভালোবাসেনা”-কথাটা একই সাথে আমার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের গল্প। ব্যাপারটা শুধু ক্যাথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমার বাবা, নিঃসঙ্গ শৈশব, না পাবার কষ্ট-সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যা চাইছি, তা ভবিষ্যতেও পাবার সম্ভাবনা নেই।

রুথের মতে, এজন্যেই আমি ক্যাথিকে বেছে নিয়েছি। আমি যে একটা আস্ত অপদার্থ, ভালোবাসার অনুপযুক্ত-বাবার এই কথাটা প্রমাণ করার জন্যে এতদিন ধরে অপাত্রে নিজের ভালোবাসা ঢেলে এসেছি আমি, যার আসলে আমাকে ভালোবাসার কোন ইচ্ছেই নেই।

দু’হাতে মুখ ঢাকলাম। “তাহলে এমনটাই হবার ছিল? নিজের এই দশার জন্যে আমি নিজেই দায়ি? কোন আশাই নেই?”

“আশা নেই, এই কথাটা ভুল। তুমি তো আর বাবার করুণায় বেঁচে থাকা সেই ছোট থিও নও। এখন পরিণত বয়স্ক একজন মানুষ তুমি। এটাই তোমার সুযোগ-অতীতের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করো, নতুবা আসলেও প্রমাণ করো যে ভালোবাসার অনুপযুক্ত তুমি। আর একবার যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারো, তাহলে আর কখনো এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না।”

“কিভাবে করবো সেটা? ওকে ছেড়ে দেব?”

“পরিস্থিতিটা তোমার জন্যে আসলেও কঠিন।”

“কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে ওকে ছেড়ে দেয়াটাই আমার জন্যে উত্তম হবে, তাই না?”

“আজকের এই অবস্থানে আসতে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আবারো পুরনো সেই দিনগুলোয় ফিরে যাওয়া কোনভাবেই তোমার প্রাপ্য নয়। সেই মানসিক অত্যাচার আর সহ্য করতে পারবে না। যদি গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করো, তাহলে নিজেকে নিজেই ফাঁদে ফেলবে। তোমার জীবনে এমন কাউকে দরকার, যে মন থেকে ভালোবাসবে।”

“এভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার দরকার নেই, রুথ। সোজাসুজিই বলো কথাটা।

তোমার ধারণা ক্যাথিকে ছেড়ে দেয়া উচিত আমার।”

আমার চোখে দিকে তাকালো রুথ। “আমার মনে হয়, ওকে ছেড়ে দেয়াটাই তোমার জন্যে সবচেয়ে ভালো হবে। কথাটা শুধু থেরাপিস্ট হিসেবে নয়, পুরনো বন্ধু হিসেবে বলছি। আমার মনে হয় না এরকম একটা ঘটনার পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে তুমি। বড়জোর কিছুদিন মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে পারো। কিন্তু এরপর আবারো তোমাকে এই কাউচে ফিরে আসতে হবে। সত্যটা স্বীকার করে নাও থিও, নিজের আর ক্যাথির ব্যাপারে। মনে রেখ যে ভালোবাসার সম্পর্কে সততা নেই, সেটা। কখনোই প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না।”

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক চিরে।

“ধন্যবাদ রুথ, এভাবে খোলাখুলি কথাটা বলার জন্যে। আমি আসলেও কৃতজ্ঞ।”

বেরিয়ে আসার সময় দরজার কাছে আমাকে একবার জড়িয়ে ধরলো রুথ। আগে কখনো এরকম কিছু করেনি। ওকে বড্ড বেশি দুর্বল লাগছে আজকে, একদম নাজুক। ওর সেই পুরনো পারফিউমটার গন্ধটা নাকে আসতেই মনে হলো এই বুঝি কেঁদে ফেলবো। কিন্তু কাঁদলাম না। কিংবা, কাঁদতে পারলাম না।

বরং একবারও পিছে না ফিরে চলে এলাম সেখান থেকে।

বাসায় ফেরার জন্যে বাসে উঠে জানালার পাশে একটা সিটে বসলাম। বারবার ক্যাথির কথা মনে হচ্ছে, বিশেষ করে ওর সবুজ চোখজোড়ার কথা। কিন্তু রুথ ঠিকই বলেছে, যে ভালোবাসার সম্পর্কে সততা নেই, সেটা কখনোই প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না।

বাসায় ফিরে ক্যাথির মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।

ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

বাসায় এসে দেখি ক্যাথি ফিরেছে। কাউচে পা তুলে বসে কাকে যেন মেসেজ পাঠাচ্ছে সে।

“কোথায় গিয়েছিলে?” মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো ও।

“হাটতে বেরিয়েছিলাম একটু। রিহার্সাল কেমন গেল?”

“যেরকম যায়।”

ওকে মেসেজ টাইপ করতে দেখলাম, কার সাথে কথা বলছে? জানি যে কিছু

বলতে চাইলে এখনই বলা উচিত আমার। তোমার পরকীয়ার ব্যাপারে জেনে গেছি আমি, এভাবে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। কথাগুলো বলার জন্যে মুখও খুললাম, কিন্তু কোন শব্দ বেরুলো না। যেন বোবা হয়ে গেছি। আমি কিছু বলার আগেই ক্যাথি কথা বলে উঠলো। ফোন নামিয়ে রেখেছে।

“থিও, আমাদের কিছু বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলা উচিত।”

“কোন বিষয়ে?”

“তোমার কি আমাকে কিছুই বলার নেই?” ক্যাথির কণ্ঠে রুঢ়তার আভাস।

ইচ্ছে করে ওর দিকে তাকাচ্ছি না, ভয় হচ্ছে যে আমার মনের কথা পড়ে ফেলবে। রীতিমতো লজ্জা লাগছে, যেন আমি নিজেই বড় কোন ভুল করে ফেলেছি।

তবে ক্যাথির দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে আসলেও ভুল করেছি আমি। সোফার পেছন থেকে একটা বয়াম বের করে সামনের টেবিলে রাখলো ও। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে সাথে সাথে। এই ছোট বয়ামটাতেই গাঁজা রাখি আমি। আঙুল কেটে যাওয়ার পর লুকোতে ভুলে গেছি।

“এটা কি?” বয়ামটা উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো ক্যাথি।

“গাঁজা।”

“সেটা ভালো করেই জানি আমি। কিন্তু এটা এখানে কি করছে?”

“আমি নিয়ে এসেছি। মাঝে মাঝে

“মাঝে মাঝে কি? নেশা করো?”

কাঁধ ঝাঁকালাম জবাবে। এখনও চোখ নামিয়ে রেখেছি।

“এসব কি থিও! জবাব দাও!” চেষ্টা করে উঠলো ক্যাথি। মাঝে মাঝে মনে হয় যে তোমাকে চিনতে ভুল করেছি আমি।”

মাথায় আগুন ধরে গেলো। ইচ্ছে করছে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। পুরো ঘরে ভাঙচুর চালাই, আগুন লাগিয়ে দেই। বাচ্চাদের মত কাঁদতে কাঁদতে আবার ওর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করি।

কিন্তু এরকম কিছু করলাম না।

“চলো ঘুমিয়ে পড়ি,” বলে ওখান থেকে সরে আসলাম।

বিছানায় উঠেও কেউ কোন কথা বললাম না। অন্ধকারে ওর পাশে চুপচাপ শুয়ে থাকি। ঘুমের বালাই নেই আমার চোখে। ক্যাথির শরীরের উত্তাপ পরিস্কার টের

পাচ্ছি। ওর ঘুমন্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার সাথে কেন আলাপ করলে না? বলতে চাইছিলাম। কেন আসলে না আমার কাছে? তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তো আমিই। আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান করতে পারতাম আমরা। আমার সাথে কেন কথা বললে না? আমি তো এখানেই ছিলাম। ঠিক এখানেই।

ইচ্ছে করছে ওকে কাছে টেনে নিতে, শক্ত করে ধরে রাখতে। কিন্তু পারলাম না। আমি যে ক্যাথিকে ভালোবাসতাম, তার আর কোন অস্তিত্ব নেই।

অবশেষে চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগলো আমার। কিছুক্ষণের মধ্যে ভিজ়ে উঠলো দুই গাল।

অন্ধকারে, আমার নিঃশব্দ সেই কান্না দেখার মত কেউ ছিল না।

পরদিন সকালে আমাদের দৈনন্দিন নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটলো না। ও বাথরুমে গেলে কফি বানালাম দু'জনের জন্যে। রান্নাঘরে আসামাত্র কফির কাপটা ধরিয়ে দিলাম হাতে।

“রাতের বেলা অদ্ভুত শব্দ করছিলে,” বলল ক্যাথি। “ঘুমের মধ্যে কথাও বলছিলে।”

“কি বলছিলাম?”

“জানি না। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিনি। নেশার ঘোরে কেউ প্রলাপ বকলে সেটা বোঝার কথাও না।” একবার ঘড়ি দেখে চোখ গরম করে দিকে তাকালো ও। “যেতে হবে এখন, নাহলে দেরি হয়ে যাবে।”

কফি শেষ করে কাপটা সিন্কে রেখে দিল ক্যাথি। বেরিয়ে যাবার আগে গালে আলতো করে একবার চুমু খেল। ওর ঠোঁটের স্পর্শে প্রায় আঁতকে উঠলাম।

ক্যাথি যাওয়ার পর গোসলে ঢুকলাম। পানি ইচ্ছে করে বেশি গরম করেছি। আরেকটু গরম হলেই শরীর পুড়ে যাবে। সেই গরম পানির নিচে দাঁড়িয়েই বাচ্চাদের মত গলা ছেড়ে কাঁদলাম কিছুক্ষণ। গোসল শেষে শরীর থেকে পানি মুছে আয়নায় নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে তাকলাম। দেখে মনে হচ্ছে রাতারাতি বয়স ত্রিশ বছর বেড়ে গেছে।

সেখানেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।

ক্যাথিকে ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আমার নিজের একটা অংশ বিসর্জন দেয়া।

আর সেরকম কিছু করার জন্যে একদমই তৈরি নই আমি, রুথ যা-ই বলুক না কেন। মানুষ হিসেবে সে-ও ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। ক্যাথি আর আমার বাবার মধ্যে কোন মিল নেই; অতীতের পুণরাবৃত্তি ঘটছে না আমার জীবনে। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে আমার হয়তো একদিন ভুলটা স্বীকার করবে ক্যাথি, সবকিছু খুলে বলবে। তাকে মাফ করে দিব তখন। আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে আসবো।

কিন্তু ক্যাথিকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এমন ভাব করবো যেন ইমেইলগুলো কখনো পড়িইনি। ভুলে যাবো ওগুলোর কথা। এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। হার মানবো না আমি, ভেঙে পড়লে চলবে না। তাছাড়া আমার রোগীদের কথাও তো চিন্তা করতে হবে। তারা নির্ভর করে আছে আমার ওপরে।

এতগুলো মানুষকে আশাহত করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

“এলিফ কোথায় আছে জানো?”

কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো ইউরি। “ওকে খুঁজছে কেন?”

“বিশেষ কোন কারণ নেই। এই একটু পরিচিত হতে চাচ্ছিলাম। এখানকার সব রোগীদের সাথেই তো জানাশোনা রাখা দরকার, নাকি?”

চেহারা থেকে সন্দেহ দূর হলোনা ইউরির। “ঠিক আছে। তবে কথা না বললে আবার কিছু মনে করে বসোনা। ওর মেজাজ মর্জির কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কিছুক্ষণ আগেই আর্ট থেরাপি সেশন শেষ হয়েছে। এখন খুব সম্ভবত বিনোদন কক্ষে তাকে পাবে।”

“ধন্যবাদ।”

বিনোদন কক্ষটা মূলত বিশাল গোলাকার একটা কামরা। ভেতরে পুরনো কাউচ, নিচু টেবিল আর তাকভর্তি পুরনো বই। সার্বক্ষণিক পানসে চা-পাতা আর তামাকের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। আমার ধারণা আসবাবপত্রগুলোই এই গন্ধের উৎস। ভেতরে ঢুকে দেখি দুইজন রোগী পেছনে ব্যাকগ্যামন খেলছে। পুল টেবিলের সামনে একা দাঁড়িয়ে আছে এলিফ। হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম।

“হ্যালো, এলিফ।”

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে। “কি?”

“ঘাবড়ানোর কিছু নেই। একটু কথা বলতে এসেছি।”

“তুমি তো আমার ডাক্তার না।”

“আমি ডাক্তার নই, সাইকোথেরাপিস্ট।”

নাক দিয়ে ঘোঁত শব্দ করলো এলিফ। “আমার একজন সাইকোথেরাপিস্টও আছে।”

মুখের হাসিটা ঝুলিয়ে রেখেছি এখনও। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম যে এলিফ ইন্দিরার রোগি, আমার নয়। এলিফের কাছাকাছি দাঁড়ালে তাকে আরো ভয়ঙ্কর লাগে। শুধু তার আকৃতির জন্যে নয় কিন্তু, বরং ওর চেহারাতেই সদা বিরক্ত আর মেজাজী একটা ভাব আছে। চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নয়। শরীর থেকে সবসময় ঘাম আর হাতে বানানো সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায়। একটার পর একটা সিগারেট টানতেই থাকে।

সেকারণে আঙুলগুলো কালচে হয়ে গেছে, দাতে আর নখে হলদেটে ভাব।

“তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতাম।”

ঐ কুঁচকে গেল এলিফের। পুল খেলার লাঠিটা শব্দ করে টেবিলের নামিয়ে রেখে পরবর্তী গেমের জন্যে বলগুলো গোছাতে শুরু করলো। এরপর হঠাৎই থেমে গেল কি মনে করে। কিছু একটা ভাবছে।

“এলিফ?”

কোন জবাব দিল না। তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কিছু একটা ঠিক নেই। “তুমি কি কিছু একটা শুনতে পাচ্ছে, এলিফ?”

সন্দেহ ফুটলো এলিফের দৃষ্টিতে। কাধ ঝাঁকানো একবার।

“কি বলছে কণ্ঠগুলো?”

“বলছে তুমি নিরাপদ নও। তোমার থেকে সাবধানে থাকতে।”

“বেশ। ঠিকই বলছে কিন্তু। তুমি তো আমাকে চেনো না, তাই ভরসাও করতে পারছে না। হয়তো সময়ের সাথে সাথে আমাদের সম্পর্কটা আরো ভালো হবে, এ ব্যাপারে আশাবাদী আমি।”

এলিফের চেহারা দেখে মনে হলো না কথাটা বিশ্বাস করেছে সে।

“এক গেম হয়ে যাবে নাকি?” পুল টেবিলের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলাম।

“না।”

“কেন?”

আবারো কাঁধ ঝাঁকালো এলিফ। “অন্য কিউটা এখনও ভাঙা।”

“কিন্তু আমরা দু’জন তো চাইলে তোমারটা দিয়েই খেলতে পারি।”

কিউটা টেবিলের ওপর রাখা। ওটার দিকে হাত বাড়াতে যাবো এমন সময় টান দিয়ে সেটা সরিয়ে নিল এলিফ। “এটা আমার কিউ? খেলতে হলে নিজেরটা নিয়ে এসো!”

পেছনে সরে এলাম, এতটা ক্ষেপে যাবে বুঝিনি। একা একাই খেলতে শুরু করলো সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখলাম কিছুক্ষণ। এরপর আবারো চেষ্টা করলাম কথা বলার।

“অ্যালিসিয়া প্রথম থোভে ভর্তি হবার সময়কার একটা ঘটনা জানতে চাইছি। মনে আছে তোমার?”

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল এলিফ।

“ফাইলে পড়েছি যে ক্যান্টিনে কী যেন সমস্যা হয়েছিল তোমাদের মধ্যে। বোধহয় ব্যথা পেয়েছিলে?”

“ওহ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল ও, তাই না? গলা কেটে ফেলতে চাইছিল।”

“একজন নার্স নাকি তোমাকে দেখেছিল অ্যালিসিয়ার উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে কিছু বলতে। কি এমন বলেছিলে সেটাই ভাবছিলাম।”

“না।” জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো এলিফ। “কিছুই বলিনি আমি।”

“আমি কিন্তু বলছি না যে অ্যালিসিয়াকে উসকে দিয়েছো তুমি। কেবলমাত্র একটু কৌতূহলী বলতে পারো। কি বলেছিলে?”

“হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তাতে কি হয়েছে?”

“কি প্রশ্ন করেছিলে?”

“জিজ্ঞেস করেছিলাম যে শাস্তিটা তার প্রাপ্য ছিল কি না।”

“কার?”

“আরে ওই যে, ঐ লোকটার।” হাসার চেষ্টা করলো এলিফ।

“অ্যালিসিয়ার স্বামীর কথা বলছো?” ইতস্তত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম। “তুমি

অ্যালিসিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলে তার স্বামীর খুন হওয়াটা প্রাপ্য ছিল কিনা?”

মাথা নেড়ে সাই দেয় এলিফ। “আর জিজ্ঞেস করেছিলাম যে গুলি করার পর তার চেহারাটা কেমন হয়েছিল, মগজ বের হয়ে এসেছিল কিনা।” আগের চেয়েও জোরে হেসে উঠলো এবারে।

বিতৃষ্ণায় ছেয়ে উঠলো মন, আমি নিশ্চিত অ্যালিসিয়াও এরকমই অনুভব করেছিল সেসময়। এলিফ যে কারো ভেতরে ঘৃণা আর রাগ জাগিয়ে তুলবে-এটাই তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তার মা নিশ্চয়ই ছোটবেলায় এরকম ব্যবহারই করতো তার সাথে। তাই এলিফ অবচেতন মনেই মানুষের মনে ঘৃণার উদ্বেক ঘটায়। অনেকাংশে সফলও হয়।

“আর এখন অ্যালিসিয়ার সাথে সম্পর্ক কেমন তোমার? ভালো?”

“হ্যাঁ, একদম। আমার জানের বান্ধবী ও,” আবারো হাসলো এলিফ।

জবাবে কিছু বলার আগেই টের পেলাম যে ফোন বাজছে পকেটে। বের করে দেখি অপরিচিত একটা নম্বর থেকে কল এসেছে।

“ফোনটা ধরতে হবে আমাকে। কথা বলার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, এলিফ।”

জবাবে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বিড়বিড় করে আবারো খেলায় মনোযোগ দিল এলিফ।

করিডোরে বেরিয়ে এসে কলটা রিসিভ করলাম। “হ্যালো?”

“থিও ফেবার?”

“জি। কে বলছেন?”

“ম্যাক্স বেরেনসন, কয়েক দিন আগে ফোন দিয়েছিলেন আপনি।”

“ওহ, হ্যাঁ। ধন্যবাদ মনে করে কল দেয়ার জন্যে। আপনার সাথে অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কিছু কথা ছিল আমার।”

“কেন? কি হয়েছে? কোন সমস্যা?”

“না, মানে, ওরকম কিছু না। আমি তার চিকিৎসার ব্যাপারটা দেখছি এখন। সেজন্যেই কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম। যখন আপনার সময় হয় আরকি।”

“ফোনে সাড়া যায় না আলাপটা? আমি একটু ব্যস্ত আছি এই ক’দিন।”

“সামনাসামনি দেখা করে কথা বললেই ভালো হতো।”

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওপাশে বিড়বিড় করে অন্য কারো উদ্দেশ্যে কিছু বললেন

ম্যাক্স বেরেনসন। “কাল সন্ধ্যা সাতটায়, আমার অফিসে।”

ঠিকানা জিজ্ঞেস করার আগেই ফোন কেটে দিল লোকটা।

ম্যাক্স বেরেনসনের রিসিপশনিস্টের বেশ বাজে রকমের ঠাণ্ডা লেগেছে। একটা টিস্যু হাতে নিয়ে নাক ঝেড়ে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল আমাকে।

“ফোনে কথা বলছে মি, বেরেনসন। এক মিনিট বসুন।”

মাথা নেড়ে ওয়েটিং এরিয়াতে একটা সিটে বসে পড়লাম। চেয়ারগুলো বিশেষ সুবিধার নয়, পিঠ সোজা করে রাখতে হয়। এক পাশে কফি টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটা পুরনো পত্রিকা রাখা। সব ওয়েটিং রুমের চেহারা ই বোধহয় একইরকম হয়, ভাবলাম। এই জায়গাটাকে অনায়াসে কোন ডাক্তারের চেম্বার বা ফিউনারেল হোমের ওয়েটিং রুম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

হলওয়ার অন্যপ্রান্তের দরজাটা খুলে গেল কিছুক্ষণ পর। সেখান থেকে মাথা বের করে আমাকে ডাকল ম্যাক্স বেরেনসন। উঠে এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

ফোনের ওরকম কাঠখোঁটা কথাবার্তা শুনে ভেবেছিলাম আলাপচারিতা খুব একটা সুবিধার হবে না। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রথমেই দুঃখপ্রকাশ করলো সে।

“ফোনে ঠিকমতো কথা বলতে পারিনি দেখে কিছু মনে করবেন না, প্লিজ। খুবই ব্যস্ত একটা সপ্তাহ গিয়েছে, আমার শরীরটাও ভালো না। বসুন।”

ডেস্কের উল্টোদিকের চেয়ারগুলোয় একটায় বসে পড়লাম। “ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও দেখা করতে রাজি হবার জন্যে ধন্যবাদ।”

“দেখা করবো কি না সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলাম প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি সাংবাদিক, অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছেন সেজন্যেই। কিন্তু পরে থোভে ফোন দিয়ে নিশ্চিত হই যে আসলেও সেখানে কাজ করেন আপনি।”

“ওহ, আচ্ছা। এরকমটা প্রায়ই ঘটে নাকি? মানে সাংবাদিকরা প্রায়ই ফোন দেয়?”

“ইদানীং আর খুব একটা দেয় না। কিন্তু আগে বড্ড বেশি জ্বালাতন করতো। তাই একটু সাবধানী-” হাঁচির কারণে বাক্যটা শেষ করতে পারলোনা ম্যাক্স বেরেনসন। “মাফ করবেন, আমারও ঠাণ্ডা লেগেছে।”

শব্দ করে নাক ঝরলো সে। এই ফাঁকে তাকে ভালো করে খেয়াল করলাম।

চেহারাটা ছোট ভাইয়ের মতন আকর্ষণীয় নয় ম্যাক্স বেরেনসনের। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, পেটে দশাসই ভুড়ি। মুখভর্তি ব্রনের ছেড়ে যাওয়া দাগ। পুরনো আমলের ওল্ড স্পাইস পারফিউমের গন্ধ নাকে এলো, আমার বাবাও ব্যবহার করতো এটা। গোটা অফিসে বনেদি একটা ভাব আছে। চামড়ার মোড়া আসবাবপত্র, কাঠের প্যানেলিং, তাকভর্তি বই। গ্যাব্রিয়েলের রঙিন জগতের সাথে আকাশ পাতাল তফাৎ জায়গাটার। দুই ভাইয়ের মধ্যে বেজায় পার্থক্য, বোঝাই যাচ্ছে।

গ্যাব্রিয়েলের বাঁধানো একটা ছবি রাখা ডেস্কে। তার অগোচরেই তোলা হয়েছিল ছবিটা-ক্যান্ডিড। খুব সম্ভবত ম্যাক্সই ছিল লেন্সের পেছনে। গ্রামাঞ্চলে বিশাল একটা মাঠের বেড়ার ওপর বসে আছে সে ছবিতে। গলা থেকে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। ফটোগ্রাফার তো নয়, যেন নামকরা কোন অভিনেতা। কিংবা এভাবেও বলা যায় যে ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় অভিনয় করছে সে।

ছবিটার দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাথা নাড়লো ম্যাক্স। “চেহারা আর চুলের দিক থেকে আমার ভাই বিজয়ী, মগজের দিক থেকে আমি, আমার মনের কথাই বলল সে। পরক্ষণেই হেসে উঠলো। “মজা করলাম। আসলে, আমাকে দত্তক নেয়া হয়েছিল। আমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই।”

“তাই নাকি? এটা জানা ছিল না। আপনাদের দু’জনকেই দত্তক নেয়া হয়েছিল?”

“নাহ, শুধু আমাকে। আমাদের বাবা-মা প্রথমে ভেবেছিল তাদের কোন সন্তান হবে না। কিন্তু আমাকে দত্তক নেয়ার পরেই মা কনসিভ করে। খুঁজলে এরকম আরো উদাহরণ পাবেন কিন্তু। বোধহয় সন্তান না হবার দুশ্চিন্তা মাথা থেকে দূর হওয়ার সাথে এর সম্পর্ক আছে।”

“আপনাদের দু’ভাইয়ের মধ্যে কেমন মিল ছিল? ঘনিষ্ঠ বলা যাবে?”

“হ্যাঁ, তা যাবে। তবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময় গ্যাব্রিয়েলই থাকতো। আমি একরকম ওর ছায়াতেই বড় হয়েছি।”

“এরকমটা হবার কারণ?”

“আসলে এরকমটা না হওয়াই অস্বাভাবিক ছিল। মানে কিভাবে যে বলব...ছোট থেকেই একটু অন্যরকম ছিল ও, কথা বলার সময় আনমনে হাতের আঙুলি নাড়াচাড়া করছে ম্যাক্স। একটু পরপরই এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে। “সবখানে ক্যামেরা নিয়ে

যেত, ছবি তুলতে। বাবা অবশ্য ভেবেছিল ওর মাথায় নির্ঘাত কোন সমস্যা আছে। কিন্তু পরবর্তীতে সবাই বুঝতে পারে যে সে কতটা প্রতিভাবান। ওর ভোলা কোন ছবি দেখেছেন?”

জবাবে একটা কৌশলী হাসি ফুটলো আমার মুখে। গ্যাব্রিয়েলের ছবি তোলার প্রতিভা নিয়ে কথা বলার জন্যে এখানে আসিনি। বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করলাম। “গ্যাব্রিয়েলের স্ত্রীকে নিশ্চয়ই ভালো করেই চিনতেন আপনি?”

“অ্যালিসিয়াকে? ভালো করে চিনতে হবে নাকি?” অ্যালিসিয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই কথা বলার সুর বদলে গেল ম্যাক্সের। এখন আর আগের উষ্ণতাটুকু নেই, চোখে ভর করেছে শীতল চাহনি। “আপনাকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না। তবে আপনি চাইলে আমার সহকর্মী প্যাট্রিক ডোহার্টির সাথে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে, সে বিচার সংক্রান্ত সব খবরাখবর জানাতে পারবে।”

“আসলে এরকম বিষয়াদি নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই।”

“তাই?” কৌতূহল ফুটলো ম্যাক্সের চেহারায়। “একজন সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে তো রোগির উকিলের সাথে দেখা করার কথা নয় আপনার, তাই না?”

“না। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, আমরা যে রোগির ব্যাপারে কথা বলছি সে গত কয়েক বছরে মুখ খোলেনি।”

কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো ম্যাক্স। “বেশ। কিন্তু যেমনটা বললাম, আপনার কোন কাজে আসবো না আমি। তাই-”

“খুব কঠিন কিছু জিজ্ঞেস করবো না।”

“ঠিক আছে। শুনি তাহলে আপনার প্রশ্নগুলো।”

“একটা পেপারে পড়েছিলাম, গ্যাব্রিয়েল খুন হবার আগের রাতে তাদের বাসায় গিয়েছিলেন আপনি?”

“হ্যাঁ, একসাথে ডিনার করি আমরা।”

“তখন তাদের কেমন দেখেছিলেন?”

ক্লান্তি ভর করলো ম্যাক্সের দৃষ্টিতে। এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আগেও অনেকবার শুনতে হয়েছে তাকে। জবাবটাও তৈরিই ছিল। “স্বাভাবিক, একদম স্বাভাবিক।”

“আর অ্যালিসিয়া?”

“স্বাভাবিক।” কাঁধ ঝকালো ম্যাক্স। “অন্যান্য সময়ের তুলনায় একটু অস্থির লাগছিল, কিন্তু...”

“কিন্তু কি?”

“কিছু না।”

বুঝতে পারছিলাম, ঘটনার এখানেই শেষ নয়, তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একমুহূর্ত পর আবারও বলতে শুরু করলো ম্যাক্স। “ওদের সম্পর্কের ব্যাপারে কতটা জানেন আপনি?”

“পত্রিকায় যতটুকু পড়েছি।”

“কী পড়েছেন সেখানে?”

“সুখি দম্পতি ছিল তারা।”

“সুখি?” শীতল একটা হাসি ফুটলো ম্যাক্সের মুখে। “আসলেও সুখি ছিল। অ্যালিসিয়াকে সুখি রাখার জন্যে হেন কাজ নেই যা গ্যাব্রিয়েল করেনি।”

“বুঝলাম,” বললাম ঠিকই, কিন্তু আদতে কিছুই বুঝছি না। কি বলতে চাইছে ম্যাক্স?

আমার বিভ্রান্ত চেহারা দেখে কাঁধ নাচালো সে। “আমার কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু জানতে পারবেন না। তবে আপনি যদি এই ধরনের গালগল্পে আগ্রহী হন, তাহলে জিন-ফিলিক্সের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন।”

“জিন-ফিলিক্স?”

“জিন-ফিলিক্স মার্টিন। অ্যালিসিয়ার গ্যালারিস্ট। অনেক বছর ধরে একে অপরকে চেনে তারা, সম্পর্কও খুব ভালো। তবে সত্যি বলতে আমার লোকটাকে কেন যেন কখনোই পছন্দ হয়নি।”

“গল্পগুজবে কোন আগ্রহ নেই আমার।” মনে মনে ঠিক করলাম যত দ্রুত সম্ভব জিন-ফিলিক্সের সাথে আলাপ করতে হবে। আমি আসলে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত শুনতেই বেশি আগ্রহী। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?”

“করলেন তো কেবলই।”

“আপনি কি অ্যালিসিয়াকে পছন্দ করতেন?”

“অবশ্যই,” অনুভূতহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাক্স।

তার কথাটা বিশ্বাস হলো না আমার। “আমার কেন যেন মনে হচ্ছে। আপনি

আইনজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই কথাটা বলছেন। আর একজন। আইনজীবীকে তো অনেক কিছু গোপন রাখতেই হয়। দয়া করে গ্যাব্রিয়েলের ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু বলুন।”

নীরবতা ভর করলো ঘরটায়। মনে মনে ভয় পাচ্ছিলাম আমাকে হয়তো অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে ম্যাক্স। কিছু একটা বলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে মত বদলানো সে। এরপর হঠাৎই ডেস্ক ছেড়ে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। পাল্লা খুলতেই শীতল বাতাস ঢুকে পড়লো ভেতরে। লম্বা শ্বাস নিল ম্যাক্স, যেন এতক্ষণ রুমের ভেতরে দমবন্ধ লাগছিল তার।

অবশেষে নিচু স্বরে বলল। “সত্যিটা হচ্ছে...ওকে ঘৃণা করি আমি...ঘৃণা...”

কিছু বললাম না। তার পরবর্তী কথাগুলো শোনার অপেক্ষা করছি।

“গ্যাব্রিয়েল শুধু আমার ভাইই ছিল না, ও ছিল আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু,” জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই বলল সে। “ওর মতো দয়ালু আর কাউকে দেখিনি। একটু বেশিই দয়ালু। কিন্তু তার সব প্রতিভা, উদারতা, প্রাণচাঞ্চল্য-অকালে শেষ হয়ে গেল কুত্তিটার জন্যে। ঐ রাতে গ্যাব্রিয়েলের পাশাপাশি আমার জীবনও শেষ করে দিয়েছে সে। ভাগ্যিস এই দিন দেখার জন্যে মা-বাবা বেঁচে নেই।” গলা ধরে এলো ম্যাক্সের।

তার কষ্টটা অনুভব করতে পারছি, খারাপও লাগছে বেচারার জন্যে। “অ্যালিসিয়ার আইনজীবীর বন্দোবস্ত করাটা আপনার জন্যে বেশ কঠিন ছিল নিশ্চয়ই।”

জানালা বন্ধ করে ডেস্কে ফিরে এলো ম্যাক্স। নিজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। এখন পুরোদমে একজন উকিল সে। নিরপেক্ষ, বিচার বিবেচনাপূর্ণ, অনুভূতিহীন।

আমার উদ্দেশ্যে কাঁধ ঝাঁকালো একবার। “গ্যাব্রিয়েল বেঁচে থাকলে এমনটাই চাইতো। অ্যালিসিয়ার জন্যে সবসময়ই সেরাটা দিতে চেয়েছে সে। ওর জন্যে পাগল ছিল আমার ভাই। আর অ্যালিসিয়া আসলেও একটা পাগল।”

“আপনার ধারণা তার মাথায় সমস্যা আছে?”

“আপনিই বলুন, এখন তো তার চিকিৎসা করছেন।”

“আপনার কী মনে হয়?”

“ওর কর্মকাণ্ড নিজের চোখে দেখেছি বলেই বলছি।”

“কী দেখেছেন?”

“মুড সুইং। মেজাজ এই ভালো তো এই খারাপ। প্রচণ্ড বদমেজাজী। একটুতেই জিনিসপত্র ভাঙচুর করতো। গ্যাব্রিয়েলের কাছে শুনেছিলাম বেশ কয়েকবার নাকি তাকে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে। তখনই কিছু একটা করা উচিত ছিল আমার। অন্তত অ্যালিসিয়া যখন আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এরপর চুপ থাকাটা একদমই উচিত হয়নি। গ্যাব্রিয়েল আগলে রাখতে চাইছিল ওকে আর আমিও সেটা করতে দিয়েছি। আস্ত গর্দভ আমি।”

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘড়ির দিকে তাকালো ম্যাক্স। ইঙ্গিতটা পরিস্কার, আর কথা বাড়াতে চাইছে না সে।

কিন্তু আমি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। “অ্যালিসিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল? মানে? কবে? খুনের ঘটনার পর?”

মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স। “নাহ, আরো কয়েক বছর আগে। আপনি জানতেন না? আমি ভেবেছিলাম জানেন।”

“এটা কবেকার ঘটনা?”

“ওর বাবা মারা যাওয়ার পরপর। একসাথে অনেকগুলো ওষুধ খেয়ে ফেলেছিল...ওভারডোজ। আসলে পরিস্কার মনে নেই আমার। মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল।”

তাকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবো এসময় দরজা খুলে গেল। রিসিপশনিস্ট মহিলা ভেতরে এসে নাক টেনে বলল, “ডার্লিং, আমাদের বের হওয়া উচিত। দেরি হয়ে যাবে।”

“ওহ হ্যাঁ, আসছি দাঁড়াও।”

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় ম্যাক্স। “খিয়েটারে যাবো আজকে।” আমার চেহারার হতভম্ব ভাব দেখে হেসে উঠলো সে। “গত বছর বিয়ে করেছি আমি আর তানিয়া।”

“ওহ আচ্ছা।”

“গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুর পর ঘটেছে ব্যাপারটা। ও না থাকলে দুঃসময়টা কিভাবে কাটাতাম, কে জানে।”

ম্যাক্সের ফোন বেজে উঠলো এ সময়।

“ধন্যবাদ, অনেক সাহায্য করেছেন।” ইশারায় তাকে ফোনটা ধরতে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। এবারে ভালো করে তাকালাম রিসিপশনের তানিয়ার দিকে-স্বর্ণকেশী, সুন্দরি, কিছুটা খাটো গড়ন। আবারো নাক ঝারলো সে, তার হাতের বিয়ের হিরের আঙটিটা নজর এড়ালো না।

আমাকে অবাক করে দিয়ে এগিয়ে এল সে। ড্রা কুঁচকে নিচু গলায় বলল, “আপনি যদি অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে জানতে চান, তাহলে ওর ফুপাতো ভাই পলের সাথে কথা বলুন। পলই সবার চাইতে ভালো করে চেনে ওকে।”

“আমি অ্যালিসিয়ার ফুপিকে ফোন দিয়েছিলাম, লিডিয়া রোজ। কথা বলতে আগ্রহী মনে হয়নি তাকে।”

“লিডিয়ার কথা ভুলে যান। সরাসরি ক্যামব্রিজে গিয়ে পলের সাথে কথা বলুন। অ্যালিসিয়া আর দুর্ঘটনার পরদিনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস-”

অফিসরুমের দরজা খোলার শব্দ কানে আসামাত্র মুখে কুলুপ আটলো তানিয়া। ম্যাক্স বেরিয়ে এলে তার দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে। “তুমি তৈরি, ডার্লিং?”

তানিয়া হাসছে, তবে তার কণ্ঠের নার্ভাস ভাবটা আমার কান এড়ালো না। ম্যাক্সকে ভয় পায় সে, ভাবলাম। কিন্তু কেন?

অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ডায়েরি

জুলাই ২২

বাড়িতে বন্দুক রাখার ব্যাপারটা একদমই ভালো লাগে না আমার কাছে।

গত রাতে এ নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে আমাদের মধ্যে। অন্তত তখন মনে হয়েছিল যে বন্দুকটা নিয়েই ঝগড়া হচ্ছে, কিন্তু এখন আমি অতটা নিশ্চিত নই সে ব্যাপারে।

গ্যাব্রিয়েল বলছিল যে আমিই নাকি ঝগড়া লাগিয়েছি। ভুল বলেনি। ওকে আমার দিকে ওরকম আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখলে আমার খুবই খারাপ লাগে। আমার কারণে কষ্ট পাচ্ছে এটা কল্পনাও করতে পারি না-তবুও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কষ্ট দেই ওকে। কেন, সেটা আমি নিজেও বলতে পারবো না।

ও বলছিল আমি নাকি মেজাজ খারাপ করে বাসায় ফিরেছি গতকাল। আর ফিরেই দুদাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওর উদ্দেশ্যে চাঁচানো শুরু করে দেই। হয়তো সেটাই করেছিলাম। মনমেজাজ খারাপ ছিল কোন কারণে। আসলে আমি নিশ্চিত নই যে কি ঘটেছিল। তখন কেবল পার্ক থেকে ফিরেছি। আসার পথে পুরো রাস্তা

দিবাস্বপ্নে মশগুল ছিলাম। আমার কাজগুলো নিয়ে ভাবছিলাম, বিশেষ করে জিগুর ছবিটার কথা। একটা বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় দেখি দুটো ছেলে পানির মোটা পাইপ। নিয়ে খেলছে। বয়স বড়জোর সাত কি আট। বড় ছেলেটা ছোটজনের দিকে পাইপ তাক করে আছে, সেখান থেকে ফোয়ারার মত পানি বেরুচ্ছে। আর দু'পাশে হাত বাড়িয়ে পানিতে ভিজছিল ছোট ছেলেটা, মুখে উজ্জ্বল হাসি। পানির ধারায় সূর্যের আলো পড়ে রংধনুর মত দেখাচ্ছিল অনেকটা। একসময় খেয়াল করি যে আমার দুই গালে অশ্রুর ধারা।

তখন বিষয়টাকে পাত্তা দেইনি, কিন্তু এখন পরিস্কার বুঝতে পারছি। সত্যটা আসলে নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইনি কখনো, জীবনের বড় একটা সুখ থেকে বঞ্চিত আমি। শতবার নিজেকে বুঝিয়েছি যে সন্তান চাই না আমার, আঁকাআঁকিই আমার জীবনের সব। কিন্তু এটা ডাহা মিথ্যে, একটা অজুহাত মাত্র। সত্যটা হচ্ছে- সন্তান নিতে ভয় পাই আমি। বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারে আমার ওপর ভরসা করা সম্ভব নয়।

হাজার হোক, আমার ভেতরে তো মা'র রক্তই বইছে, নাকি?

বাসায় ফেরার পর অবচেতন মনে এসবই ভাবছিলাম হয়তো। ঠিকই বলেছিল গ্যাব্রিয়েল, অবস্থা সুবিধের ছিল না আমার।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওকে বন্দুকটা পরিস্কার করতে না দেখলে মাথায় রক্ত উঠতো না। ওটা দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমার শত অনুরোধ সত্ত্বেও বন্দুকটা বাসা থেকে দূর করেনি ও। সবসময়ই বলে যে এটা নাকি ১৬ বছর বয়সে ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল, বংশ পরম্পরায় বন্দুকটা ওদের পরিবারের কাছে আছে। যতসব ফালতু কথা। আমার বিশ্বাস হয় না, নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে। সেটাই বলেছিলাম। তখন গ্যাব্রিয়েল বলে যে নিজের এবং স্ত্রীর নিরাপত্তার খাতিরে বাসায় একটা বন্দুক রাখা এমন কোন বিষয় না। যদি হঠাৎ কেউ ঢুকে পড়ে ভেতরে, তখন?

“তখন পুলিশে ফোন দেব!” বলেছিলাম। “গুলি নিশ্চয়ই করবো না!”

গলার স্বর চড়ে গিয়েছিল আমার। জবাব দেয়ার সময় ওর গলা আরো চড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুকুমার ঝগড়া শুরু করি দু'জনে। আমি হয়তো একটু বেশি বেশিই করে ফেলেছি। কিন্তু শুরুটা তো ও-ই করেছে। রেগে গেলে মাঝে মাঝে

একটু আশ্বাসী হয়ে ওঠে গ্যাব্রিয়েল। খুব কম ক্ষেত্রেই হয় এমনটা, কিন্তু আমার খুব ভয় লাগে তখন। মনে হয় যেন অচেনা কারো সাথে সংসার করছি।

বাকি সন্ধ্যা কথা বলিনি কেউই। চুপচাপ ঘুমোতে যাই।

আজ সকালে সবকিছুর মীমাংসা হয় সেক্সের মাধ্যমে। এরকমটাই হয়ে আসছে বরাবর। বিছানায় চাদরের নিচে নগ্ন দেহে আলিঙ্গনরত অবস্থায় একদম মন থেকে “দুঃখিত” বলাটা সহজ। সব যুক্তি আর প্রতিবন্ধকতা ধলোয় মিশে মাটিতে লুটোপুটি খায়, জামাকাপড়গুলোর মতন।

“যাবতীয় ঝগড়া আমাদের এখন থেকে বিছানাতেই করা উচিত।” আমার ঠোঁটে লম্বা চুমু খেয়ে গ্যাব্রিয়েল। “আই লাভ ইউ। বন্দুকটা ফেলে দিব, কথা দিচ্ছি।”

“না, থাক,” বলি আমি। “বাদ দাও। আমার কোন সমস্যা নেই। আসলেই।”

চুমু খেয়ে আবারো আমাকে কাছে টেনে নেয় গ্যাব্রিয়েল। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। আমার নগ্ন দেহটা একদম ঠিকঠাকভাবে ওর শরীরে ঝাঁটে যায়। অবশেষে প্রশান্তি ভর করে আমার চিত্তে।

জুলাই ২৩

ক্যাফে দি আরটিস্টায় বসে লিখছি। এখন প্রায় প্রতিদিনই এখানে আসি। বাসায় একা একা থাকতে ভালো লাগে না। বাইরে মানুষজনের মধ্যে আসলে মনে হয় বনবাস থেকে লোকালয়ে ফিরেছি। প্রায়ই ভাবি যে বাইরে না বেরুলে আমার অস্তিত্বই মুছে যাবে পৃথিবী থেকে। জানি, খুবই অদ্ভুত একটা ভাবনা।

মাঝে মাঝে অবশ্য পুরোপুরি উধাও হয়ে যেতে ইচ্ছে করে-যেমন আজকে। রাতের বেলা ম্যাক্সকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে গ্যাব্রিয়েল। কথাটা সকালে জানায় আমাকে।

“অনেকদিন ধরে ম্যাক্সের সাথে দেখা হয় না আমাদের,” বলে ও। “শেষ মনে হয় জোয়েলের নতুন বাসায় ওঠার পার্টিতে কথা হয়েছিল। আজ বার্বিকিউ করবো।” অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় গ্যাব্রিয়েল। “তোমার আপত্তি নেই তো?”

“আপত্তি থাকবে কেন?”

হাসে গ্যাব্রিয়েল। “তুমি একেবারেই মিথ্যে বলতে পারো না, জানো সেটা? চেহারা দেখেই সব বুঝে যাই আমি।”

“এবারে কি বুঝলেন শুনি?”

“ম্যাক্সের আসাটা পছন্দ হচ্ছে না তোমার। আসলে ওকে কখনোই পছন্দ করোনি তুমি।”

“ভূয়া কথা।” বুঝতে পারি যে চেহারা লাল হয়ে উঠছে আমার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখ অন্য দিকে ফেরাই। ওকে অপছন্দ করবো কেন? দেখা হলে ভালোই লাগবে। আমার ছবি আঁকার জন্যে পোজ দেবে কখন আবার? শেষ করতে হবে কাজ।”

হাসে গ্যাব্রিয়েল। “এই সপ্তাহের শেষে? তবে শোনন, ম্যাক্সকে পেইন্টিংটা দেখানোর দরকার নেই, ঠিক আছে? চাইনা আমাকে জিশুর রূপে দেখুক ও। সারাজীবন খোঁচাবে।”

“দেখাবো না। তাছাড়া কাজ তো শেষই হয়নি।”

শেষ হলেও ম্যাক্সকে দেখাতাম না কখনো। আমার স্টুডিওতে ওর পা। পড়ছে, এটা ভাবলেই রাগ লাগে। মনে মনে এসব ভাবলেও মুখে কিছু বললাম না।

বাসায় ফিরতে ইচ্ছেই করছে না। ম্যাক্সের চলার যাওয়া অবধি এই ক্যাফের এই শীতল পরিবেশে বসে থাকতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু ওয়েট্রেস মেয়েটা ইতোমধ্যে ঘড়ির দিকে তাকানো শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে পড়তে হবে আমাকে। অর্থাৎ বাড়ি ফিরতে না চাইলে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ছাড়া কোন উপায়। সেটা সম্ভব না। ম্যাক্সের মুখোমুখি হতেই হবে।

জুলাই ২৪

ক্যাফেতে ফিরে এসেছি আমি। প্রতিদিন যেখানে বসি, আজকে সেখানে অন্য একজন আগেই বসে পড়েছে। সুন্দরি ওয়েট্রেস সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। অন্তত দৃষ্টিটা সহানুভূতিরই মনে হলো আমার কাছে, ভুলও হতে পারে। অন্য একটা টেবিলে বসলাম আজকে, এসির কাছাকাছি। তবে এদিকটা একটু অন্ধকার আর বেশি ঠাণ্ডা, ঠিক আমার মনের মতন।

গতরাতটা অসহ্য কেটেছে। যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।

প্রথম দেখায় ম্যাক্সকে চিনতেই পারিনি। আগে কখনো ওকে স্যুট ব্যতীত অন্য কিছু পরতে দেখিনি। হাফপ্যান্ট বোকা বোকা লাগছিল। স্টেশন থেকে ওটুকু পথে হাঁটতেই ঘেমে গেছিল একদম। টেকো মাথাটা দেখে মনে হচ্ছিল বিশাল একটা চকচকে টমেটোর দিকে তাকিয়ে আছি। বগলের কাছটা ভিজে একসা। প্রথম প্রথম আমার দিকে তাকাতেই পারছিল না। নাকি আমিই তাকাছিলাম না ইচ্ছে করে?

প্রথমে বাসা নিয়ে বকবক শুরু করলো ম্যাক্স, কত বদলে গেছে-হেনতেন। এরপর বলে সে ভেবেছিল আমরা বোধহয় আর ওকে কখনো আসতেই বলবো না। গ্যাব্রিয়েল বারবার দুঃখপ্রকাশ করে, বলে যে আমরা সময়ই পাচ্ছিলাম না। একটা প্রদর্শনীর জন্যে কাজ করছি আমি আর ও নিজে ছবি তুলতে ব্যস্ত। হাসিমুখে কথাগুলো বললেও আমিও ঠিকই বুঝতে পারছিলাম যে ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়েছে ও।

শুরুতে আমিও কিছু বুঝতে দেইনি। তক্কে তক্কে ছিলাম, ওরা বার্বিকিউ করতে বাইরে গেলেই রান্নাঘরে চলে আসি সালাদ বানানোর অজুহাতে। জানতাম যে কোন না কোন ছুতোয় আমার সাথে একা কথা বলতে আসবে ম্যাক্স। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। পাঁচ মিনিট পরেই ম্যাক্সের ভারি পদশব্দ শুনতে পাই। গ্যাব্রিয়েল আর ওর হাঁটার ধরনে আকাশ পাতাল তফাৎ। গ্যাব্রিয়েল হাঁটে বিড়ালের মতন, নীরবে আর ম্যাক্স...

“অ্যালিসিয়া।”

বদটার মুখে আমার নাম শোনামাত্র হাত কাঁপতে শুরু করে। ছুরিটা নামিয়ে রেখে ওর মুখোমুখি হই।

হাতের খালি বিয়ারের বোতলটা দেখায় ম্যাক্স। হেসে বলে, “আরেকটা নিতে এসেছি।” তখনও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না।

মাথা নাড়ি আমি, কিন্তু কিছু বলিনি। ফিজ খুলে আরেকটা বিয়ার বের করে ও। ওপেনারের জন্যে আশপাশে তাকালে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেই কোথায় আছে জিনিসটা।

বোকার হাসি হেসে বিয়ার খোলে ম্যাক্স। এরপর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মুখ খুলি আমি :

“কি ঘটেছিল এ ব্যাপারে গ্যাব্রিয়েলকে সব বলবো আমি। তোমাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম।”

হাসি মুছে গেল ম্যাক্সের। “কি?” সাপের নজরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

“গ্যাব্রিয়েলকে বলে দিব। জোয়েলদের ওখানকার ঘটনাটা।”

“কি বলছো এসব, বুঝতে পারছি না কিছু।”

“আসলেই?”

“আসলে কিছু মনে নেই। সেদিন একটু বেশিই গিলে ফেলেছিলাম।”

“ফালতু কথা।”

“না...”

“আমাকে চুমু খাওয়ার কথা মনে করতে পারছো না? আমাকে জড়িয়ে ধরার কথা ভুলে গেলে?”

“অ্যালিসিয়া, না।”

“কি না? হইচই করবো না? আমার গায়ে হাত দিয়েছিলে তুমি।”

বুঝতে পারি যে রেগে উঠছি। খুব কষ্ট হয় নিজেকে সামলাতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি গ্যাব্রিয়েল তখনও বার্বিকিউ নিয়ে ব্যস্ত। ধোয়ার কারণে চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না।

“তোমাকে কত মানে গ্যাব্রিয়েল,” বলি একটু পর। “তুমি ওর বড় ভাই। যখন সত্যটা জানবে, ভীষণ কষ্ট পাবে।”

“তাহলে বোলো না। বলার মত কিছু নেই তো।”

“সত্যটা জানা উচিত ওর। ভাইয়ের আসল চেহারা যে কি, সেটা

কথা শেষ করার আগেই আমার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দেয় ম্যাক্স। তাল সামলাতে না পেরে ওর ওপরেই পড়ে যাই। এমনভাবে হাত উঠেয়েছিল, এক মুহূর্তের জন্যে ভেবেছিলাম ঘুষি দিবে। “আই লাভ ইউ,” আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে ম্যাক্স। “আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ, আই লাভ”

আমি কিছু বলার আগেই ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে দেয়। ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু শক্ত করে ধরে রেখেছিল শুরোরটা। আমার মুখের ভেতরে ওর জিহ্বার উপস্থিতি টের পেতেই গা গুলিয়ে উঠলো।

কামড় বসিয়ে দিলাম যতটা জোরে সম্ভব।

চিৎকার করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ম্যাক্স। মাথা উঁচু করলে দেখতে পাই মুখভর্তি রক্ত।

“কুত্তার বাচ্চা!” বিকৃত কণ্ঠে বলে সে, দাঁত পুরো লাল হয়ে গেছে, ততক্ষণে। চোখে আহত পশুদের মতন দৃষ্টি।

আমার মাঝে মাঝে বিশ্বাসই হয় না যে ম্যাক্স গ্যাব্রিয়েলের ভাই। গ্যাব্রিয়েলের গুণাবলীর কোনটাই নেই ওর মধ্যে। আস্ত ইতর।

“অ্যালিসিয়া, গ্যাব্রিয়েলকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না তুমি,” আমাকে শাসায় ম্যাক্স। “সাবধান করে দিচ্ছি।”

জবাবে কিছু বলিনি। ঠোঁটে ওর রক্ত লেগে ছিল তাই পেছনে ফিরে ট্যাপের পানি দিয়ে কুলি করি কয়েকবার। এরপর বাগানে বেরিয়ে আসি।

ডিনারের সময়ে বুঝতে পারি, ম্যাক্স কিছুক্ষণ পরপর আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আমি মুখ তুললেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিছু খেতে পারিনি ডিনারে। খাওয়ার কথা ভাবলেই অসুস্থ লাগছিল। মুখের ভেতরে ওর রক্তের স্বাদ টের পাচ্ছিলাম তখনও।

কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে কিছু লুকোনোর ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু সত্যটা বললে ও কষ্ট পাবে ভীষণ। ম্যাক্সের সাথে আর কখনো যোগাযোগ করবে না। তার ভাই যে একটা আস্ত জোচ্চোর, এটা মেনে নেয়াটা কষ্টকর হবে বেচারার জন্যে। আসলেও ম্যাক্সকে খুব বেশি শ্রদ্ধা করে গ্যাব্রিয়েল। যদিও হারামিটা ওর শ্রদ্ধার যোগ্য নয়।

আমি বিশ্বাস করি না যে ম্যাক্স আমাকে ভালোবাসে। আসলে গ্যাব্রিয়েলকে দেখতে পারেনা সে, ঈর্ষা করে। আর সেই ঈর্ষা থেকেই ওর সবকিছু কেড়ে নিতে চায়, আমাকেও। কিন্তু একবার যখন বুঝে গেছে যে আমি ছেড়ে দেবার পাত্র নই, আর কিছু করার সাহস হবে বলে মনে হয় না। অন্তত সেরকমটাই আশা করছি।

সেজন্যেই ব্যাপারটা আপাতত চেপে যাবো ঠিক করেছি।

অবশ্য আমার মনে কি চলছে সেটা গ্যাব্রিয়েল ঠিকই বুঝতে পারবে। আসলে মেকি ভান ধরা সম্ভব হয় না আমার পক্ষে। গত রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় বলে ম্যাক্সের সামনে আমি নাকি অদ্ভুত আচরণ করছিলাম।

“আসলে ক্লান্ত ছিলাম আমি।”

“নাহ, কী যেন হয়েছে তোমার। অন্যমনস্ক ছিলে পুরোটা সময়। একটু চেষ্টা করলেও পারতে, ম্যাক্সের সাথে এখন তো আর খুব বেশি একটা দেখা হয় না আমাদের। ওকে যে কেন এত অপছন্দ করো, বুঝতেই পারি না।”

“অপছন্দ করিনা, গ্যাব্রিয়েল। ম্যাক্সের সাথে আমার অন্যমনস্কতার কোন সম্পর্ক নেই। আসলে কাজ নিয়ে ভাবছিলাম। খুব বেশি দেরি নেই প্রদর্শনীর।” যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য সুরে বললাম।

আমার কথা বিশ্বাস না করলেও আর কিছু বলে না গ্যাব্রিয়েল। তবে পরবর্তীতে ম্যাক্সের সাথে দেখা হলে আবারো এ বিষয়ে কথা হবে আমাদের, নিশ্চিত আমি।

পুরো ঘটনাটা এখানে লিখতে পেরে খুব শান্তি লাগছে। কিছু লিখে ফেলার মধ্যে অন্য রকম একটা অনুভূতি আছে। আমার অবর্তমানে লেখাগুলো প্রমাণ হিসেবে কাজে দেবে।

যদিও কখনো ওরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না।

জুলাই ২৬

আজকে আমার জন্মদিন। তেত্রিশে পা দিলাম।

একটু অদ্ভুতই লাগছে, কখনো ভাবিনি যে এতদিন বেঁচে থাকবো। এক হিসেবে মার চেয়ে বড় আমি এখন। বত্রিশেই থেমে গিয়েছিল তার বয়স। এখন আমার বয়স বাড়তেই থাকবে না, কিন্তু মার বয়স বাড়বে না।

সকালটা খুব মিষ্টি ছিল আজ। তেত্রিশটা গোলাপ নিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে গ্যাব্রিয়েল। ফুলগুলো এত সুন্দর! একটা গোলাপের কাঁটায় ওর আঙুল সামান্য কেটে যায়। ছোট্ট এক বিন্দু রক্ত লেগে ছিল সেখানটায়। এরকম একটা দৃশ্যই মন ভালো করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

এরপর নাস্তার জন্যে আমাকে পার্কে নিয়ে যায় ও, অনেকটা পিকনিকে মতন। বেলা বেশি না হওয়াতে গরমে কষ্ট লাগেনি খুব একটা। হৃদের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছিল, সদ্য কাটা ঘাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। সেখানেই মেক্সিকো থেকে কেনা নীল চাদরটা পেতে লম্বা একটা শুয়ে ছিলাম দুজনে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছিল সূর্যটা। খাবার হিসেবে সাথে ছিল শ্যাম্পেইন, ছোট ছোট মিষ্টি টমেটো, রুটি আর স্যালমন। এসময় অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ছেয়ে ওঠে আমার মন। মনে হতে থাকে যে আগেও এরকম একটা দিন কাটিয়েছি। কিন্তু কবে, সেটা মনে করতে পারছিলাম না। হয়তো ছোটবেলায় শোনা কোন গল্পের কথা ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসে বেরসিক স্মৃতিটা :

নিজেকে আমাদের ক্যামব্রিজের বাসার বাগানে আবিষ্কার করি। সেখানেও এখানকার মত একটা উইলো গাছ ছিল। ওটার আড়ালে অনেক সময় কাটিয়েছি। শৈশবে খুব একটা হাসিখুশি ছিলাম না হয়তো, কিন্তু উইলো গাছটার নিচে শুয়ে থাকার সময় ঠিক আজকের মত এরকম প্রশান্তি অনুভব করতাম। কিছুক্ষণের জন্যে

আমার অতীত আর বর্তমান একাকার হয়ে গিয়েছিল। চাচ্ছিলাম না যে মুহূর্তটুকু শেষ হোক কখনো। গ্যাব্রিয়েল ঘুমিয়ে পড়লে ওর একটা ছবি আঁকি। মুখের ওপর এসে পড়া সূর্যের আলোটুকু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। তবে আজকে ওর সুন্দর চোখজোড়া আঁকতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ছোট একটা ছেলে শুয়ে আছে।

পিকনিক শেষে বাসায় ফিরে সেক্স করি আমরা। এরপর আমাকে শক্ত করে ধরে একদম অপ্রত্যাশিত একটা কথা বলা গ্যাব্রিয়েল।

“অ্যালিসিয়া, ডার্লিং...তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমি।

ওর কথার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে বড় নার্ভাস লাগতে থাকে। “বলো,” কোনমতে বলি।

“একটা বাচ্চা নিলে কেমন হয়?”

এক মুহূর্তের জন্যে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলি। কী বলবো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না।

“কিন্তু...কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে যে বাচ্চা-কাচ্চা পছন্দ না।”

“ভুলে যাও ওকথা। মত পাল্টেছি আমি। এখন আমি চাই আমাদের একটা বাচ্চা হোক। তুমি কি বলো?”

উত্তরে প্রতীক্ষায় আশাতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় গ্যাব্রিয়েল। “হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ...” চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে শুরু করে আমার।

ওকে শক্ত জড়িয়ে ধরি। এই হাসছি তো আবার এই কাঁদছি।

এখন বিছানায় ঘুমিয়ে আছে ও। আমি চুপচাপ উঠে এসেছি সবকিছু লিখে ফেলার জন্যে আজকের দিনটা সারা জীবন মনে রাখতে চাই আমি, যতদিন বেঁচে আছি।

খুব বেশি খুশি লাগছে। অবসাদ নামের এই সুড়ঙ্গটার শেষ মাথায় আশার আলো দেখতে পাচ্ছি যেন।

ম্যাক্স বেরেনসনের বলা কথাগুলো মাথা থেকে দূর হচ্ছে না। বাবার মৃত্যুর পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল অ্যালিসিয়া। ফাইলে এ বিষয়ে কিছু লেখা নেই কেন?

পরদিন ম্যাক্সের অফিসে আবার ফোন দিলাম। আরেকটু হলেই এক মক্কেলের সাথে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে পড়তে সে।

“অল্প কিছু প্রশ্নের জন্যে ফোন দিয়েছি আবারো।”

“ভাই আমি আসলেই খুব ব্যস্ত এখন।”

“বেশি সময় লাগবে না।”

“পাঁচ মিনিট দিলাম আপনাকে।”

“ধন্যবাদ। আপনি তো বলেছিলেন অ্যালিসিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

তখন কোন হাসপাতালে নেয়া হয় তাকে, এটা মনে আছে?”

“হাসপাতালে ভর্তি হয়নি ও।”

“তাই?”

“হ্যাঁ। বাসাতেই সেরে ওঠে। আমার ভাই দেখভাল করে গোটা সময়।”

“কিন্তু...ডাক্তার তো দেখিয়েছিল নিশ্চয়ই। ড্রাগ ওভারডোজ যেহেতু?”

“হ্যাঁ। বাসাতেই নিয়ে এসেছিল ডাক্তার। তিনি...এ ব্যাপারটা চেপে যেতে রাজি হয়েছিলেন।”

“ডাক্তারের নামটা মনে আছে আপনার?”

এক মুহূর্ত ভাবলো ম্যাক্স। “সরি, মনে নেই।”

“ওনারা কি সবসময় এই ডাক্তারকেই দেখাতো অসুস্থ হলে?”

“নাহ। গ্যাব্রিয়েল আর আমার পারিবারিক ডাক্তার আলাদা একজন। ও বলে দিয়েছিল যাতে ওনাকে কখনো এ ব্যাপারে কিছু না বলি।”

“নামটা মনেই পড়ছে না?”

“না, সরি। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন? যেতে হবে আমাকে।”

“আরেকটা কথা...গ্যাব্রিয়েলের উইলের ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল আছে।”

উইলের কথা ওঠায় গলা চড়ে গেল ম্যাক্সের। “ওর উইল? এসবের সাথে কি সম্পর্ক

“অ্যালিসিয়াই কি তার সম্পত্তির মূল স্বত্বভোগী?”

“বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন কিন্তু।”

“আসলে, আমি বোঝার চেষ্টা করছি।”

“কি বোঝার চেষ্টা করছেন?” বিরক্ত কণ্ঠে বলল ম্যাক্স। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যখন দেখলো আমি কিছু বলছি না, অগত্যা প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য হলো।

“আমি মূল স্বত্বভোগী। অ্যালিসিয়া ওর বাবার দিক থেকে অনেক সম্পত্তি পেয়েছে। তাই গ্যাব্রিয়েল ওর জন্যে আলাদাভাবে কিছু রেখে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। ওর সব সম্পত্তি মালিক এখন আমি। অবশ্য গ্যাব্রিয়েল ধারণা করেনি, তার মৃত্যুর পর সম্পত্তিগুলোর দাম এভাবে বেড়ে যাবে। আপনার প্রশ্ন কি শেষ?”

“আর অ্যালিসিয়ার উইল? তার উত্তরাধিকারী কে?”

“সেটা, দৃঢ়কণ্ঠে বলে ম্যাক্স, “আপনাকে বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আশা করছি আর কখনো আমাকে ফোন দেবেন না।”

লাইন কেটে গেল। শেষদিকে তার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছিলো আমার কথাগুলো ভালোভাবে নেয়নি।

কিছুক্ষণ পরেই এর প্রমাণ পেলাম।

দুপুরের খাবারের পর আমাকে অফিসে ডেকে পাঠায় ডায়োমেডেস। ভেতরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। একদম গম্ভীর।

“তোমার সমস্যাটা কি?”

“সমস্যা?”

“সাধু সাজার চেষ্টা করবে না। আমাকে সকালে কে ফোন দিয়েছিল জানো? ম্যাক্স বেরেসন। তুমি নাকি দুবার তার সাথে যোগাযোগ করে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করেছো?”

“অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কিছু কথা জানার ছিল। তখন তো বিরক্ত মনে হয়নি তাকে।”

“কিন্তু এখন যথেষ্ট বিরক্ত সে। আমাদের বিরুদ্ধে হয়রানির মামলা করার ভ্রমকি দিয়েছে।”

“পাগল নাকি-”

“এ মুহূর্তে থোভের বিরুদ্ধে মামলা হলে পরিণতি কি হবে জানো? এখন থেকে আমার অনুমতির বাইরে কিছু করবে না, বুঝেছো?”

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠলেও, মাথা নেড়ে সায় জানলাম। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছি।

“থিও, তোমাকে একটা পরামর্শ দেই,” পিতৃসুলভ কণ্ঠে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন ডায়োমেডেস। “তুমি ভুল পথে হাটছে। একে ওকে প্রশ্ন করছে, সূত্র

খুঁজছে-যেন এটা একটা গোয়েন্দা কাহিনী।” হেসে উঠলেন প্রফেসর। এভাবে বের করতে পারবে না।”

“কী বের করতে পারবো না?”

“সত্যটা। উইলফ্রেড বিয়নের কথাটা মনে রেখ- যার কোন স্মৃতি নেই, তার কোন উদ্দেশ্যও নেই। থেরাপিস্ট হিসেবে আগে থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে এগোনো যাবে না। শুধুমাত্র অ্যালিসিয়ার সাথে যতক্ষণ সময় কাটাবে তার অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যে ধারণের চেষ্টা করবে। সেগুলো বোঝার চেষ্টা করবে। বাকিটা আপনাআপনিই হয়ে যাবে।”

“জানি আমি। ঠিক বলেছেন।”

“হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। আর যেন না শুনি যে অ্যালিসিয়ার পরিচিত কারো সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছে, বুঝেছো?”

“জি”

ওদিন বিকেলে ক্যামব্রিজে অ্যালিসিয়ার ফুপাতো ভাই পল রোজের সাথে দেখা করতে গেলাম।

ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছুলে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের জায়গা দখল করে নিল ছোট ছোট লোকালয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আলোগুলো নীল দেখাচ্ছে। লন্ডন থেকে বের হতে পেরে ভালো লাগছে। এখানকার আকাশ অনেক বেশি পরিষ্কার, বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছি।

এক ঝাঁক পর্যটক আর ছাত্রছাত্রীর সাথে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম আমি, ফোনের ম্যাপ দেখে সামনে এগোছি। রাস্তাগুলো এত নীরব যে আমার নিজের হাঁটার শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ করেই রাস্তা শেষ হয়ে গেল। সামনে পতিত জমি। আরেকটু এগোলেই দেখা মিলবে নদীর।

একটা বাড়িই দাঁড়িয়ে আছে নদীর ধারে। আশপাশের পরিবেশের সাথে বড্ড বেমানান। অবস্থাও খুব একটা সুবিধার নয় বাড়িটার। দেয়ালজুড়ে লতানো গাছ আর বাগানভর্তি আগাছা। দেখে মনে হবে যেন প্রকৃতি তার বেহাত হয়ে যাওয়া জায়গাটুকু পুনর্দখলের চেষ্টা করছে। এই বাড়িটাতেই জন্ম হয়েছিল অ্যালিসিয়ার। জীবনের আঠারো বছর কাটিয়েছে এখানে। এই চার দেয়ালের মাঝে বিকশিত হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব। এখন আমরা যে পরিণত অ্যালিসিয়াকে দেখি, তার স্বভাব চরিত্রের বীজ

বপিত হয়েছিল এখানেই। মাঝে মাঝে জীবন নামের ধাঁধার উত্তর খুঁজতে অতীতে ডুব দিতে হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা আরো ভালোভাবে বোঝানো যায়:

যৌন নির্যাতনের ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করা একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট একবার আমাকে বলেছিলেন, তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এমন কোন পেডোফাইল বা শিশু নিয়াতনকারীর দেখা পাননি, যে কি না ছোটবেলায় নির্যাতনের শিকার হয়নি। তবে এমনটা কিন্তু নয় যে শৈশবে নির্যাতনের শিকার হলেই বড় হয়ে পেডোফাইল হতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো এরকম নির্যাতনের শিকার হয়নি, তার দ্বারা অন্য কারো নির্যাতিত হবার সম্ভাবনা একদম কম। কেউ খারাপ হয়ে জন্মায় না। উইনিকটের ভাষায়, “একটা শিশু কখনোই মা’কে ঘৃণা করবে না। যদি কোন কারণে তার মা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, কেবলমাত্র তখনই শিশুর মনে ঘৃণার সঞ্চার হবে।” শিশু হিসেবে আমাদের সবার মনেই স্পঞ্জের মতন। জীবনের চাহিদাও তখন কেবল খাওয়া, ঘুম আর ভালোবাসা পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মাঝেমধ্যেই এর ব্যত্যয় ঘটে, ফলশ্রুতিতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। এটা নির্ভর করে আমরা কেমন পরিবেশে বড় হচ্ছি, সেটার ওপর। এক নির্যাতিত, অবুঝ শিশুর কিন্তু বাস্তবে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা নেই। তাই তার ভেতরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে প্রচণ্ড ক্ষোভ। কিভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায়, এ ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করে সে। ভয়ের মত রাগের পেছনেও নির্দিষ্ট কারণ থাকে।

এ পৃথিবীতে কেউ কখনো বিনা প্ররোচনায় হাতে বন্দুক তুলে নেয়নি। ঠিক তেমনি, গ্যাব্রিয়েলকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করার পেছনেও অ্যালিসিয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণ আছে অবশ্যই। গোটা ব্যাপারটা তার মানসিক কোন সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করছে। আর সেই মানসিক সমস্যা এমনি এমনি হয়নি।

আজকে আমার এখানে আসার কারণ হচ্ছে অ্যালিসিয়ার শৈশব কেমন কেটেছে, সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। এই বাড়িতেই হয়তো অপ্রীতিকর এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল, যা তাকে বড় হয়ে ভালোবাসার মানুষটাকে খুন করার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

বাগানটায় পা রাখলাম। চারপাশে নাম না জানা গুল্মজাতীয় গাছ। বুনো ফুল ফুটেছে কয়েকটায়। ধীরে ধীরে বাড়িটার পেছন দিকে চলে এলাম, একটা বিশাল

উইলো গাছ রাজসিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। কল্পনার চোখে দেখলাম অ্যালিসিয়া এই গাছটার নিচে খেলা করছে। মুখে হাসি ফুটলো আপনা থেকেই।

এসময় হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তিতে ছেয়ে উঠলো মন। যেন কেউ নজর রাখছে আমার ওপর।

বাড়িটার দিকে তাকাতেই ওপরতলার জানালায় একটা মুখ দেখতে পেলাম। বয়স্ক, কুৎসিত এক মহিলার মুখ। কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অস্বস্তির জায়গায় আতংক ভর করলো এবারে।

শেষ মুহূর্তের আগে বুঝলামই না যে আমার পেছনে কেউ একজন উপস্থিত হয়েছে। মাথার পেছনে তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম পরপরই।

অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

শক্ত, ঠাণ্ডা মেঝেতে জ্ঞান ফিরলো আমার। মাথার পেছনে দপদপ করছে, যেন কেউ ধারালো ছুরির ফলা বিধিয়ে দিয়েছে সেখানে। হাত বুলালাম জায়গাটায়।

“রক্ত বের হয়নি,” একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো পাশ থেকে। কিন্তু ফুলে যাবে। মাথা ব্যথাও থাকবে কয়েকদিন।”

উপরে তাকাতেই পল রোজের কৌতূহলী চেহারাটা দেখতে পেলাম। একটা বেজবল ব্যাট হাতে নিয়ে উরু হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বয়সে আমার কাছাকাছি হলেও, অনেক বেশি লম্বা-চওড়া। চেহারাটা অবশ্য কিশোরসুলভ। মাথাভর্তি লাল চুল, অ্যালিসিয়ার মতন। হুইস্কির গন্ধ আসছে লোকটার গা থেকে।

উঠে বসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

“কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন।”

“কনকালন, মানে মাথায় আঘাতের জন্য সাময়িক স্মৃতিবিভ্রমের মতো জটিলতা হতে পারে।”

“হ্যাঁ।”

“আপনার মাথায় সমস্যা নাকি? এভাবে ব্যাট দিয়ে বাড়ি দিলেন কেন?”

“আমি ভেবেছিলাম চুরি করতে এসেছেন।”

“আমি চোর না।”

“সেটা জানি এখন। আপনার ওয়ালেটের পরিচয়পত্র দেখেছি। আপনি একজন সাইকোথেরাপিস্ট।”

পেছনে পকেটে হাত দিয়ে আমার ওয়ালেটটা বের করে আনলো সে। পরক্ষণেই আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। বুকের ওপর এসে পড়ে জিনিসটা। দেখে নেই সব ঠিকঠাক আছে কি না।

“আপনি তো থোভে চাকরি করেন।”

সামান্য নড়াচড়াতেই মাথার ভেতরে ব্যথার বিস্ফোরন ঘটলো। “হ্যাঁ।”

“তাহলে নিশ্চয়ই জানেন আমি কে?”

“অ্যালিসিয়ার ফুপাতো ভাই?”

“পল রোজ।” হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। “দেখি, আস্তে আস্তে এবারে ওঠার চেষ্টা করুন।”

পলের হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ে বেশ শক্তি ধরে সে। দাঁড়িয়ে থাকতে অবশ্য কষ্ট হচ্ছে। আরেকটু হলে মেরেই ফেলতেন আমাকে,” বিড়বিড় করে বললাম।

“যদি আপনার কাছে বন্দুক থাকতো? যা দিনকাল! তাছাড়া বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকেছেন আপনি। কি আশা করছিলেন? ফুলের মালা নিয়ে স্বাগত জানানো?”

“আপনার সাথেই দেখা করতে এসেছিলাম ভাই,” ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে বললাম। “এখন তো মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হতো।”

“ভেতরে এসে বসুন।”

এ মুহূর্তে তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার কাছে। ব্যথাটা বেড়েই চলেছে। পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে পা দিলাম আমরা।

বাইরের মতনই ভেতরের অবস্থাও শোচনীয়। রান্নাঘরের দেয়ালের কমলা জ্যামিতিক নকশা দেখে মনে হচ্ছে কম করে হলেও চল্লিশ বছরের পুরনো। ওয়ালপেপার খুলে খুলে আসছে, কিছু জায়গায় একদম কালো হয়ে গেছে। আনাচে কানাচে ঝুল আর মাকড়সার জাল। মেঝেতে ধুলোর পুরু স্তর দেখে কার্পেট বলে ভুল হতে পারে। আর ঘরময় বিড়ালের প্রস্রাবের গন্ধ। এক রান্নাঘরেই পাঁচটা বিড়াল শুয়ে বসে আছে। বাম দিকের কোণায় অনেকগুলো বিড়ালের খাবারের পুরনো টিন ফেলে রাখা হয়েছে, সেগুলো থেকেও গন্ধ ছুটেছে। ভীষণ অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ।

“বসুন, আমি চা বানাচ্ছি,” বলে বেসবল ব্যাটটা দরজার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলো পল। ওটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছি না। লোকটাকে আশপাশে এখনও নিরাপদ লাগছে না নিজেকে।

কিছুক্ষণ পর এক ভাঙা মগ ভর্তি চা আমার হাতে দিল পল। “খেয়ে ফেলুন।”

“পেইনকিলার হবে কি?”

“অ্যাসপিরিন আছে বোধহয়, খুঁজে দেখি দাঁড়ান। এটা মিশিয়ে দেই,” একটা হুইস্কির বোতল আমাকে দেখালো সে। “চাঙ্গা লাগবে তাহলে।”

আমি কিছু বলার আগেই মগের মধ্যে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে দিল পল। চুমুক দিলাম। বেশ কড়া ঠেকছে স্বাদটা, মিষ্টিও পরিমাণমতো। পল নিজেও চায়ের কাপে চুমুক দিল। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বললাম না। নীরবে আমাকে দেখছে সে। লোকটার তাকানোর ভঙ্গির সাথে অ্যালিসিয়ার তাকানোর ভঙ্গির মিল আছে।

“কেমন আছে ও?” কিছু সময় পর জিজ্ঞেস করলো পল। “অনেক দিন দেখা হয়নি আমাদের। মা’কে এখানে রেখে বেরুতেই পারি না,” আমি জবাব দেয়ার আগেই বলল।

“ওহ আচ্ছা। অ্যালিসিয়ার সাথে শেষ কবে দেখা হয়েছিল আপনার?”

“বেশ কয়েক বছর আগে। আসলে কোন যোগাযোগই নেই আমাদের। ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম, এর পরে বড়জোর এক কি দু’বার দেখা হয়েছে। গ্যাব্রিয়েল আসলে পছন্দ করতো না ব্যাপারটা। অ্যালিসিয়াও বিয়ের পর থেকে ফোন দেয়া কমিয়ে দেয়, কখনো দেখা করতে আসতো না। সত্যি বলতে মা অনেক কষ্ট পেয়েছে তার এই আচরণে।”

আমি কিছু বললাম না। মাথার প্রচণ্ড ব্যথার কারণে ঠিকমতো কিছু ভাবতেই পারছি না। তবে টের পাচ্ছি যে আমাকে খেয়াল করছে সে।

“আমার সাথে দেখা করতে আসলেন যে?”

“কিছু প্রশ্ন ছিল অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে...মানে তার শৈশব নিয়ে।”

মাথা নেড়ে মগে কিছু হুইস্কি ঢেলে নিল পল। চেহারা আর আগের বিচলতা নেই; আমি নিজেও হুইস্কির প্রভাব টের পাচ্ছি। ব্যথার তীব্রতা কমে গেছে অনেকাংশে, বোধশক্তিও ফিরে আসছে। যা করতে এসেছো করো, নিজেকে বোঝালাম। এরপর যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

“আপনারা তো একসাথে বড় হয়েছেন?”

মাথা নেড়ে সাই দিল পল। “বাবা মারা যাবার পর এখানে এসে উঠেছিলাম আমি আর মা। তখন আট কি নয় বছর বয়স ছিল আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম কয়েকদিন থেকেই চলে যাবো। কিন্তু কিছুদিন পরই অ্যালিসিয়ার মা মারা যায় দুর্ঘটনায়। তাই মা থেকে যায় অ্যালিসিয়া আর ভার্নন মামার দেখভাল করার জন্যে।”

“ভার্নন বোজ-অ্যালিসিয়ার বাবা?”

“হ্যাঁ।”

“মি. ভার্নন এখানেই কয়েক বছর আগে মারা গেছেন?”

“হ্যাঁ,” ড্রা কুঁচকে গেল পলের। “আত্মহত্যা করেছিলেন আসলে। ওপরতলার চিলেকোঠায়। আমিই প্রথম দেখতে পাই লাশটা।”

“দুঃখজনক।”

“হ্যাঁ। অ্যালিসিয়া পুরো ভেঙে পড়েছিল। সেবারই ওর সাথে শেষ দেখা হয় আমার। ভার্নন মামার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। খুব খারাপ অবস্থা ছিল বেচারির।” উঠে দাঁড়ায় পল। “আরেকটু হুইস্কি নিবেন নাকি?”

আমি মানা করার আগেই কথা বলতে বলতে মগে হুইস্কি ঢেলে দিল সে। “আমার কিন্তু কখনো বিশ্বাস হয়নি যে গ্যাব্রিয়েলকে অ্যালিসিয়া খুন করেছে। এরকমটা হবার কোন কারণই নেই।”

“কেন?”

“কারণ অ্যালিসিয়ার স্বভাবের সাথে ব্যাপারটা যায় না। একটা পোকাকার গায়েও হাত তোলেনি ও কখনো।”

কিন্তু এখন সে বদলে গেছে, মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছু বললাম না।

হুইস্কিতে চুমুক দিল পল। “এখনও মুখ খোলেনি ও?”

“না”

“এই ব্যাপারটাও আমার মাথায় ঢোকেনা, বুঝলেন। আমার তো মনে হয়-”

সে কথা শেষ করার আগেই ওপরতলা থেকে একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে এলো। চাপা গলায় কেউ কথা বলছে, আমি বুঝতে পারলাম না কিছুই।

লাফিয়ে উঠে পড়লো পল। “এক সেকেন্ড,” বলে দ্রুত সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। “সব ঠিক আছে তো, মা?”

আবারো দুর্বোধ্য কিছু কথা ভেসে এলো ওপর থেকে।

“কি? ওহ আচ্ছা। এক-এক মিনিট।” পলের গলায় অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট।

হলওয়ার অপর পাশ থেকে ব্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সে।

“মা আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে।”

কাঁপা কাঁপা পদক্ষেপে পলকে অনুসরণ করে ধুলোমাথা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লিডিয়া রোজ। জানালায় কিছুক্ষণ আগে তার মুখই দেখেছিলাম। মাথার লম্বা সাদা চুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন চিরুনির স্পর্শ পায়নি। মাত্রাতিরিক্ত ওজনের কারণে নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। হাত-পাগুলো গাছের গুঁড়ির মতন পুরু, কাঁধ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি চওড়া। এ মুহূর্তে একটা হাঁটার লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার ওজনের ভারে প্রায় বেঁকে গিয়েছে জিনিসটা, যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে।

“কে এই ছোকরা? কে?”

ক্ষনক্ষনে গলায় প্রশ্নটা পলের উদ্দেশ্যে করলেও তার দৃষ্টি আমার দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে চোখ সরেছে না। আবারো অ্যালিসিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাথে তার দৃষ্টির মিল খুঁজে পেলাম আমি।

“উত্তেজিত হবার কিছু নেই, মা,” নিচু গলার বলল পল। “ইনি অ্যালিসিয়ার থেরাপিস্ট। হাসপাতাল থেকে এসেছে আমার সাথে কথা বলতে।”

“তোর সাথে? তোর সাথে কেন কথা বলতে চায়? কি করেছিস তুই

“অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন।”

“তোর মাথায় কি ঘিলু নেই? একটা সাংবাদিককে ঘরে ঢুকতে দিলি?” এখন প্রায় চিৎকার করছে লিডিয়া। “এখনই ঘাড় ধরে বের করে দে।”

“আরে সাংবাদিক না, বললাম তো। আইডি দেখেছি আমি। এখন। কোন হেঁচকো না। চলো, ভেতরে চলো। শুয়ে থাকো।”

গজগজ করতে করতে বেডরুমে ফিরে গেল মিসেস রোজ। ইশারায় আমাকে অনুসরণ করতে বলল পল।

কারো বিছানায় উঠতে এতটা শব্দ হতে পারে, এটা আগে ভাবিনি। ওজনের ভারে দেবে গেছে ম্যাট্রেস। পল তার বালিশগুলো ঠিক করে দিল। একটা বয়স্ক

বিড়াল গা এলিয়ে শুয়ে আছে লিডিয়ার পায়ের কাছে। এরকম কুৎসিত বিড়াল আগে দেখিনি। পুরো শরীর জুড়ে নানারকম ক্ষত, কিছু জায়গায় লোম উঠে গেছে, এক কান নেই। ঘুমের ভেতরেও গড়গড় করছে।

রুমটায় নজর বুলালাম একবার। পরননা, বাতিল জিনিসপত্রে ঠাসা। হলুদ হয়ে আসা খবরের কাগজ, পুরনো কাপড়ের টিবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঘরময়। একটা অক্সিজেন ক্যানিস্টার ঠেস দিয়ে রাখা দেয়ালের সাথে। বেডসাইড টেবিলের ওপর নানারকম ঔষধ ভর্তি বড়সড় ডিব্বা।

গোটা সময় লিডিয়ার অগ্নিদৃষ্টি অনুসরণ করলো আমাকে। অবশ্য অগ্নিদৃষ্টি না বলে উন্মাদ দৃষ্টিও বলা যায়।

“কি চায় এই ছোকরা?” আমাকে আবারো আপাদমস্তক দেখলো সে। “কে ও?”

“কেবলই তো বললাম, মা। অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে। ওর চিকিৎসার জন্যে জরুরি ব্যাপারটা। থিও একজন সাইকোথেরাপিস্ট।”

‘সাইকোথেরাপিস্ট’ শব্দটা যে লিডিয়ার বিশেষ পছন্দ নয়, সেটা কাউকে বলে দিতে হলো না। গলা খাকারি দিয়ে ঠিক আমার পায়ের সামনে একদলা থুতু ফেললো সে।

“মা, প্লিজ-” গুণ্ডিয়ে উঠলো পল।

“তুই চোপ!” বলে আমার দিকে চোখ গরম করে তাকালো লিডিয়া। “অ্যালিসিয়া হাসপাতালে কেন?”

“হাসপাতালে থাকবে না তো কোথায় থাকবে?”

“কোথায় আবার? জেলে,” লিডিয়ার ত্রুষ্ক দৃষ্টির তেজ একটুও স্লান হয় না। “অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে জানতে চাও? বলছি আমি। আস্ত হারামী একটা মেয়ে। ছোট থেকেই স্বভাব-চরিত্র খারাপ।”

চুপচাপ শুনছি। মাথাব্যথাটা এখনও কমেনি। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে লিডিয়ার রাগ বেড়েই চলেছে।

“আমার ভাই, ভার্নন বেচারার ইভার মৃত্যুর ধাক্কা কাটিয়েই উঠতে পারেনি। ওর দেখাশোনা করতাম আমি। অ্যালিসিয়ারও খেয়াল রাখতাম। সেজন্যে কি কৃতজ্ঞ হারামিটা?”

এবারেও কিছু বললাম না। আসলে জবাবে আমার কাছ থেকে কিছু শোনার

আশাও করছে না লিডিয়া।

“তুমি জানো অ্যালিসিয়া কিভাবে এসবের প্রতিদান দিয়েছে? জানো আমার সাথে কি করেছে?”

“মা, প্লিজ।”

“একদম চুপ!” পলকে ধমকে আবারো আমার দিকে ফিরলো লিডিয়া। এতটা রেগে উঠবে আগে বুঝিনি। “কুত্তিটা আমার ছবি ঁঁকেছে। কোনরকমের অনুমতির তোয়াক্কা করেনি। আমিও ভালোমানুষের মতো প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি গ্যালারি জুড়ে আমার কুৎসিত, জঘন্য পেইন্টিং। আমাকে নিয়ে তামাশা করেছে ও! তামাশা!”

রাগের দমকে কাঁপছে লিডিয়া। পলের চেহারায় দুশ্চিন্তা। “আপনি আসুন নাহয়। মা’র উত্তেজিত হওয়াটা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো না।”

মাথা নাড়লাম। লিডিয়া রোজের অবস্থা যে আসলেও ভালো না, এটা নিয়ে কোন সংশয় নেই আমার মধ্যে। কেটে পড়তে পারলেই বাঁচি।

বাড়িটা থেকে বের হয়ে ট্রেন স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম। মাথায় আঘাতের জায়গাট ফুলে উঠেছে, যন্ত্রনা কমার কোন লক্ষণ নেই। সময় নষ্ট হলো এখানে এসে, কিছুই জানতে পারিনি। তবে এটা পরিস্কার যে কেন সুযোগ পাওয়া মাত্র এই বাড়িটা থেকে পালিয়েছে অ্যালিসিয়া। আঠারো বছর বয়সে আমিও ঠিক এভাবেই পালিয়েছিলাম বাবার কাছ থেকে। আর অ্যালিসিয়ার দুরে সরে যাবার কারণ ওর আপন ফুপি-লিডিয়া রোজ।

লিডিয়ার কেমন ছবি ঁঁকেছিল অ্যালিসিয়া সেটা নিয়ে ভাবলাম। আসলেও তামাশা করেছে কি না কে জানে। অ্যালিসিয়ার গ্যালারিতে গেলেই উত্তরটা পেয়ে যাবো।

ক্যামব্রিজ ছেড়ে আসার মুহূর্তে পলের কথা মনে হয়ে খারাপই লাগলো। এরকম একজন মানুষের সাথে একা একা থাকা...দুঃখজনক। তার নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধবও নেই খুব একটা বা কারো সাথে কখনো সম্পর্কেও জড়ায়নি। তার মানসিক বিকাশ একটা পর্যায়ে গিয়ে থেমে গিয়েছে।

হঠাৎ লিডিয়ার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় ছেয়ে উঠলো মন। তাকে দেখে বাবার কথা মনে পড়ে গেছে, এটাই বোধহয় মূল কারণ। যদি আমিও সারের সেই বাসাটায়

থেকে যেতাম, তাহলে আমার অবস্থাও পলের মতনই হতো নিশ্চিত।

লন্ডনের ফেরার পুরোটা পথ বড় বিষণ্ণ কাটলো। সেই সাথে যোগ হয়েছে ক্লান্তি আর মাথাব্যথা। তবে কষ্টের অনুভূতিগুলো কি পলের জন্যে নাকি আমার-সেটা বলতে পারবো না।

বাসায় ফিরে ক্যাথিকে পেলাম না।

সাথে সাথে ল্যাপটপ খুলে ওর ইমেইলগুলো দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আজকে ভাগ্য খারাপ, লগ আউট করে গিয়েছে।

আমাকে মেনে নিতে হবে যে এই ভুলটা দ্বিতীয়বার আর করবে না সে। এভাবে কতদিন আর ওর ইমেইল অ্যাকাউন্টে ঢোকার চেষ্টা করে যাবো? এরকম চলতে থাকলে ব্যাপারটা অসুস্থ একটা অভ্যাসে পরিণত হবে একসময়। আমি জানি এখন আমাকে কেমন মনে হচ্ছে আপনাদের। গল্প উপন্যাসের সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত কোন স্বামী। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দেখুন, ক্যাথি ওথেলোতে ডেসডেমোনা চরিত্রে অভিনয় করছে! যার ওপরে কোন ভরসাই নেই তার স্বামী ওথেলোর।

সেদিনই উচিৎ ছিল ইমেইলগুলো আমাকে ফরওয়ার্ড করে দেয়া। তাহলে অন্তত কিছু প্রমাণ থাকতো আমার কাছে। ভুল হয়ে গেছে। এখন তো প্রায়শই সন্দেহ হয় যে ঠিক দেখেছিলাম কি না সেরাতে। ক্যাথিকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে অদ্ভুত সব ভাবনার উদয় হয় আমার মাথায়। মাঝে মাঝে ভাবি, ভুল বুঝিনি তো? হয়তো গোটাটাই ওর অনুশীলনের অংশ। এর আগে একবার ‘অল মাই সঙ্গ’ নাটকের প্রস্তুতি হিসেবে টানা ছয় সপ্তাহ আমেরিকান টানে কথা বলেছিল সে। তবে ইমেইলগুলোর প্রেরকের স্থানে ক্যাথির নাম লেখা, ডেসডেমোনা না।

পুরোটা যদি কল্পনা হতো, তাহলে ভুলে যেতে পারতাম। যেভাবে ঘুম থেকে জাগামাত্র স্বপ্ন ভুলে যাই আমরা। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বরং এটা বলা যায় একটা দুঃস্বপ্নের জালে আটকা পড়েছি। যেখানে আমার সঙ্গি সন্দেহ, অবিশ্বাস আর সংশয়। অবশ্য ক্যাথিকে কিছু বুঝতে দেইনি। এখনও প্রতি রবিবার একসাথে হাঁটতে যাই আমরা। অন্যান্য দম্পতিদের মতন হাত ধরে হেঁটে বেড়াই পার্কে। অবশ্য নীরবতার পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে, কিন্তু সেগুলো অসহনীয় পর্যায়ে যায়নি এখনও। তবে নীরবতার আড়ালে আমার মাথায় কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খায় অবিরাম। কেন এমনটা করলে সে? কিভাবে পারলো করতে? আমাকে ভালোবেসে, বিয়ে করে অন্য

একজনের সাথে বিছানায় উঠলে কি করে? গোটাটাই তাহলে অভিনয়? সম্পর্কটা কতদিন ধরে চলছে? এই লোকটাকে কি ভালোবাসে ও? আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তার কাছে?

ক্যাথি গোসলে ঢুকলে কয়েকবার ফোন ঘাটাঘাটি করেছি। কিন্তু ওরকম কোন মেসেজ খুঁজে পাইনি। নিশ্চয়ই ডিলিট করে দিয়েছে। আর যা-ই হোক, বোকা নয় ও। সেদিন বেখেয়ালে ল্যাপটপ খুলে রেখে গিয়েছিল।

এমনটাও হতে পারতো যে সত্যটা হয়তো কখনোই জানতেই পারতাম না আমি।

সেরকমটা হলেই ভালো হতো।

পার্ক থেকে ফেরার পর সোফায় বসে উদ্ভিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় ক্যাথি। “তুমি ঠিক আছে?”

“মানে?”

“না, কেমন যেন চুপচাপ লাগছে তোমাকে।”

“আজকে?”

“গত কয়েকদিন ধরেই।”

দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। “আর বোলো না, কাজের অনেক চাপ। নতুন রোগিটা সুবিধার না।”

মাথা নাড়লো ক্যাথি। সহানুভূতির ভঙ্গিতে হাতে আলতো চাপ দিল। একবার। ভালো অভিনেত্রী ও, এখন আসলেও মনে হচ্ছে যে আমাকে নিয়ে

“রিহার্সাল কেমন যাচ্ছে?”

“আগের তুলনায় ভালো। দারুণ কিছু বুদ্ধি দিয়েছে টনি। আগামী সপ্তাহটা সেগুলো নিয়েই কাজ করবো। বাসায় ফিরতে দেরি হবে, আগেই বলে দিচ্ছি।”

“ঠিক আছে।”

এখন আর ওকে একটুও বিশ্বাস করি না আমি। সাধারণ কথাগুলো নিয়েও বারবার ভাবি। প্রতিটা বাক্যের প্রচ্ছন্ন কোন অর্থ আছে কি না সেটা বোঝার চেষ্টা করি।

“টনি কেমন আছে?”

“ভালোই,” বলে কাঁধ ঝাঁকালো ক্যাথি, যেন টনির ভালো বা খারাপ থাকতে

কিছু যায় আসেনা ওর। পুরোটাই অভিনয়। টনিকে গুরু মানে সে, একসময় সারাদিন তাকে নিয়ে কথা বলতো। ইদানীং অবশ্য বলে না।

ফোনে নাটক, অভিনয় আর থিয়েটার নিয়ে আলাপ করে ওরা-যে জগতটা নিয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। টনির ব্যাপারে অনেক শুনলেও তার সাথে খুব কমই দেখা হয়েছে। একবার রিহাসালের পরে ক্যাথিকে আনতে গিয়ে দেখেছিলাম। তার সাথে কিন্তু আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি ক্যাথি, ব্যাপারটা অবাক করেছিল আমাকে। টনি বিবাহিত, তার স্ত্রীও অভিনয় করে। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল টনির সাথে ক্যাথির ঘেঁষাঘেঁষি ঠিক পছন্দ নয় মহিলার। এ দিক দিয়ে আমার সাথে মিল আছে তার। আমি বুদ্ধি দিয়েছিলাম কোন এক সন্ধ্যায় চারজন একসাথে ঘুরতে বের হবো। কিন্তু ক্যাথিকে খুব একটা আগ্রহী মনে হয়নি প্রস্তাবে। হয়তো ইচ্ছে করেই আমার থেকে টনিকে দূরে রাখতে চেয়েছিল সে।

ক্যাথিকে ল্যাপটপ খুলতে দেখলাম। স্ক্রিনটা এমনভাবে ঘুরিয়ে রেখেছে। যাতে আমি দেখতে না পারি। ওর টাইপ করার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কাকে মেইল পাঠাচ্ছে? টনি?

“কি করো?” হাই তুলে জিজ্ঞেস করলাম।

“আমার খালাতো বোনকে ইমেইল করছি। এখন সিডনিতে আছে ও।”

“তাই? আমার তরফ থেকেও হ্যালো বোলো।”

“ঠিক আছে।”

আরো কিছুক্ষণ টাইপ করে ল্যাপটপটা নামিয়ে রাখলো ক্যাথি। “গোসলে যাবো আমি।”

“ঠিক আছে,” মাথা নেড়ে বললাম।

মুচকি হেসে আমার দিকে তাকালো ক্যাথি। “মুখ এরকম গোমড়া করে রেখো না তো, আমার ভালো লাগে না। আসলেও ঠিক আছে?”

হেসে মাথা নাড়লাম। উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও। বাথরুমের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা করলাম। পানির শব্দ ভেসে এলো কিছুক্ষণ পরই। এতক্ষণ ক্যাথি যেখানে বসে ছিল, সেখানটায় গিয়ে বসলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে খুললাম ল্যাপটপটা। ব্রাউজার ওপেন করে ওর ইমেইলের পেজটায় ক্লিক করলাম।

লগ আউট করে দিয়েছে।

বিরক্তির সাথে আবারো জায়গামত রেখে দিলাম ল্যাপটপটা। এটা বন্ধ করতে হবে, ভাবলাম। পাগল হয়ে যাবো নাহলে। নাকি ইতোমধ্যেই পাগল হয়ে গেছি?

আমি বিছানায় উঠে চাদর ঠিকঠাক করছি এমন সময় দাঁত ব্রাশ করতে করতে বেডরুমে ঢুকলো ক্যাথি।

“তোমাকে তো বলতে ভুলেই গেছি। সামনের সপ্তাহে লন্ডন থেকে ফিরবে নিকোল।”

“নিকোল?”

“ভুলে গেছো? নিউ ইয়র্কে যাওয়ার আগে পার্টি দিয়েছিল আমার যে বান্ধবীটা।”

“ওহ হ্যাঁ। আমি তো ভেবেছিলাম একেবারে চলে গিয়েছে।”

“গিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার ফিরে আসবে,” বলে ক্ষণিকের জন্যে থামলো ক্যাথি। “আমার সাথে বৃহস্পতিবার দেখা করতে চায় ও...রিহার্সালের পর।”

সাধারণ এই কথাটা কেন সন্দেহের উদ্রেক ঘটালো আমার মনে তা বলতে পারবো না। ক্যাথি অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে রেখেছে, এজন্যে? মনে হচ্ছে যেন মিথ্যে বলেছে। আমি আর কিছু বললাম না। সে-ও কথা বাড়ালো না। বের হয়ে গেল ঘর থেকে। বাথরুম থেকে ওর কুলি করার আওয়াজ ভেসে এল কিছুক্ষণ পর।

হয়তো আমার সন্দেহের পুরোটাই অমূলক। আসলেও নিকোলের সাথে দেখা করবে সে বৃহস্পতিবার রাতে।

হয়তো অন্য কোথাও যাবে।

নিশ্চিত হবার একটাই উপায় আছে।

এবারে আর কোন ভিড় দেখলাম না অ্যালিসিয়ার গ্যালারির সামনে। কে বলবে যে, ঠিক এখানটাই লোকে লোকারণ্য ছিল ছ’বছর আগে? সবার সাথে দলবেঁধে আমিও অ্যালসেসিস্টস ছবিটা দেখতে এসেছিলাম। এখন জানালা থেকে নতুন এক শিল্পীর ছবি ঝুলছে, তবে তার আঁকার হাত ভালো হলেও অ্যালিসিয়ার মত গ্যালারিতে দর্শক টেনে আনতে পারেনি।

গ্যালারিতে পা দেয়া মাত্র কেঁপে উঠলাম। ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের তুলনায় কম। পরিবেশটাও কেমন যেন শীতল। বোঝাতে পারছি? কিছু জায়গায় গেলে একটু অন্য রকম লাগে না? সেরকম। চারদিকে থকথক করছে শূন্যতা।

ডেস্কের পেছনে নির্ধারিত সিটে বসে ছিল গ্যালারিস্ট। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

জিন-ফিলিক্স মার্টিনের বয়স চল্লিশের কোঠায়। সুদর্শনই বলা চলে। সুঠাম দেহ, কালো চুল। খলির নকশা আঁকা একটা আঁটসাঁট টিশার্ট পরনে। কেন এসেছি সে ব্যাপারে কোন রাখটাক করলাম না। অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কথা বলতে আত্মহীন মনে হলো তাকে, একটু অবাক হলাম ব্যাপারটায়। ফিলিক্সের কথার টান শুনে জিজ্ঞেস করলাম সে ফরাসি কি না।

“আমার জন্য প্যারিসে। কিন্তু গত বিশ বছর ধরে এখানেই আছি। এখন তো নিজেকে ব্রিটিশই মনে হয়,” হেসে পেছনের রুমটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। “চলুন, কফি খাওয়া যাক।”

“ধন্যবাদ।”

যে ঘরটাতে প্রবেশ করলাম সেটা অফিসের পাশাপাশি স্টোররুম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। একগাদা পেইন্টিং ফেলে রাখা একপাশে।

“অ্যালিসিয়া কেমন আছে?” কফি মেশিনের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। “এখনও মৌনব্রত পালন করছে?”

“হ্যাঁ,” মাথা নেড়ে বললাম।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। “খুব খারাপ লাগে ওর জন্যে। আপনি বসুন, প্লিজ। কি জানতে এসেছেন? আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ঠিকঠাক জবাব দেয়ার।” একটা শুকনো হাসি ফুটলো জিন-ফিলিক্সের মুখে। “তবে আমার কাছে কেন এসেছেন সেটা বুঝতে পারছি না।”

“আপনি আর অ্যালিসিয়া তো ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই না? মানে পেশাদার সম্পর্কের বাইরেও

“কার কাছে শুনেছেন একথা?”

“গ্যাব্রিয়েলের ভাই, ম্যাক্স বেরেনসন। তিনিই বললেন আপনার সাথে কথা বলে দেখতে।”

নামটা শুনেই চোখ বাঁকালো জিন-ফিলিক্স। “ওহ, ম্যাক্সের সাথেও দেখা করেছেন আপনি? বিরক্তিকর একটা লোক।”

এমন সুরে কথাটা বলল যে না হেসে পারলাম না। “আপনি ম্যাক্স বেরেনসনকে

চেনেন?”

“চিনি না মানে? ভালো করেই চিনি।” আমার হাতে কফির একটা ছোট কাপ তুলে দিল সে। “অ্যালিসিয়া আমার কাছ থেকে কিছু লুকোতো না। ওকে চিনি অনেক বছর হয়ে গেল, তখনও গ্যাব্রিয়েলের সাথে পরিচয় হয়নি ওর।”

“এটা জানতাম না।”

“আর্ট স্কুলে একসাথেই ভর্তি হয়েছিলাম দু’জনে। পাশ করার পর একসাথে পেইন্টিংও করি।”

“মানে দুজনে মিলে আঁকতেন?”

“আসলে তা না।” হেসে ওঠে জিন-ফিলিক্স। একসাথে দেয়াল রঙ করতাম। হাউজ পেইন্টার ছিলাম আমরা।”

আমিও হাসলাম। “ওহ, আচ্ছা।”

“শেষে দেখা যায় যে ক্যানভাসের চেয়ে দেয়াল রঙের ক্ষেত্রেই আমার প্রতিভা বেশি। তাই আঁকাআঁকি একরকম ছেড়েই দেই। ওদিকে অ্যালিসিয়ার হাত থেকে তখন সবে জাদু ঝরতে শুরু করেছে। কিছুদিন পর যখন এই গ্যালারিটার তদারকি শুরু করলাম, ওকে বললাম এখানেই প্রদর্শনী করতে। সবকিছু খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল বলা যায়।”

“তাই তো মনে হচ্ছে। আর গ্যাব্রিয়েল?”

“গ্যাব্রিয়েল?”

জিন-ফিলিক্সের কণ্ঠস্বরে রুঢ়তা টের পেলাম। গ্যাব্রিয়েলকে নিয়ে আরো কথা বলতে হবে তাহলে। “মানে জানতে চাচ্ছিলাম সে বিষয়টা কিভাবে নিয়েছিল। তাকেও নিশ্চয়ই ভালো করেই চেনেন আপনি?”

“নাহ্।”

“চেনেন না?”

“না,” দ্বিধা ভর করলো জিন-ফিলিক্সের কণ্ঠে। “গ্যাব্রিয়েল আসলে আমাকে ঠিকমতো চেনার চেষ্টাও করেনি কখনো। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সে।”

“মনে হচ্ছে তাকে খুব একটা পছন্দ নয় আপনার।”

“অস্বীকার করবো না। তাছাড়া আমারও মনে হতো যে সে আমাকে পছন্দ করে না। আসলেই করতো না।”

“সেটা কেন?”

“জানি না আমি।”

“কি মনে হয়? অ্যালিসিয়ার সাথে আপনার মেলামেশা ভালো চোখে দেখতো না?”

কফিতে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়লো জিন-ফিলিক্স। “হ্যাঁ, এটা হতে পারে।”

“আপনাকে ওদের সম্পর্কের জন্যে হুমকি ভাবত, নাকি?”

“আপনিই বলুন। মনে হচ্ছে সব জবাব ইতোমধ্যে আছে আপনার কাছে।”

এ বিষয়ে আর কথা বাড়ালে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই অন্য পন্থায় এগোলাম। “গ্যাব্রিয়েল খুন হবার কিছুদিন আগে অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করেন আপনি, তাই তো?”

“হ্যাঁ, ওর বাসায় গিয়েছিলাম খোঁজখবর নিতে।”

“এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত বলা যাবে?”

“কিছুদিনের মধ্যে বড় একটা প্রদর্শনী আয়োজন করার কথা ছিল আমাদের, কিন্তু কাজে পিছিয়ে পড়েছিল ও। সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল।”

“তার নতুন কাজগুলো দেখেছিলেন?”

“নাহ। বারবার সময় পেছাচ্ছিল। অগত্যা কিছু না বলেই সেদিন চলে যাই আমি। ভেবেছিলাম বাগানের স্টুডিওতে থাকবে হয়তো। কিন্তু সেখানে খুঁজে পাইনি অ্যালিসিয়াকে।”

“ওহ্”

“বাসার ভেতরে ছিল।”

“আপনি ভেতরে ঢুকলেন কী করে?”

প্রশ্নটা শুনে অবাক মনে হলো জিন-ফিলিক্সকে। “মানে?” চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মাথায় হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে। “ওহ আচ্ছা, বুঝেছি। বাগানের পেছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢোকার একটা দরজা আছে। সাধারণত খোলাই থাকতো ওটা। সেদিক দিয়েই রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যে একজন গোয়েন্দার সাথে কথা বলছি, সাইকিয়াট্রিস্ট নয়।”

“আমি একজন সাইকোথেরাপিস্ট।”

“কোন পার্থক্য আছে দুটোর?”

এড়িয়ে গেলাম প্রশ্নটা। “আমি আসলে ঐ মুহূর্তে অ্যালিসিয়ার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। আপনার কি মনে হয়েছিল? মন-মেজাজ কেমন ছিল তার?”

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো জিন-ফিলিক্স। “স্বাভাবিক। কাজ নিয়ে একটু চিন্তিত ছিল, এই যা।”

“আর কিছু?”

“তাকে দেখে অন্তত এটা মনে হয়নি যে কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করবে। সবকিছু ঠিকঠাকই লেগেছিল আমার কাছে।” কফিতে চুমুক দেয়ার সময় হঠাৎ চোখ বড় হয়ে যায় তার। কিছু একটা নিয়ে দোটানায় ভুগছে। “ওর পেইন্টিংগুলো দেখবেন?” বলে আমার জবাবের অপেক্ষা না করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল জিন-ফিলিক্স। ইশারায় অনুসরণ করতে বলল আমাকে।

“আসুন আমার সাথে।”

জিন-ফিলিক্সের পিছু পিছু স্টোররুমে চলে এলাম। একটা বড় কেসের সামনে দাঁড়িয়ে তাক থেকে কাপড়ে মোড়ানো তিনটা পেইন্টিং বের করে আনলো সে, সাবধানে কাপড়গুলো সরালে। এরপর হাসিমুখে প্রথম পেইন্টিংটা মেলে ধরলো আমার সামনে।

“এই দেখুন।”

মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম ছবিটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যালিসিয়ার আঁকা। দূর থেকে মনে হতে পারে ক্যামেরায় তোলা ছবি বড় করে ফেমে বাঁধানো হয়েছে। ছবিটায় অ্যালিসিয়ার মা’র গাড়ি দুর্ঘটনার দৃশ্যটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গাড়ির ধ্বংসাত্মক মারো স্টিয়ারিং হুইল ধরে নিশ্চল বসে আছে এক মহিলা, মৃত। আর গাড়ির ঠিক ওপরে তার আত্মাটা দেহ থেকে বেরিয়ে স্বর্গের পানে ছুটে যাচ্ছে। পিঠের সাথে দুটো পাখাও জুড়ে দিয়েছে অ্যালিসিয়া।

“চমৎকার না ছবিটা?” সমীহ মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জিন ফিলিক্স। “এই হলুদ, লাল আর সবুজের মাঝে হারিয়ে যাই মাঝে মাঝে। ইচ্ছে হলেই বের করে দেখি। অসাধারণ একটা দৃশ্য।”

দৃশ্যটা আর যা-ই হোক অসাধারণ নয়, আমার তো অস্বস্তিবোধ হচ্ছে।

পরবর্তী ছবিটা আমাকে দেখালো জিন-ফিলিক্স। ক্রসবিদ্ধ জিগুর একটা

পেইন্টিং। জিশু নাকি...?

“এটা গ্যাব্রিয়েল,” আমার অব্যক্ত প্রশ্নটার জবাব দিয়ে দিল গ্যালারিস্ট।

আসলেও জিশুর বেশে গ্যাব্রিয়েলের ছবি এঁকেছে অ্যালিসিয়া। ক্ষতস্থান থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। মাথায় কাঁটার মুকুট। তবে একটাই পার্থক্য, ছবিতে মাথা নিচু করে নেই গ্যাব্রিয়েল। বরং তার চোখের দৃষ্টিতে খেলা করছে ঔদ্ধত্য। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো আমার। সামনে এগিয়ে আরো ভালো করে খেয়াল করলাম ছবিটা। গ্যাব্রিয়েলের কাঁধ থেকে কি যেন ঝুলছে! একটা রাইফেল।

“এই বন্দুকের গুলিতেই তো মারা গেছে সে?”

মাথা নাড়লো জিন-ফিলিক্স। “হ্যাঁ, খুব সম্ভবত তারই বন্দুকটা।”

“ছবিটা হত্যাকাণ্ডের আগে আঁকা হয়েছে না?”

একমাস আগে। অ্যালিসিয়ার মনে কি চলছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে, তাই না?” বলে তৃতীয় ছবিটা বের করতে লাগলো সে। এটার ক্যানভাস আগের দুটোর চেয়ে বড়। আমার সবচেয়ে পছন্দের ছবি। একটু পিছিয়ে ভালো করে দেখুন।”

তার কথামত পিছিয়ে গেলাম কয়েক কদম। ছবিটা দেখার সাথে সাথে একটা হাসি ফুটলো মুখে।

অ্যালিসিয়ার ফুপি, লিডিয়া রোজের পেইন্টিং এটা! কেন রাগ করেছিল সে, এটা পরিস্কার বুঝতে পারছি এখন। ছবিটায় নগ্ন দেহে ছোট্ট একটা বিছানায় শুয়ে আছে সে। তার ভারে বেঁকে গিয়েছে পায়াগুলো। অস্বাভাবিক মোটা করে আঁকা হয়েছে তাকে, মনের সব ক্ষোভ ঢেলে। চামড়ার ভাঁজ বিছানা ছেড়ে মেঝে ছুঁইছুঁই করছে।

“ঈশ্বর! এটা কি করেছে!”

“আমার কাছে তো চমৎকার লেগেছে।” চোখে আত্মহ নিয়ে আমাকে দেখছে জিন-ফিলিক্স। “লিডিয়াকে চেনেন আপনি?”

“হ্যাঁ, দেখা করতে গিয়েছিলাম তার সাথে।”

“আচ্ছা।” মুখে হাসি ফুটলো গ্যালারিস্টের। “বেশ ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন তাহলে গত কয়েকদিন। আমি অবশ্য কখনো লিডিয়াকে দেখিনি। অ্যালিসিয়া সহ্য করতে পারতো না মহিলাকে।”

“হ্যাঁ,” ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললাম। “সেটা দেখতেই পাচ্ছি।”

ছবিগুলো কাপড়ে মুড়িয়ে আগের জায়গায় রেখে দিল জিন-ফিলিক্স।

“আর অ্যালসেস্টিস?” বললাম। “ওটা দেখাবেন না?”

“অবশ্যই, আসুন।”

সরু হলুদে ধরে হেঁটে গ্যালারির শেষমাথায় চলে এলাম আমরা। এখানে একটা দেয়াল শুধু অ্যালসেস্টিসের জন্যেই বরাদ্দ। আগেরবারের মতনই আমাকে মুগ্ধ করলো পেইন্টিংটা। আগাগোড়া শিল্প আর রহস্য মোড়া। স্টুডিওতে ইজেলের সামনে নগ্ন দেহে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালিসিয়া, পেইন্ট ব্রাশ থেকে টপটপ করে ঝরছে রক্ত। তবে এবারেও তার চেহারার অভিব্যক্তিটা ধরতে পারলাম না। ভ্রু কুঁচকে গেল আপনা থেকেই।

“তার মনে কি চলছে সেটা বোঝা যায় না ছবিটা দেখে।”

“পেইন্টিংটার উদ্দেশ্য তো সেটাই-অ্যালিসিয়া চাচ্ছে না কেউ তাকে বুঝুক। এক অর্থে তার মৌনতাই ফুটে উঠেছে চেহারার শূন্য অভিব্যক্তির মাধ্যমে।”

“বুঝলাম না।”

“সব শিল্পের কেন্দ্রেই একটা রহস্য থাকে। অ্যালিসিয়ার নীরবতাই হচ্ছে তার সেই রহস্য। সেজন্যেই তো ছবিটার নাম দিয়েছে অ্যালসেস্টিস। ইউরিপিডেসের লেখাটা পড়েছেন নাকি?” কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো জিন-ফিলিক্স। “না পড়লে পড়ে ফেলুন। তাহলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন।”

মাথা নাড়লাম। তবে এবারে ছবিটায় নতুন একটা জিনিস চোখে পড়লো যেটা গতবার খেয়াল করিনি। ইজেলের পেছনে টেবিলের ওপরে একটা ফলের বাটি রাখা-কিছু আপেল আর নাশপাতি শোভা পাচ্ছে সেখানে। তবে লাল আপেলগুলোর গায়ে সাদা সাদা কী যেন কিলবিল করছে।

“এগুলো কি?”

“পোকা?” মাথা নাড়লো জিন-ফিলিক্স। “হা।”

“বাহ, এগুলো এখানে আঁকার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।”

“এই পেইন্টিংটা একটা মাস্টারপিস। তারিফ করলেও কম হয়ে যাবে।” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছবিটার দিকে হাত দিয়ে দেখালো জিন-ফিলিক্স। “ওকে যদি তখন চিনতেন আপনি! একদম অন্যরকম একটা মেয়ে। চিন্তাধারাও ভিন্ন। অন্যেরা যেখানে জীবনে পৌনঃপুনিকতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেখানে ওর মাথায় নিত্যনতুন আইডিয়া খেলা করতে সবসময়। প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকা যাকে বলে।”

তার চোখ এখন অ্যালিসিয়ার নগ্ন দেহের দিকে। “এত সুন্দর।”

আমিও তাকালাম তার দৃষ্টি অনুসরণ করে। কিন্তু সে যেখানে সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছে, আমার চোখে ধরা পড়ছে বেদনা। আর সেগুলোর জন্যে অ্যালিসিয়া নিজেই দায়ি।

“ও কি কখনো আত্মহত্যার চেষ্টার ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলেছে?”

টোপটা গিলল জিন-ফিলিক্স। “ওহ, এটার ব্যাপারেও জানেন আপনি? হ্যাঁ, বলবে না কেন।”

“তার বাবার মৃত্যুর পর?”

“একদম ভেঙে পড়েছিল বেচারি,” মাথা নাড়লো জিন-ফিলিক্স। “সত্যটা অস্বীকার করে লাভ নাই, অ্যালিসিয়ার মানসিক অবস্থা কখনোই অতটা ভালো ছিল না। একটুতেই ভেঙে পড়তো। ওর বাবা যখন আত্মহত্যা করলো, আর সহ্য করতে পারেনি।”

“খুব বেশি ভালোবাসতো নিশ্চয়ই তাকে।”

কাঁধ হাসি ফুটলো জিন-ফিলিক্সের মুখে। এমন ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে যেন পাগলের প্রলাপ বকছি। “কী বলছেন এসব?”

“মানে?”

“অ্যালিসিয়া তাকে ভালোবাসতো না, ঘৃণা করতো। প্রচণ্ড ঘৃণা।”

এরকম কিছু শুনবো একদমই আশা করিনি। “অ্যালিসিয়া এমনটা বলেছিল আপনাকে?”

“হ্যাঁ! ওর মা মারা যাবার পর থেকেই বাবার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে ওর।”

“তাহলে তার মৃত্যুর পর আত্মহত্যার চেষ্টা করলো কেন? যদি তার জন্যে খারাপই না লেগে থাকে, কষ্ট না পায়...”

কাঁধ ঝাঁকালো জিন-ফিলিক্স। “অনুশোচনা থেকে করতে পারে। কে জানে কেন?”

কিছু একটা লুকোচ্ছে সে। হিসেব মিলছে না।

এসময় ফোন বেজে উঠলো। “এক মিনিট,” বলে ফোনটা বের করে কানে

চাপালো গ্যালারিস্ট। ওপাশ থেকে একটা মহিলাকণ্ঠ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ কথা বলে দেখা করার জন্যে সময় ঠিক করলো দু'জনে। “আমি ওখানে গিয়ে ফোন দেব তাহলে, ডার্লিং,” ফোন কেটে দিল জিন-ফিলিক্স। “দুঃখিত,” পরমুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

“সমস্যা নেই। আপনার গার্লফ্রেন্ড?”

“না,” হাসি ফুটলো তার মুখে। “বন্ধু...অনেক বন্ধু আছে আমার।”

তা তো থাকবেই, মনে মনে বললাম। কেন যেন এখন আর তাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না।

বিদায় নেয়ার আগ মুহূর্তে শেষ প্রশ্নটা করলাম। “আরেকটা ব্যাপার, অ্যালিসিয়া কি কখনো কোন ডাক্তারকে নিয়ে কিছু বলেছিল আপনাকে?”

“ডাক্তার?”

“আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর একজন ডাক্তার দেখায় সে। তার খোঁজ বের করার চেষ্টা করছি।”

“হুম,” ভ্রু কুঁচকে বলে জিন-ফিলিক্স। “কার কথা যেন শুনেছিলাম...”

“নামটা মনে আছে?”

এক মুহূর্ত ভেবে মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল সে। “দুঃখিত, মনে পড়ছে না।”

“ঠিক আছে। যদি মনে পড়ে, তাহলে আমাকে দয়া করা জানাবেন।”

“নিশ্চয়ই, তবে সে আশা কম।” দ্বিধা ফুটলো জিন-ফিলিক্সের চেহারায়ে। যেন কিছু একটা বলবে কি না ভাবছে। “আপনাকে একটা পরামর্শ দেই?”

“নিশ্চয়ই।”

“যদি অ্যালিসিয়াকে কথা বলাতে চান...তাহলে তার হাতে তুলি আর রঙ তুলে দিন। ছবি আঁকতে দিবেন ওকে। এভাবেই ও কথা বলবে আপনাদের সাথে। ছবির মাধ্যমে।”

“চমৎকার একটা বুদ্ধি দিয়েছেন...অনেক সাহায্য করলেন আজকে, ধন্যবাদ মি. মার্টিন।”

“জিন-ফিলিক্স বলে ডাকবেন আমাকে। আর অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা হলে তাকে আমার তরফ থেকে হ্যালো বলবেন।”

হাসলো লোকটা, সেই বিতৃষ্ণার অনুভূতিটা ফিরে এসেছে আবারও। এটা

নিশ্চিত যে অ্যালিসিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিল সে, লম্বা একটা সময় ধরে একে অপরকে চিনতো।

জিন-ফিলিক্স কি আসলে অ্যালিসিয়াকে গোপনে ভালোবাসে?

এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। অ্যালসেস্টিস ছবিটার দিকে যখন তাকিয়ে ছিল, তখন চোখে ভালোবাসার খেলা করতে দেখেছি। কিন্তু সেই ভালোবাসাটা পেইন্টিংয়ের জন্যে, শিল্পীর জন্যে নয়। জিন-ফিলিক্স একজন প্রকৃত শিল্পপ্রেমী। যদি অ্যালিসিয়াকে আসলেও ভালোবাসতো, তাহলে কখনো না কখনো গোপনে আসতোই।

অ্যালিসিয়ার মত কাউকে ভালোবাসলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

আসার পথে ওয়াটারস্টোনস থেকে এক কপি অ্যালসেস্টিস কিনলাম। ভূমিকায় লেখা যে এটা ইউরিপিডেসের প্রথম দিককার কাজ। ট্রাজেডি হিসেবে অতটা বিখ্যাত নয়।

মেট্রোরেল বসেই পড়া শুরু করে দিলাম বইটা। আর যা-ই হোক, টানটান উত্তেজনার-এটা বলা যাবে না। একটু অদ্ভুতও বটে। গল্পের নায়ক অ্যাডমেতাসের মাথার ওপর মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে। তবে অ্যাপোলো তিন ভাগ্যদেবীকে কথার প্যাঁচে ফেলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার একটা উপায় বাতলে দেয় তাকে। সেজন্যে তার স্থানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের জন্যে রাজি করাতে হবে কাউকে।

অ্যাডমেতাস তার বাবা আর মাকে বলে তার হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে, কিন্তু তাদের কেউই রাজি হয় না। অ্যাডমেতাস চরিত্রটা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই। গতানুগতিক ট্রাজেডির নায়কদের চেয়ে একদম ভিন্ন। গ্রিকরা নিশ্চয়ই তাকে কাপুরুষ বলেই গণ্য করতো। এর চেয়ে অ্যালসেস্টিস অনেক সাহসী একটা চরিত্র। সবকিছু শোনার পর স্বামীর জায়গায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিতে রাজি হয় সে। হয়তো ভেবেছিল অ্যাডমেতাস তার প্রস্তাবে রাজি হবে না, কিন্তু রাজি হয় যায় আমাদের ‘নায়ক’। মারা যাবার পর পাতাললোকে উদ্দেশ্যে রওনা হয় অ্যালসেস্টিস। হেডিসের রাজত্ব সেখানে।

গল্প কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। বলা যায় শেষে মোটামুটি শুভ সমাপ্তিই অপেক্ষা করছে। জিউসের পুত্র বীর হেরাকলস হেডিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে মতলোকে ফিরিয়ে আনে অ্যালসেস্টিসকে। আবারো বেঁচে ওঠে সে। স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে পানি

ঝরতে থাকে অ্যাডমেতাসের চোখ থেকে। কিন্তু অ্যালসেস্টিসের মনে কি চলছিল সেটা পরিস্কার হয় না। কারণ মতলোকে ফেরার পরে একবারের জন্যেও মুখ খোলেনি সে।

এই অংশটুকু পড়ে সোজা হয়ে বসলাম। বিশ্বাসই হচ্ছে না। সমাপ্তির অংশটুকু আবারো পড়লাম।

পাতাললোক থেকে ফিরে আসে অ্যালসেস্টিস। কিন্তু এরপর আর কথা ফোটেনি তার মুখে। সেটা ইচ্ছেকৃত না অনিচ্ছাকৃত তাও স্পষ্ট নয়। মরিয়া হয়ে এক সময় হেরাকলসকে প্রশ্ন করে অ্যাডমেটাস : “আমার স্ত্রী কোন কথা বলছে না কেন?”

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় নীরব অ্যালসেস্টিসকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাডমেটাস।

কেন?

কেন কথা বলা থামিয়ে দেয় অ্যালসেস্টিস?

অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ডায়েরি

অগাস্ট ২

আজকে আরো বেশি গরম পড়েছে। লন্ডনের তাপমাত্রা অ্যাথেন্সকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু অ্যাথেন্সে অন্তত সৈকত আছে একটা।

ক্যামব্রিজ থেকে পল ফোন দিয়েছিল আজকে। সত্যি বলতে এতদিন পর ওর কলটা পেয়ে একটু অবাকই হয়েছে। অনেকদিন হয়ে গেল কথা হয় না আমাদের। প্রথমেই যে ভাবনাটা মাথায় এসেছিল-লিডিয়া ফুপি নিশ্চয়ই মারা গেছে। অস্বীকার করার সুযোগ নেই, ভাবনাটা ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল আমার চিত্তে।

কিন্তু পল সেজন্যে কল দেয়নি। আসলে আমি এখনও জানি না যে তার ফোন দেয়ার উদ্দেশ্যটা কি ছিল। বারবার কথা পেঁচাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন দরকারের কথায় আসবে, কিন্তু ওরকম কিছুই বললই না শেষ পর্যন্ত। বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমি ঠিক আছি কি না, গ্যাব্রিয়েলের চাকরি কেমন যাচ্ছে-এসব। এক ফাঁকে বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ লিডিয়াকে গালমন্দও করেছে।

“তোদের সাথে দেখা করতে আসবো আমি,” বলেই ফেলি আলাপের এক পর্যায়ে। “যাবো যাবো করেও যাওয়া হচ্ছেনা অনেকদিন ধরে।”

সত্যটা হচ্ছে ওখানে আবার যাওয়ার কথা ভাবতেই নার্ভাস লাগে আমার। সেজন্যেই এতদিন যাইনি। কিন্তু না যাওয়ার কারণে তীব্র অনুশোচনা বোধও কাজ করে। বাড়িটা আমার জন্যে শাঁখের করাত।

“তোর সাথে অনেকদিন আলাপও হয় না।” পল আমতা আমতা করে যেন কি বলল জবাবে। “তাড়াতাড়িই আসবো দেখি। আচ্ছা, আমি একটু বাইরে যাবো-”

আবারো নিচুস্বরে কিছু একটা বলল পল।

“কি বললি? বুঝিনি। আবার বল।”

“বললাম আমি খুব বড় বিপদে পড়েছি, অ্যালিসিয়া। তোর সাহায্য লাগবে।”

“কি হয়েছে?”

“ফোনে বলা যাবে না। দেখা করতে হবে।”

“ইয়ে, মানে আমি তো এখন ক্যামব্রিজ আসতে পারবো না।”

“আমি আসছি তোর ঐখানে। আজ বিকালে?”

পলের কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে দ্বিতীয়বার কিছু না ভেবেই রাজি হয়ে গেলাম। বড় মরিয়া শোনাচ্ছিল।

“ঠিক আছে। এখন কি কোনভাবেই বলা সম্ভব না?”

বিকালে দেখা হচ্ছে,” লাইন কেটে দেয় পল।

বাকিটা দিন পল কি বলতে পারে সেটা নিয়ে ভেবেই কাটিয়েছি। কি এমন হতে পারে যেটা ফোনে বলা যাবে না? লিডিয়া সম্পর্কে কিছু বলবে? নাকি বাড়িটা সম্পর্কে? বুঝতেই পারছিলাম না।

লাঞ্চেটের পর আর কোন কাজ করা সম্ভব হয়না আমার পক্ষে। মুখে গরমকে দোষ দিলেও আসলে কোন কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। একটু পরপর রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাছিলাম, একসময় পলকে দেখতে পাই রাস্তায়।

“হাই, অ্যালিসিয়া,” হাত নেড়ে বলে ও।

ওর চেহারাটাই প্রথম ধাক্কা দেয় আমাকে। শুকিয়ে গেছে ভীষণ, গোলগাল মুখটা চেনাই যায় না প্রায়। চোয়ালও ভেতরে ঢুকে গেছে। চোখেমুখে সদা সন্ত্রস্ত একটা ভাব।

পোর্টেবল ফ্যানটা চালিয়ে রান্নাঘরের টেবিলেই বসি আমরা। বিয়ার দেব কি না জিজ্ঞেস করলে বলে যে আরো কড়া কিছুর প্রয়োজন। একটু অবাক হই কারণ আগে

ওকে সেভাবে কখনো ড্রিস্ক করতে দেখিনি। একটা গ্লাসে অল্প একটু হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিলাম। আমি অন্য দিকে তাকাতেই সেটা এক নিমেষে মুখে চালান করে দিয়ে আবারো গ্লাসটা ভরে নিল পল।

প্রথম কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম দুজনই। এরপর ফোনে যা বলেছিল সেটারই পনুরাবৃত্তি করলো সে :

“খুব বড় বিপদে পড়েছি।”

খুলে বলতে বললাম ওকে। বিপদটা কি বাড়ি নিয়ে?

শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় পল। বাড়ি নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি।

“তাহলে?”

“আমি বিপদে পড়েছি।” এরপর মাথা নেড়ে দ্বিধা ঝেড়ে আসল কথাটা বলল।

“জুয়া খেলা নিয়ে সমস্যা।”

গত কয়েক বছর ধরেই নিয়মিত জুয়া খেলে পল। প্রথম দিকে বাড়ির বাইরে সময় কাটানোর ছুতোয় জুয়ার আড্ডায় যেত। তাকে ঠিক দোষারোপও করা যাবে না, কে চাইবে লিডিয়ার সাথে এক ছাদের নিচে থাকতে? কিন্তু ওর জুয়া ভাগ্য ভাল না। জেতার চেয়ে হারেই বেশি। গত কয়েক মাস ক্রমাগত হেরেই চলেছে। পারিবারিক সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকার দিকে হাত বাড়ায় এক পর্যায়ে। তবে সেখানে এমনিতেও খুব বেশি টাকা ছিল না।

“কত লাগবে তোর?”

“বিশ হাজার।”

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। “বিশ হাজার পাউন্ড হেরেছিস?”

“একবারে না। কয়েকজনের কাছ থেকে কিছু ধারও করেছিলাম। ওরা টাকা ফেরত চাইছে এখন।”

“কাদের কাছ থেকে নিয়েছিলি?”

“শুধু জেনে রাখ, টাকা দিতে না পারলে আমাকে আর না-ও দেখতে পারিস।”

“তোর মা-কে বলেছিস?” উত্তরটা জানাই ছিল, তাও জিজ্ঞেস করলাম। পল এতটাও বোকা না।

“না! পাগল নাকি তুই? মেরেই ফেলবে আমাকে। তোর সাহায্য দরকার অ্যালিসিয়া, সেজন্যেই এসেছি। মুখ ফিরিয়ে নিস না।”

“আমার কাছে এত টাকা নেই, পল।”

“আমি ফেরত দিয়ে দিব তোকে। পুরোটা না পারলি, অল্প কিছু হলেও দে।”

জবাবে কিছু বলি না আমি। কিন্তু অনুনয় করতেই থাকে পল। আজ রাতেই নাকি টাকা নিতে আসবে পাওনাদারদের লোকজন। তখন তাদের আশ্বস্ত করার জন্যে সামান্য কিছু হলেও দিতে হবে। তাই খালি হাতে ফেরত যাওয়া চলবে না ওর। কি করবো বুঝে উঠতে পারিনি প্রথমে। ওকে সাহায্য করতে চাইছিলাম, কিন্তু এভাবে টাকা দেয়াটা উচিত হবে কি না সেটা ভাবনার বিষয়। এটাও জানতাম যে টাকা দিয়ে পাওনাদারদের শান্ত না করলে লিডিয়া ফুপির কাছ থেকে ওর ধার-কর্যের ব্যাপারটা লুকোনো সহজ হবে না। পলের জন্যে আসলেও খুব বাজে একটা পরিস্থিতি। আমার তো মনে হয় টাকা ধার দেয়া এসব মহাজনদের চাইতে লিডিয়ার মুখোমুখি অনেক বেশি ভয়ংকর।

“দাঁড়া, একটা চেক লিখে দিচ্ছি তোকে,” অবশেষে বলি আমি।

কৃতজ্ঞতার ছাপ ফোটে পলের চেহারায়ে। “ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।” বিড়বিড় করে বলতেই থাকে।

ওকে দু’হাজার পাউন্ডের একটা চেক দেই। জানি পরিমাণটা ওর জন্যে খুব কম, কিন্তু আগে কখনো এরকম পরিস্থিতিতে পড়িনি আমি। আমার জন্যেও ব্যাপারটা নতুন। তাছাড়া ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাসও হচ্ছিল না। কোন একটা ফাঁক তো নিশ্চয়ই আছে।

“গ্যাব্রিয়েলের সাথে কথা বলে হয়তো আরো বেশি দিতে পারবো,” বলি আমি। “কিন্তু আমাদের অন্য কোন সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। গ্যাব্রিয়েলের ভাই কিন্তু একজন আইনজীবী। হয়তো-”

লাফিয়ে ওঠে পল, আতঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় কয়েকবার। “না, না, না। গ্যাব্রিয়েলকে বলিস না। ওকে এসবের সাথে জড়ানোর কোন দরকার নেই। আমি দেখি সবকিছু কিভাবে সামলানো যায়।”

“আর লিডিয়া? তুই কতদিন লুকোবি-”

আবারো আগের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় পল। চেকটা একরকম ছিনিয়ে নেয় আমার হাত থেকে। পাউন্ডের পরিমাণটা দেখে হতাশ হলেও কিছু বলে না। বিদায় নিয়ে চলে যায় কিছুক্ষণ পরেই।

বারবার মনে হচ্ছিল ওকে আশাহত করেছি আমি। পনের ব্যাপারে সবসময় এই অনুভূতিটা কাজ করে আমার মনে, ছোটবেলা থেকেই। অবচেতন মনে সে হয়তো আশা করতো যে একজন অভিভাবকের মত তাকে আগলে রাখবো আমি। কিন্তু কিভাবে বোঝাবো, আসলে এই ব্যাপারটা আমার সাথে যায় না।

গ্যাব্রিয়েল ফেরার পর ওকে সবকিছু জানাই। একটু বিরক্তই হয় সে আমার প্রতি। পলকে নাকি এক পাউন্ডও দেয়া উচিত না, তার ভুলের মাশুল তাকেই গুণতে হবে। তাছাড়া এটা আমার দায়িত্বও না।

জানি যে গ্যাব্রিয়েল ঠিকই বলেছে, তবুও ভেতর থেকে অপরাধবোধ দূর হয় না। ওই বাড়িটা থেকে আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি, কিন্তু তার সেই সুযোগটা নেই। এখনও পনের মন মানসিকতা আট বছরের একটা ছেলের মতনই। আর সেই ছেলেটাকেই সাহায্য করতে চাই আমি।

কিন্তু জানি না কিভাবে করবো।

অগাস্ট ৬

আজকে সারাদিন পেইন্টিং নিয়েই কাটিয়েছি। জিশুর ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আঁকা যায় সেটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি কিছুক্ষণ। মেক্সিকোতে বেড়ানোর সময় যে ছবিগুলো তুলেছিলাম, ওগুলো দেখে কিছু স্কেচ করছি, এমন সময় জিন-ফিলিক্সের ডাক শুনতে পেলাম।

একবার ভাবলাম জবাব দেব না, তাহলে হয়তো চলে যাবে। কিন্তু গেট খোলার শব্দ কানে এলো পরক্ষণেই। দেরি হয়ে গেছে। বাইরে মাথা বের করে দেখি বাগানে ঢুকে পড়েছে সে।

আমার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো জিন-ফিলিক্স। “কি অবস্থা? তোমাকে বিরক্ত করলাম নাকি? কাজ করছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“বাহ! করো করো। আর মাত্র ছয় সপ্তাহ আছে প্রদর্শনীর। একটু পিছিয়েই আছে কিন্তু,” বলেই ওর সেই বিরক্তিকর হাসিটা হাসলো। আমার চেহারায় নিশ্চয়ই বিরক্তির ছাপটা ফুটে উঠেছিল। “মজা করছি কিন্তু। তোমার কাজের তদারকি করতে আসিনি,” পরক্ষণেই তড়িঘড়ি করে যোগ করলো।

জবাবে কিছুই বললাম না আমি। আবারো স্টুডিওতে ফিরে গেলাম, সে-ও এলো

আমার পিছুপিছু। একটা চেয়ার নিয়ে এসে ফ্যানের সামনে বসে সিগারেট ধরালো। বাতাসের কারণে পুরো ঘরেই ছড়িয়ে পড়লো গন্ধটা। আমি আবারো ইজেলের সামনে ফিরে গিয়ে তুলি তুলে নিলাম। একমনে কথা বলে চললো জিন-ফিলিক্স। লন্ডনের আবহাওয়া নিয়ে অভিযোগ করলে কিছুক্ষণ, বলল যে এখানকার পরিবেশের সাথে এরকম গরম যায় না। প্যারিস আর অন্যান্য অনেক শহরের সাথে যুক্তিহীন তুলনা করলো কতক্ষণ। আমি এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছিলাম। জিন-ফিলিক্সের কথা শুনলে মনে হয় দুনিয়াতে হেন কোন বিষয় নেই যা সম্পর্কে জানে না সে। রীতিমত বিশেষজ্ঞ। সে বাদে অন্য সবার ধারণায় কোন না কোন গলদ আছে। আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না, ঘ্যানঘ্যান করতেই থাকে। এতগুলো বছর ধরে একে অপরকে চিনি আমরা, তবুও আমি ওর কাছে একজন শ্রোতা বাদে কিছু না।

হয়তো আমি একটু বেশি বেশিই বলে ফেলছি। ও আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধুদের একজন-সবসময় বিপদে আপদে আমার পাশে থেকেছে। একটু একাকী, এই যা। কিন্তু আমিও তো ওর মতনই। আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে যে ভুল কারো সাথে সম্পর্কে জড়ানোর চাইতে একা থাকাই ভালো। সেজন্যেই গ্যাব্রিয়েলের আগে কারো সাথে সেরকম কোন সম্পর্কে জড়াইনি। একমনে অপেক্ষা করে গেছি ওর মত কারো জন্যে; যে আমাকে আমার সব ত্রুটি মেনে নিয়েও ভালোবাসবে। জিন-ফিলিক্স আমাদের সম্পর্কটা কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। অবশ্য সামনাসামনি কিছু বলেনি কখনো, তবে আমি ঠিকই বুঝতে পারি। গ্যাব্রিয়েলকে পছন্দ করে না সে। সবসময় ওকে নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে। আমার প্রতিভার সাথে গ্যাব্রিয়েলের প্রতিভার নাকি কোন তুলনাই চলে না, কতটা আত্মকেন্দ্রিক আমার স্বামী-এসব। জিন-ফিলিক্স হয়তো ভাবে যে এভাবে কানপড়া দিতে থাকলে তার কথা একসময় মেনে নেব আমি। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে, ওর প্রতিটা বাজে মন্তব্য আমাকে আরো বেশি করে গ্যাব্রিয়েলের দিকে ঠেলে দেয়।

আরেকটা বিষয়, সবকিছুতে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের দোহাই দেয় সে। এত বছরের বন্ধু আমরা, এক সময় তো আমার আর তোমার পাশে কেউ ছিল না'-এই কথাগুলো দিয়ে বশ করতে চায় আমাকে। কিন্তু জিন ফিলিক্স বোধহয় বোঝে না যে সে আমার জীবনের এমন একটা সময়ের কথা বলে যখন আমি প্রকৃতপক্ষে সুখি

ছিলাম না। আর ওর প্রতি আমার যে আবেগটুকু কাজ করতো তখন সেটাও ভুলে যেতে চাই। আমাদের সম্পর্কটা ছিল একপ্রকার বিবাহিত জুটির মতন, যাদের মধ্যে আর ভালোবাসার ছিটেফোঁটা নেই। কে চায় এমন কিছু মনে রাখতে? তাকে যে আসলে আমি কতটা অপছন্দ করি সেটা আজ টের পেয়েছি।

“আমি কাজ করছি,” এক পর্যায়ে বলেই ফেলি। “এটা শেষ করতে হবে, তাই যদি কিছু মনে না করো...”।

“তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছো?” চেহারার অভিব্যক্তি পাণ্টে যায় জিন ফেলিক্সের। “তুমি যেদিন প্রথম হাতে তুলি নিয়েছে, সেদিন থেকে তোমার পাশে আছি আমি। যদি তোমার কাজে বিরক্তই করে থাকি, তাহলে এতদিন বলোনি কেন?”

“এতদিন বলিনি, কিন্তু এখন বলছি।”

মনে হচ্ছিল, রুমের তাপমাত্রা যেন হঠাৎই বেড়ে গেছে। রাগ লাগছিল ভীষণ। চেষ্টা করেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আবারো ছবি আঁকায় মনোযোগ ফেরাতে গিয়ে দেখি হাত কাঁপছে। জিন-ফিলিক্স যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। আমার কথায় রেগে গেছো তুমি,” অবশেষে বলে সে। “কিন্তু কেন?”

“বললাম তো আমি ব্যস্ত। তাছাড়া এভাবে আগে থেকে না জানিয়ে ছুট করে বাসায় চলে আসতে পারো না তুমি। অন্তত ফোন তো করবে।”

“দুঃখিত, আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে আমার বেস্টফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতেও অনুমতি দরকার এখন।”

কেউই কথা বলি না কিছুক্ষণ। আমার কথায় আসলেও কষ্ট পেয়েছে জিন-ফিলিক্স। কিন্তু এখন তো আর কথাগুলো ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব না। বরং এতদিন ধরে যে কথাগুলো তাকে বলবো বলে ভেবে এসেছি, সেগুলোও বলে দেয়াই ভালো মনে হয়েছিল তখন। জানতাম যে অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে, তাকে তখন ইচ্ছে করেই কষ্ট দিতে চাইছিলাম।

“জিন-ফিলিক্স, শোনো।”

“বলো, শুনছি।”

“কথাটা অন্যভাবে নিওনা, কিন্তু এবারের প্রদর্শনীর পর...একটু পরিবর্তন

দরকার আমার জীবনে।”

“কিরকম পরিবর্তন?”

“গ্যালারি পরিবর্তন করতে চাই আমি।”

হতভম্ব দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল জিন-ফিলিক্স। মনে হচ্ছিল যেন ছোট কোন ছেলের হাত থেকে তার পছন্দের খেলনাটা আকস্মিক কেড়ে নেয়া হয়েছে। ওকে এভাবে দেখে বিরক্তি আরো বেড়ে গিয়েছিল আমার।

“আমাদের দু’জনেরই নতুন করে শুরু করা উচিত সবকিছু।”

“বুঝতে পারছি,” আরেকটা সিগারেট ধরায় সে। “পুরোটাই নিশ্চয়ই গ্যাব্রিয়েলের বুদ্ধি?”

“গ্যাব্রিয়েলের সাথে এসবের কোন লেনদেন নেই।”

“আমাকে দেখতে পারে না ও।”

“আহাম্মকের মতন কথা বলল না।”

“ও-ই আমার বিরুদ্ধে তোমাকে কানপড়া দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই দিয়ে আসছে।”

“এটা তোমার ভুল ধারণা।”

“এছাড়া আর কি ব্যাখ্যা আছে, বলো? তার প্ররোচনা ছাড়া কেন আমার সাথে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তুমি?”

“নাটক কোরো না তো। আমি শুধু গ্যালারি পরিবর্তনের কথা বলেছি। তোমার আর আমার বন্ধুত্ব তো বদলাবে না। চাইলেই একসাথে আড্ডা দেয়া যাবে।”

“কিন্তু সেজন্যে আগে আমাকে ফোন বা মেসেজ দিয়ে অনুমতি নিতে হবে?” হেসে উঠে একনাগাড়ে কথা বলতে শুরু করে সে, যেন আমি থামানোর আগেই সব বলে ফেলতে চাইছে। “বাহ, বাহ, বাহ! এতদিন ধরে আমি ভেবে এসেছি তোমার আর আমার বন্ধুত্বটা আসলেও অন্যরকম, কেউ এর মাঝে নাক গলাতে পারবে না। ভুল ভেবেছি আমি? আমার মত করে তোমার জন্যে কেউ কখনো ভাবেনি, ভাববেও না। এটা ভুলে যেও না।

“জিন-ফিলিক্স, প্লিজ-”

“তুমি যে এভাবে হঠাৎ করে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললে, এটাই অবাক করেছে আমাকে।”

“আসলে অনেকদিন ধরেই কথাটা তোমাকে বলবো বলে ভাবছিলাম।”

এই কথাটা বলা একদমই উচিৎ হয়নি আমার। চেহারা একদম ফ্যাকাসে হয়ে যায় জিন-ফিলিক্সের। “অনেকদিন ধরে মানে? কি বলছো এসব?”

‘এটাই সত্যি।’

“তাহলে এতদিন আমার সাথে অভিনয় করে এসেছো, তাই তো? অ্যালিসিয়া! এভাবে সব কিছু শেষ করে দিও না। আমার পিঠে ছুরি বসিও না, দোহাই লাগে।”

“তোমার পিঠে ছুরি বসানোর মত তো কিছু করছি না আমি! নাটক বাদ দাও। আমাদের বন্ধুত্ব আগের মতনই থাকবে।”

“আচ্ছা, এ বিষয়ে আমরা আপাতত আর কিছু না বলি। আসলে আজকে কেন এসেছিলাম আমি জানো? শুক্রবারে তোমার সাথে থিয়েটারে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।” পকেট থেকে দুটো টিকেট বের করে দেখায় ও। ইউরিপিডেসের একটা ট্রাজেডি চলছে ন্যাশনাল থিয়েটারে। “আমি চাই সেদিন তুমি আমার সাথে যাবে। এভাবেই নাহয় একে অপরকে বিদায় বলি * আমরা? আমাদের পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে হলেও না বলো না, প্লিজ।”

ইতস্তত করছিলাম। ওর সাথে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু তখন যদি মানা করতাম তাহলে খুব বেশি অপরাধবোধ হতো। সত্যি বলতে ওকে স্টুডিও থেকে বের করার জন্যে যে কোন কিছু করতে রাজি ছিলাম। তাই হ্যাঁ বলে দেই।

রাত ১০:৩০

গ্যাব্রিয়েল বাসায় ফিরলে তাকে সব জানাই। জবাবে ও বলে যে জিন ফিলিক্সের সাথে আমার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা কখনোই নাকি বোঝেনি।

“তোমার দিকে ও যেভাবে তাকায় সেটা পছন্দ না আমার।”

“কিভাবে তাকায়?”

“যেন তোমার ওপর ওর একটা দাবি আছে। আমার কি মনে হয় জানো? এখনই গ্যালারিটা ছেড়ে দেয়া উচিৎ তোমার-প্রদর্শনীর আগে।”

“সেটা সম্ভব না, বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি তো ওকে ইচ্ছেকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাই না। ওর মত মানুষ যে কতটা প্রতিশোধপরায়ণ হতে পারে....”

“তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওকে ভয় পাও।”

“ভয়ের তো কিছু নেই। ভয় পাবো কেন? ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে দূরে সরে

যাওয়াটাই ভালো হবে আমার জন্যে।”

“যত তাড়াতাড়ি সরে আসবে, তত ভালো। তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ও, সেটা তো বোঝো, নাকি?”

আর তর্ক বাড়াইনি তখন, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের ধারণা ভুল।

আমার প্রতি বাড়তি কোন আকর্ষণ নেই জিন-ফিলিক্সের। বরং আমার আঁকা ছবিগুলো বেশি আকৃষ্ট করে ওকে। এজন্যেই ওর কাছ থেকে দূরে সরে আসতে চাইছি। আমাকে নিয়ে কিছুই যায় আসে না তার।

তবে গ্যাব্রিয়েল একটা কথা ঠিকই বলেছে। ওকে ভয় পাই আমি।

ডায়োমেডেসকে তার অফিসেই খুঁজে পেলাম। হার্পটার সামনে একটা টুল নিয়ে বসে ছিলেন। বেশ বড় একটা কাঠের ফ্রেমে ঘেরা হার্পটার মাঝে সোনালী রঙের তারের সমাবেশ।

“খুবই সুন্দর জিনিসটা,” বলি আমি।

মাথা নাড়েন ডায়োমেডেস। “কিন্তু বাজানো খুব কঠিন।” তারগুলো আলতোভাবে স্পর্শ করতেই অপূর্ব কঙ্কনধ্বনিতে ভরে উঠলো ঘরটা। “তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?”

হেসে মানা করে দিলাম।

জবাবে তার মুখে হাসি ফুটলো। “তোমাকে বারবার বলি এই আশায় যে হয়তো মত বদলাবে কোনদিন। সহজে কিন্তু হাল ছাড়ব না, আগেই বলে দিচ্ছি।”

“আসলে সংগীত বিষয়ে একদমই প্রতিভা নেই আমার। আমাদের স্কুলের মিউজিক টিচার প্রথম দিনই একথা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।”

“আসলে থেরাপির মত সঙ্গিতের ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষক হিসেবে কাকে বেছে নিচ্ছে, তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে।”

“সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।”

বাইরের কালো হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। “মেঘগুলো দেখছো না? এগুলোর ভেতরে কিন্তু তুষার আছে।”

“আমার তো দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।”

“না, তুষার ঝরবে আজ। আমার কথার ওপর ভরসা করতে পারো, গ্রীসে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই রাখাল ছিল। তুষারপাতই হবে।”

আশাতুর দৃষ্টিতে আরো কিছুক্ষণ মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে নজর ফেরালেন ডায়োমেডেস। “কেন এসেছো, থিও?”

“এটার জন্যে।”

অ্যালসেস্টিসের কপিটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলি।

“কি এটা?”

“ইউরিপিডেসের লেখা একটা ট্রাজেডি।”

“সেটা তো বুঝতেই পারছি। আমাকে এটা দেখাচ্ছে কেন?”

“যেন তেন ট্রাজেডি নয়, এটার নাম অ্যালসেস্টিস। একটু ভেবে দেখুন, গ্যাব্রিয়েলের খুন হবার পর অ্যালিসিয়া তার আঁকা ছবিটার নাম কি দিয়েছিল?”

“তাই তো!” এবারে মনোযোগ দিয়ে বইটার দিকে তাকালেন ডায়োমেডেস। “নিজেকে ট্রাজেডির নায়িকা হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছে সেখানে।” মজাচ্ছিলেই কথাটা বললেন তিনি।

“হতেও পারে। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না ট্রাজেডিটা কি ইঙ্গিত করছে। সেজন্যেই ভাবলাম আপনি হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।”

“কারণ আমি গ্রিক?” উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন ডায়োমেডেস। “তুমি কি ভেবেছো? সব গ্রিক ট্রাজেডি সম্পর্কে জ্ঞান রাখি আমি?”

“আমার চেয়ে অন্তত বেশি।”

“কেন যে সবাই এটা মনে করে। তাহলে তো বলতে হয় ইংরেজ মাত্রই শেক্সপিয়ারের সব রচনা মুখস্থ করা উচিত তোমাদের,” বলে আমার উদ্দেশ্যে করুণার একটা হাসি দিলেন প্রফেসর। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভাল, আমাদের দেশের মধ্যে এটাই পার্থক্য। জন্মসূত্রে গ্রিক এমন সবাই ট্রাজেডিগুলো পড়েছে। এগুলো আমাদের ঐতিহ্যের অংশ।”

“তাহলে তো কথাই নেই। আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবেন। আপনি।”

বইটা একবার উল্টেপাল্টে দেখলেন ডায়োমেডেস। “কি বুঝতে পারছো না?”

“অ্যালসেস্টিসের কথা না বলার ব্যাপারটা। স্বামীর জন্যে আত্মহুতি দেয় সে। কিন্তু শেষে যখন পাতাললোক থেকে ফিরে আসে, কোন কথা বলে না।”

“হুম, অ্যালিসিয়ার মতন।”

“হ্যাঁ।”

“আবারো জিজ্ঞেস করছি, ঠিক কি বুঝতে পারছো না?”

“আপনার কি মনে হচ্ছে না দুটো ঘটনার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে? অ্যালসেস্টিস কেন কথা বলেনি শেষে?”

“তোমার কি মনে হয়?”

“বুঝতে পারছি না আসলে। হয়তো আবেগের বশে?”

“হয়তো। কোন আবেগের কথা বলছো?”

“আনন্দ?”

“আনন্দ?” হেসে উঠলে প্রফেসর। “আচ্ছা, একটা কথা বলো থিও। ধরো তুমি একজনকে ভালোবাসো, এখন সে যদি কাপুরুষের মতন নিজের জায়গায় তোমাকে মরতে বলে, তাহলে তোমার কেমন লাগবে? মনে হবে না যে সে তোমার ভালোবাসার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?”

“মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন সে কষ্ট পেয়েছিল?”

“কেউ কি কখনো তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি?”

প্রশ্নটা ছুরির ফলার মত এসে বিধলো আমার বুকে। বুঝতে পারছি যে চেহারা লাল হয়ে উঠছে। মুখ খুললেও কিছু বলতে পারলাম না।

“জবাবটা আন্দাজ করতে পারছি,” মুচকি হেসে বললেন ডায়োমেডেস।

“তাহলে...এবার বলল, অ্যালসেস্টিসের কেমন লাগছিল?”

“রাগ। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছিল সে।”

“হ্যাঁ, মাথা নেড়ে আমার সাথে সম্মতি প্রকাশ করলেন ডায়োমেডেস।

“ভবিষ্যতে অ্যাডমেতাস আর অ্যালসেস্টিসের মধ্যকার সম্পর্কটা কোন দিকে মোড় নিবে সেটা কিন্তু ভাবনার বিষয়। কারো প্রতি ভরসা উঠে গেলে সেটা ফিরে পাওয়াটা কঠিন।”

কয়েক সেকেন্ড পর মুখের ভাষা ফিরে পেলাম। “আর অ্যালিসিয়া?”

“অ্যালিসিয়া কি?”

“স্বামীর কাপুরুষতার জন্যে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে হয়েছিল অ্যালসেস্টিসকে। আর অ্যালিসিয়া-”

“না, অ্যালিসিয়া মারা যায়নি...অন্তত শারীরিকভাবে।” তার কথায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

“কিন্তু মানসিকভাবে...”।

“মানে বলতে চাইছেন যে এমন কিছু একটা হয়েছে যেটায় ওর আত্মার মৃত্যু ঘটেছে...ঘটনাটা ওর বেঁচে থাকার স্পৃহা কেড়ে নিয়েছে।”

“সম্ভবত।”

কেন যেন আমার মনঃপুত হলো না ব্যাখ্যাটা। বইটা হাতে নিয়ে প্রচ্ছদের দিকে তাকালাম। অনিন্দ্য সুন্দর একটা নারীমূর্তি শোভা পাচ্ছে সেখানে, মার্বেলের তৈরি। জিন-ফিলিক্সের বলা কথাটা মনে হলো এসময়।

“তাহলে এখন আমাদের উচিত হবে অ্যালসেসিস্টসের মতন অ্যালিসিয়াকেও উদ্ধার করা।”

“ঠিক বলেছো।”

“আচ্ছা, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। আঁকাআঁকি হচ্ছে অ্যালিসিয়ার মত প্রকাশের মাধ্যম। আমরা যে সেই সুযোগটা করে দেই তাকে?”

“কিভাবে করবে সেটা?”

“ছবি আঁকতে দেই?”

বিস্মিত মনে হলো ডায়োমেডেসকে। পরক্ষণেই হাত নেড়ে প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলেন। “ইতোমধ্যে আর্ট থেরাপি সেশনে বেশ কয়েকবার অংশ নিয়েছে ও।”

“আর্ট থেরাপির কথা বলছি না আমি। তাকে একা একা নিজের মত করে আঁকার সুযোগ করে দেয়া যায় কিন্তু ভেতরে আটকে থাকা আবেগগুলো হয়তো ক্যানভাসে চিত্রায়িত করতে পারবে সে।”

কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন ডায়োমেডেস। ভাবছেন বিষয়টা নিয়ে। “তোমাকে এ ব্যাপারে ওর আর্ট থেরাপিস্টের সাথে কথা বলতে হবে। তার সাথে পরিচয় আছে তোমার? রোয়েনা হার্ট? ওকে রাজি করানোটা সহজ হবে না”

“না, কিন্তু কথা বলে নেব। আপনার অনুমতি আছে তাহলে?”

কাঁধ ঝাঁকালো ডায়োমেডেস। “তুমি যদি রোয়েনাকে রাজি করাতে পারো, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। ওর পছন্দ হবে না বুদ্ধিটা। একটুও না।”

“চমৎকার বুদ্ধি,” রোয়েনা বলল।

“আসলেও?” বিস্ময় গোপন করলাম।

“হ্যাঁ। কিন্তু একটাই সমস্যা, অ্যালিসিয়া ছবি আঁকবে না।”

“এতটা নিশ্চিত হয়ে বলছেন কি করে?”

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে নাক দিয়ে শব্দ করে রোয়েনা। “কারণ অ্যালিসিয়ার মত ফালতু কাউকে নিয়ে আগে কাজ করিনি আমি। এত চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই সাড়া দেয়নি সে।”

“ওহ।”

রোয়েনার পিছু পিছু আর্ট রুমে চলে এলাম। মেঝের ওপরে রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেয়ালে নানারকমের চিত্রকর্ম। কয়েকটা সুন্দর কিন্তু বেশিরভাগই অদ্ভুত। রোয়েনার সোনালী চুল ছোট করে ছটা। জোড়া কুঁচকেই থাকে সর্বদা। অবশ্য সার্বক্ষণিক এতজন রোগিকে সামলাতে হলে স্বভাব চরিত্রে চাঁছাছোলা ভাব আসবেই। আর রোগিদের বেশিরভাগই নিশ্চয়ই তার কথা শোনে না। অ্যালিসিয়াও সেরকমই একজন।

“আর্ট থেরাপিতে কি আদৌ কখনো কোন আগ্রহ দেখিয়েছে অ্যালিসিয়া?”

“নাহ,” কথা বলার ফাঁকে রুমের তাকগুলো গোছগাছ করছে রোয়েনা। “তবে প্রথমে যখন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল, ভেবেছিলাম সবাই যদি সহযোগিতা করি তাহলে হয়তো সাড়া দিবে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করে না সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনের সাদা পেজের দিকে। এমনকি একবারের জন্যে পেন্সিলটাও ওঠায়নি। যারা তাও টুকটাক আঁকত, তারাও দমে যায় ওকে দেখে।”

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। আর্ট থেরাপির উদ্দেশ্যই হচ্ছে রোগিদের মনের ভাব রংতুলির মাধ্যমে কাগজে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা, তখন বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলাপও করতে পারি আমরা। মানুষের অবচতেন মনের ইচ্ছেগুলো কিন্তু চাইলে একটা কাগজে বিনা প্ররোচনায় ফুটিয়ে তোলা যায়। অবশ্য কাজের ব্যাপারে থেরাপিস্টের নৈপুণ্যও বড় একটা ভূমিকা পালন করে এক্ষেত্রে। রুথ প্রায়ই বলতো যে খুব কম থেরাপিস্টেরই ক্ষমতা আছে নিজের সজ্ঞা থেকে রোগিদের সাহায্য করার, বাকিরা এটাকে নিতান্ত সাধারণ একটা পেশা হিসেবেই দেখে। আমার মতে রোয়েনা দ্বিতীয় দলেই পড়বে। রোয়েনার নিশ্চয়ই ধারণা অ্যালিসিয়া তাকে আমলেই নিচ্ছে না। হয়তো ব্যাপারটা তার জন্যে কষ্টদায়ক,” গলার স্বর যতটা সম্ভব নরম করে বললাম।

“কষ্টদায়ক?”

“একজন শিল্পী নিশ্চয়ই অন্যান্য রোগীদের সামনে ছবি আঁকার ব্যাপারটা ভালোভাবে নেবেনা।”

“না নেয়ার কি আছে? কি এমন করেছে সে শুনি? ওর আঁকা ছবিগুলো দেখেছি আমি। ওরকম আহামরি কিছু মনে হয়নি,” বিরক্ত কণ্ঠে বলল রোয়েনা।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কেন অ্যালিসিয়াকে দেখতে পারে না সে। ঈর্ষা।

“যে কেউ ওরকম ছবি আঁকতে পারবে,” রোয়েনা বলল। “বাস্তব ছবির মত করে কোন কিছু আঁকা খুব সহজ। কিন্তু নিজ থেকে কল্পনা করে কিছু আঁকতে বললেই এদের ঘাম ছুটে যায়।”

অ্যালিসিয়ার আঁকা ছবিগুলোর শিল্পমান নিয়ে তার সাথে তর্কের কোন ইচ্ছে নেই আমার। “তাহলে আমি যদি ওকে আর্ট থেরাপি সেশন থেকে সরিয়ে নেই, আপনার কোন আপত্তি থাকবে না?”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো রোয়েনা। “না, আপত্তি করবো কেন। খুশিই হবে বরং।”

“ধন্যবাদ।”

“তবে ওর আঁকাআঁকির সরঞ্জামের ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। তেলরঙের জিনিসপত্র কেনার মত বাজেট নেই আমার।”

“একটা কাজ করে ফেলেছি আমি, শুনে বোধহয় একটু অবাকই হবেন।”

মেঝের দিক থেকে মুখ তুলল না অ্যালিসিয়া।

আমি কথা চালিয়ে গেলাম। “সোহোতে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সেখানে আপনার পুরনো গ্যালারিটা দেখে আর নিজেকে থামাতে পারিনি। ম্যানেজার নিজে আগ্রহ করে আমাকে আপনার আঁকা সব ছবি দেখিয়েছে। তিনি তো আপনার পুরনো বন্ধু বোধহয়। মি. জিন-ফিলিক্স মার্টিন?”

কোন উত্তর এলো না এবারেও।

“আশা করি আপনি ব্যাপারটায় কিছু মনে করেননি। আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাচ্ছি না কিন্তু। তবে আপনার সাথে প্রথমে কথা বলে নিলেই বোধহয় ভালো করতাম।”

মনে হচ্ছে যেন কোন মূর্তির সাথে কথা বলছি।

“আপনার কিছু পেইন্টিং আগে দেখিনি আমি, সেগুলোও দেখলাম কালকে। একটা আপনার মা’র দুর্ঘটনা নিয়ে আঁকা, আরেকটা আপনার ফুপি লিডিয়া রোজকে নিয়ে।”

এবারে মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া। তার চোখে আগে কখনো এরকম অভিব্যক্তি খেলা করতে দেখিনি। বিদ্রূপ?

“আপনার থেরাপিস্ট হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ছবিগুলোর ব্যাপারে কৌতূহল ছিল আমার। কিন্তু আমি যদি আপনাকে না-ও চিনতাম, তবুও ছবিগুলো দেখে অভিভূত হতাম নিশ্চিত। আমি কোন শিল্প-বিশারদ নই, কিন্তু আপনার পেইন্টিংগুলোর শিল্পমান নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।”

চোখ নামিয়ে নিল অ্যালিসিয়া। আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

“তবে কিছু জিনিস একটু অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে,” দ্রুত বললাম। “যেমন আপনার মা’র দুর্ঘটনার পেইন্টিংটায় আপনি ইচ্ছে করেই নিজেকে আঁকেননি। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় আপনিও তো গাড়িতেই ছিলেন।”

কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

“আচ্ছা, এর কারণটা ঠিক কি হতে পারে? আপনি হয়তো নিজেকে পেইন্টিংয়ে না রেখে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে ট্র্যাজেডিটা শুধুমাত্র আপনার মায়ের? কারণ তিনি মারা গিয়েছিলেন? কিন্তু গাড়িতে তো তখন ছোট্ট একটা মেয়েও ছিল। দুর্ঘটনাটা তার মনে কি প্রভাব ফেলেছিল, হয়তো সেটা কেউ বুঝতে চায়নি সে মুহূর্তে, নাকি?”

আবারো আমার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া। এবারে তার দৃষ্টিতে কৌতূহল। ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

“জিন-ফিলিক্সকে আমি আপনার অ্যালসেসিস্টস ছবিটার ব্যাপারেও কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। আসলে আত্মপ্রতিকৃতিটা আঁকার কারণ জানতে চাচ্ছিলাম। তখন উনি বললেন এটা পড়তে।”

অ্যালসেসিস্টস নাটকের কপিটা বের করে কফি টেবিলে রাখলাম। ওটার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া।

“ও কথা বলছে না কেন?”-নাটকের শেষ অঙ্কে জিজ্ঞেস করে অ্যাডমেতাস। আমিও আপনাকে একই প্রশ্ন করছি, অ্যালিসিয়া। কি এমন ঘটেছে যেটা বলতে

পারছেন না আপনি? কেন মুখ বন্ধ রেখেছেন?”

চোখ বন্ধ করে ফেললো অ্যালিসিয়া। আমাকে দৃষ্টির আড়াল করতে চাইছে। তার জন্যে আজকের মতন কথোপকথনের এখানেই সমাপ্তি। পেছনের দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকালাম। সেশনের সময়ও শেষ হতে চলেছে। আর দুই মিনিট বাকি।

তবে তুরূপের তাসটা এতক্ষণ অবধি লুকিয়ে রেখেছিলাম। ভেতরে ভেতরে নার্ভাস লাগলেও যতটা সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বললাম, “জিন ফিলিক্স একটা পরামর্শ দিয়েছেন। আমার কাছেও পরামর্শটা ভালোই মনে হয়েছে। তার মতে আপনাকে ছবি আঁকতে দেয়া উচিত। আঁকবেন? চাইলে আপনার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থাও করে দেয়া যাবে।”

চোখ খুলল অ্যালিসিয়া। বিস্ময় ফুটেছে চেহারায়। দেখে মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছি। তার নিষ্পাপ চাহনিতে সন্দেহ বা ঘৃণার কোন ছায়া নেই। হঠাৎ করেই তাকে বড় বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে।

“এ বিষয়ে প্রফেসর ডায়োমেডেসের সাথে কথা হয়েছে আমার, তিনি আপত্তি করেননি। রোয়েনাও রাজি। বল এখন পুরোপুরি আপনার কোর্টে, অ্যালিসিয়া। কি মনে হচ্ছে আপনার? আঁকবেন?”

অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার দিকে একমনে তাকিয়েই আছে অ্যালিসিয়া।

এরপর হঠাৎ করেই যা চাইছিলাম সেটা পেয়ে গেলাম, অবশেষে। তার এই প্রতিক্রিয়ার অর্থ ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমি।

খুবই সামান্য একটা প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এর প্রভাব বিস্তর।

হাসি ফুটেছে অ্যালিসিয়ার ঠোঁটে।

থোভের সবচেয়ে গরম জায়গাটা হচ্ছে ক্যান্টিন। দেয়াল জুড়ে অনেকগুলো রেডিয়েটর, তাই ওখানকার বেঞ্চগুলোই দখল হয়ে যায় প্রথমে। লাঞ্চে ভিড়টা হয় সবচেয়ে বেশি। স্টাফ আর রোগিরা পাশাপাশি বসে খায়। এসময়। ডাইনারের লোকদেরও ব্যস্ত সময় কাটে হৈ-হটগোলের মাঝে। তাছাড়া ইউনিটের সব রোগি এক জায়গায় জড়ো হওয়াতে সবসময় সতর্কও থাকতে হয়।

আজ দুইজন ক্যারিবিয়ান মহিলা হাসিমুখে ডাইনারের দায়িত্ব পালন করছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সবার পাতে ফিশ অ্যান্ড চিপস বা চিকেন কারি তুলে দিচ্ছে

দক্ষ হাতে। খাবারগুলো খেতে যেমনই হোক না কেন, গন্ধ সুন্দর। আমি ফিশ-অ্যান্ড-চিপস নিলাম, অভিজ্ঞতায় বলে এটার স্বাদই তুলনামূলক ভালো হবার কথা। খাবার নিয়ে আসার পথে এলিফকে দেখলাম সাজপাজ নিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসেছে। বরাবরের মতনই খাবারের মান নিয়ে হাজারটা অভিযোগ তাদের।

“এই ফালতু খাবার গলা দিয়ে নামবে না আমার।” সামনে থেকে ট্রে সরিয়ে দিল এলিফ।

তার ডান পাশে বসে থাকা আরেকজন রোগি সাথে সাথে ট্রে-টা নিজের দিকে টেনে নেয়ার চেষ্টা করতেই বেচারির মাথায় গাটা বসিয়ে দিল সে।

“ছোঁচা কোথাকার!” চিল্লিয়ে উঠলো পরক্ষণেই। “হাত সর।”

আশপাশের সবাই হেসে উঠলো দৃশ্যটা দেখে। নতুন উদ্যোগে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এলিফ।

রুমের একদম পেছন দিকে একা একটা টেবিলে বসেছে অ্যালিসিয়া। সামনে রাখা খাবারগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। মাঝে মাঝে মাছের টুকরোটা নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু একবারও মুখে তুলল না। ভাবলাম তার সাথে গিয়ে বসি, পরক্ষণেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। যদি আমার দিকে তাকাতো, তাহলে যাওয়ার কথা ভাবতাম। কিন্তু ইচ্ছে করে চোখ নামিয়ে রেখেছে সে, আশপাশের কোন কিছু প্রতি আগ্রহ নেই। এখন তাকে ঘটানোটা একদমই উচিৎ হবে না। তাই রোগিদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা টেবিলের শেষমাথায় বসে খাবার খেতে শুরু করলাম। স্বাদহীন মাছটা কেবলই মুখে দিয়েছি এমন সময় আমার পাশে এসে বসলো কেউ একজন।

ক্রিস্টিয়ান।

অবাক হলেও মুখে কিছু বললাম না।

“ঠিক আছো?” মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

“হ্যাঁ, তুমি?”

জবাব না দিয়ে প্লেট থেকে কিছুটা ভাত আর তরকারি মুখে চালান করে দিল ক্রিস্টিয়ান। “তুমি নাকি অ্যালিসিয়াকে ছবি আঁকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছ?” মুখভর্তি খাবার নিয়েই কথা বলছে সে।

“বাহ, ইতোমধ্যে জেনেও গেছো দেখছি।”

“ছোট জায়গায় খবর তাড়াতাড়ি ছড়ায়। বুদ্ধিটা আসলেও তোমার নাকি?”

“হ্যাঁ। ওর জন্যে ভালো হবে ব্যাপারটা।”

সন্দেহ ফুটলো ক্রিস্টিয়ানের চেহারায়ে। “সাবধানে, বন্ধু।”

“সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এত সাবধানতার কিছু নেই আসলে।”

“না, এমনি বললাম। বর্ডারলাইন রোগীদের আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে, বুঝি আমি ব্যাপারটা। এক্ষেত্রেও তেমনটাই হচ্ছে, তুমি ধরতে পারছে না।”

“অ্যালিসিয়া আমাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলবে না, ক্রিস্টিয়ান।”

হেসে উঠলো সে। “আমার ধারণা ইতোমধ্যে ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে তুমি। যা চাচ্ছে সেটাই তুলে দিচ্ছ হাতে।”

“ওর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে যা দরকার সেটাই করছি আমি। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।”

“তার কি দরকার সেটা তুমি কি করে জানলে? একটু মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ফেলছো না? এখানে কিন্তু অ্যালিসিয়া রোগি, তুমি নও।”

রাগ লুকোনোর জন্যে ঘড়ির দিকে তাকালাম। “যেতে হবে আমাকে।”

ট্রে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেঁটে চলে যাচ্ছি এসময় পেছন থেকে ডাক দিল ক্রিস্টিয়ান। “তোমার এই ভালোমানুষির এক কড়ি দাম নেই ওর কাছে। আমার কথা মিলিয়ে নিও পরে।”

প্রচণ্ড বিরক্ত হলাম কথাগুলো শুনে। সারাদিন আর মেজাজ ভালো হলো না।

ডিউটি শেষে গ্রোভ থেকে বেরিয়ে রাস্তার শেষ মাথায় ছোট দোকানটায় চলে গেলাম সিগারেট কিনতে। বিল মিটিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলাম। মাথায় ক্রিস্টিয়ানের বলা কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্ডারলাইন রোগীদের আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে।

আসলেও কি অ্যালিসিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি আমি? ওর মুখে সত্যটা শুনেই বিরক্ত হয়েছিলাম? ক্রিস্টিয়ান অন্তত এমনিটাই ভাবে, ডায়োমেডেসও নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছেন। তাদের ধারণাই ঠিক?

বেশ কিছুক্ষণ আপনমনে চিন্তা করার পর বুঝলাম তারা ভুল ভাবছে। অ্যালিসিয়াকে সাহায্য করতে চাই আমি, এর বেশি কিছু না। সবসময়ই তার থেকে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখেছি পেশাদারিত্বের খাতিরে। দরকার হলে আরো

সতর্ক থাকবো এখন থেকে।

(কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম আমি। যদিও নিজের কাছে স্বীকার করতে রাজি ছিলাম না ব্যাপারটা। বড্ড দেরি হয়ে গেছিল ততদিনে।)

জিন-ফিলিক্সের সাথে কথা বলার জন্যে ফোন দিলাম গ্যালারিতে। অ্যালিসিয়ার ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলো এখন কোথায় আছে তা জানতে চাইলাম। “সব কি স্টোরেজে রাখা?”

“না, আসলে,” কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জবাব দিল সে। “আমার কাছেই আছে ওগুলো।”

“আপনার কাছে?”

“হ্যাঁ। বিচারের পর ওর স্টুডিও থেকে সবকিছু নিয়ে এসেছি আমি। যেগুলো জরুরি মনে হয়েছে, সবই রেখে দিয়েছি। ওর পরনে অনেকগুলো স্কেচ, নোটবুক, তেলরঙ-এসব আরকি। ওর হয়ে সংরক্ষণ করছি বলতে পারেন।”

“খুব ভালো কাজ করছেন।”

“তাহলে আমার পরামর্শ মনে ধরেছে আপনার? অ্যালিসিয়াকে ছবি আঁকার সুযোগ করে দিচ্ছেন?”

“হ্যাঁ। তবে আদৌ কিছু হবে কি না সেটা সময়ই বলে দিবে।”

“কিছু না কিছু তো জানা যাবেই। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।”

“কি?”

“ও যদি কিছু আঁকে, আমাকে অবশ্যই দেখাবেন।”

তার কণ্ঠে অদ্ভুত একটা আকুতি। স্টোররুমে যত্নের সাথে রাখা অ্যালিসিয়ার ছবিগুলোর কথা মনে হলো আমার। ওগুলো কি আসলে অ্যালিসিয়ার জন্যে সংরক্ষণ করছে সে, নাকি নিজের জন্যে?

“আপনি কি একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো গোঁজে দিয়ে যেতে পারবেন?” জিজ্ঞেস করলাম। “সমস্যা হবে?”

“ইয়ে, মানে-” তার কণ্ঠের দ্বিধাস্থিত ভাবটা বুঝতে কষ্ট হলো না আমার।

“নাকি আমি এসে নিয়ে গেলেই সুবিধা?” তাকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিলাম।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে বরং?”

এখানে এসে অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করতে ভয় পাচ্ছে জিন-ফিলিক্স। কেন?

কি ঘটেছিল তাদের মাঝে?

কিসের মুখোমুখি হতে এত ভয় তার?

“তোমার বান্ধবীর সাথে কখন দেখা করবে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“সাতটার সময়, রিহার্সেলের পর।” আমার হাতে কফির কাপটা তুলে দিল ক্যাথি। “ওর নাম নিকোল। ভুলে গেছো বোধহয়?”

“ওহ হ্যাঁ,” হাই তুলে বললাম।

চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালো ক্যাথি। “আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুদের একজন হচ্ছে নিকোল। আর তুমি তার নাম ভুলে গেলে? ওর পার্টিতেও তো গিয়েছিলে!”

“আরে বাবা, মনে আছে তো আমার। শুধু নামটাই একটু ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা যাও, আর ভুলবো না।”

“আরো গাঁজা খাও,” মাথা বাঁকিয়ে বলল ক্যাথি। “আমি গোসলে যাই, দেরি হয়ে যাবে নাহলে।” রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আপনমনেই হেসে উঠলাম।

সন্ধ্যা সাতটার সময়ই সব হেস্টনেস্ট হয়ে যাবে।

সাতটা বাজার পনেরো মিনিট আগে আমি ক্যাথির রিহার্সাল হলের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে ভালোই লাগছিল।

ইচ্ছে করেই একটু দূরে বসেছি, তবে এখান থেকে দরজাটা ঠিকই দেখা যায়। আপাতত মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি, যাতে ক্যাথি আগে বের হলেও যাতে আমাকে দেখতে না পায়। কিছুক্ষণ পরপর অবশ্য দরজার দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে যাচ্ছে। এখন অবধি কেউ বের হয়নি।

সাতটা পাঁচের সময় অবশেষে খুলল দরজাটা। হাসিঠাট্টার শব্দ শুনতে পেলাম। অভিনেতা অভিনেত্রীরা বের হয়ে আসছে দলবেঁধে। তিনজন, চারজনের দলগুলো কথা বলতে বলতে একসময় দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ক্যাথি ছিলনা তাদের মাঝে।

আরো পাঁচ মিনিট চলে গেল। দশ মিনিট। ধীরে ধীরে লোকজনের সংখ্যা কমতে কমতে একসময় একদম ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। নিশ্চয়ই আমি আসার আগেই বেরিয়ে গেছে সে। নাকি এখানে আসেইনি?

রিহার্সেলে আসার ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিল সকালে?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে নিশ্চিত হতেই হবে। যদি ওর চোখে পড়ে যাই, তখন কি বলবো? কি ছুতো দিব এখানে আসার? ওকে সারপ্রাইজ দিতে এসেছি? হ্যাঁ, এরকম কিছুই বলতে হবে। দুই বান্ধবীকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাই আমি-এটা শুনলে নিশ্চয়ই আর কিছু সন্দেহ করবে না। ক্যাথি অবশ্য এড়িয়ে যেতে চাইবে। বলবে যে নিকোল অসুস্থ অথবা নিকোল শেষ মুহূর্তে মানা করে দিয়েছে। তখন দেখা যাবে বাকিটা সন্ধ্যা অস্বস্তি নিয়ে কাটাবো দু'জন। দীর্ঘ নীরবতাই হবে আমাদের একমাত্র সঙ্গি।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মন থেকে সব দ্বিধা ঝেঁরে ফেললাম। যা হওয়ার হবে। দরজা খুলে পা রাখলাম ভেতরে।

একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ এসে লাগলো নাকে। কংক্রিটের ওপরে কোন কার্পেট বা ওয়ালপেপারের বালাই নেই। ক্যাথিদের রিহাসাল হয় এই দালানের চার তলায়। লিফট নেই, তাই হেঁটেই উঠতে হয় প্রতিদিন। অনেকবার এ নিয়ে অভিযোগও করেছে ক্যাথি। সবে দোতলার সিঁড়িতে পা দিতে যাবো এ সময় ওপর তলা থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ফোনে কথা বলছে ক্যাথি:

“আমি জানি বাবা...খুব বেশিক্ষণ লাগবে না আর। বাই।”

জমে গেছি আমি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে মুখোমুখি হয়ে যাবো ওর সাথে। একদম শেষ মুহূর্তে হুঁশ ফিরে পেলাম। লাফিয়ে নিচে নেমে ডানদিকে সরে যাওয়া মাত্র আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ক্যাথি। সোজা দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছে। তাড়াহুড়ো না থাকলে আমাকে অবশ্যই চোখে পড়তো তার।

আমিও দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলাম। ব্রিজের উদ্দেশ্যে প্রায় দৌড়াচ্ছে এখন ক্যাথি। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ওর পিছু নিলাম। তবে চারপাশে ভিড় থাকায় খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না।

ব্রিজ পার হয়ে মেট্রোরেল স্টেশনের দিকে পা চালালো ক্যাথি। হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে ভাবছি যে কোন ট্রেনে চড়বে। কিন্তু মেট্রোরেল উঠলো না ও। বরং সোজা হেঁটে স্টেশনের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো। চারিং ক্রস রোডের দিকে হাঁটছে এখন। পিছু নিলাম। একসময় চারিং ক্রস রোড পার হয়ে সোহোর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। এখানকার রাস্তাগুলো তুলনামূলক সরু। বেশ কয়েকবার ডানে-বামে মোড় নিল ক্যাথি। এরপর অকস্মাৎ থেমে গেল লেক্সিংটন স্ট্রিট

চৌরাস্তায়। কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।

এখানেই তাহলে দেখা করে তারা। ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়েছে। চারপাশে ভিড় থাকে সবসময়, কারো চোখে পড়বে না। উপায়ন্তর না দেখে রাস্তার পাশের একটা পাবে ঢুকে পড়লাম। বার কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালে ক্যাথিকে স্পষ্ট দেখা যায়। দাড়িওয়ালা বারটেন্ডার ব্রু উঁচু করে তাকালে আমার দিকে। “কি লাগবে?”

“গিনেস। এক পেগ।”

হাই তুলে কাউন্টারের অন্য পাশ থেকে একটা গ্লাস এনে আমার সামনে রাখলো সে। ক্যাথি যদি সরাসরি এদিকে তাকায়, তবুও জানালার ফাঁক গলে আমাকে দেখতে পাবে না। কিছুক্ষণ পর আসলেও তাকালো সে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল আমার। কিন্তু না, ধরা পড়ে যাইনি। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে ক্যাথি।

পাঁচ মিনিট চলে গেল। এখনও অপেক্ষা করছে ক্যাথি। আমি গ্লাসটা নাড়াচাড়া করে চলেছি একমনে। আসতে দেরি করছে লোকটা। ক্যাথির তো এরকমটা পছন্দ করার কথা নয়। কারো জন্যে সচরাচর অপেক্ষা করেনা সে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেই দেরি করে। বিরক্তির ছাপ দেখতে পাচ্ছি ওর চেহারায়, বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

এসময় একটা লোক রাস্তা পার হয়ে তার দিকে এগোতে লাগলো। কয়েক সেকেন্ডেই তাকে মেপে ফেললাম। চওড়া ছাতি, কাঁধ অবধি নেমে এসেছে সোনালী চুল। এই বিষয়টা অবাক করলো আমাকে, ক্যাথি সাধারণত কালো চুলের পুরুষদের পছন্দ করে, আমার মতন। হয়তো এই বিষয়েও মিথ্যে বলেছে।

কিন্তু লোকটা ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তার দিকে ফিরেও তাকালো না ক্যাথি। দ্রুত দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল সে। তাহলে এই লোকটা না। ক্যাথি আর আমার মনে হয়তো একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে এখন, আজকে আর আসবে না সে।

ঠিক এসময় ওর মুখে হাসি ফুটলো, কাউকে দেখেছে নিশ্চয়ই। রাস্তার অন্যপাশে কারো উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে এখন। অবশেষে, ভাবলাম আমি, এসেছে তাহলে। ঘাড় সামনে বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলাম লোকটাকে।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বছর তিরিশের এক স্বর্ণকেশী এগিয়ে গেল গেল ওর দিকে। পরনের স্কার্টটা অতিরিক্ত খাটো, চেহারা আকর্ষণীয়ই বলা চলে।

তাকে চিনতে অবশ্য কোন সমস্যা হলো না আমার। নিকোল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো দুই বান্ধবী। এরপর হাত ধরে হাসতে হাসতে হাঁটা দিল ওপর দিকে।

অর্থাৎ ক্যাথি সত্যটাই বলেছিল আমাকে। কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সত্যটা জেনে আশ্বস্ত হবার পরিবর্তে উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠলাম। না উদ্ভিগ্ন না, আসলে হতাশ হয়েছি।

এরকমটা তো হবার কথা ছিল না!

“তোমার কাছে কেমন লাগছে অ্যালিসিয়া? অনেক আলো না? পছন্দ হয়েছে?”

গ্রোভের নতুন স্টুডিও রুমটা গর্বের সাথে দেখাচ্ছে ইউরি। নার্স স্টেশনের পাশের অব্যবহৃত খালি রুমটা যে স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এই বুদ্ধিটা তার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। আমিও আপত্তি করিনি। অন্তত রোয়েনার আর্ট থেরাপি রুমের চেয়ে অনেক ভালো জায়গাটা। ওখানে থাকলে সে নিশ্চিত কোন না কোন ছুতোয় জ্বালাতন করতে অ্যালিসিয়াকে। এখানে সে নিজের মত করে আঁকাআঁকি করতে পারবে, কেউ বিরক্ত করবে না।

ঘরের চারপাশে নজর বুলালো অ্যালিসিয়া। তার ইজেলটা জানালার পাশে বসানো হয়েছে কারণ ওখানে অল্প হলেও প্রাকৃতিক আলো পাবে। রংগুলো টেবিলের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। অ্যালিসিয়া সেদিকে এগোলে আমার উদ্দেশ্যে চোখ টিপলো ইউরি। গোটা ব্যাপারটায় তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। সেজন্যে আমি আসলেও কৃতজ্ঞ। সে না থাকলে এতকিছুর বন্দোবস্ত করতে বেগ পেতে হতো। তাছাড়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় স্টাফও সে, তাই তাকে হাত করতে পারাটা যে কারো জন্যে সুবিধাজনক। “আমার পক্ষ থেকে শুভকামনা রইলো। এবারে আপনি সামলান তাহলে,” বলে হাসিমুখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল সে। তবে অ্যালিসিয়ার এসবের দিকে কোন মনোযোগ নেই।

নিজের দুনিয়ায় হারিয়ে গেছে সে। মিষ্টি একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে একমনে রংগুলো দেখছে। কালো তুলিগুলোর গায়ে এমনভাবে হাত বুলাচ্ছে যেন প্রেমিকের দেয়া ফুল। তিনটা রঙের টিউব আলাদা করলো অ্যালিসিয়া-প্রুসিয়ান ব্লু, ইন্ডিয়ান ইয়েলো আর ক্যাডমিয়াম রেড। এরপর ইজলে আটকানো ফাঁকা ক্যানভাসটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, ভাবছে কিছু একটা। দীর্ঘ একটা সময় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকলো ওখানেই, যেন একটা ঘোর পেয়ে বসেছে। তার শরীরটা এখানে থাকলেও

মন নিশ্চয়ই উড়ে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের জগতে, যে স্বপ্নের জগতে কেবল রঙের ছড়াছড়ি। হঠাৎ করেই যেন ঘোর কেটে যায় অ্যালিসিয়ার, টেবিলের দিকে ফিরে একটা প্যালেটে কিছুটা সাদা রঙ নিয়ে তার মধ্যে সামান্য একটু লাল রঙ ঢালল। একটা তুলি দিয়ে রংগুলো মেশাতে হচ্ছে তাকে। কারণ ধারালো সব সরঞ্জাম আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, প্যালেট নাইফগুলোও।

তুলিতে লাল রঙ মেখে সাদা ক্যানভাসের ঠিক মাঝখানে একটা দাগ দেয় অ্যালিসিয়া। এরপর এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আরেকটা দাগ দিল পাশে। আরেকটা। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ছবি আঁকায়। কোন জড়তা বা অস্বস্তির বালাই নেই তার মাঝে। একমনে একেই চলেছে। যেন এই কাজটার জন্যেই জন্ম হয়েছিল অ্যালিসিয়া বেরেনসনের। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম আমি।

পুরোটা সময় চুপ থাকলাম, শব্দ করে শ্বাস ফেলতেও ভয় হচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল এই সময়টুকু একান্তই অ্যালিসিয়ার ব্যক্তিগত, এখানে আমার কোন স্থান নেই। তবে আমার উপস্থিতি নিয়ে তার কোন আপত্তি নেই। কয়েকবার তো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে আমি আছি কি না।

সেই সময়গুলোয় মনে হচ্ছিল আমার অভিব্যক্তি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছে সে।

কারণটাও বুঝে গেলাম খুব শিঘ্রই।

পরবর্তী কয়েকদিনে ছবিটা ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করে, শুরুর দিকে অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না যে কি আঁকছে সে। কিন্তু কয়েকদিন বাদে সেই বিভ্রান্তিও দূর হয়ে গেল। নিখুঁতভাবে ক্যানভাসে ফুটে উঠছে সবকিছু।

একটা লাল ইটের দালান এঁকেছে অ্যালিসিয়া, দেখলেই থোভের কথা মনে হবে যে কারো। কিন্তু ক্যানভাসের হাসপাতালটায় আগুন ধরে গিয়েছে। আর সেই আগুনের লেলিহান শিখার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একজন পুরুষ আর একজন নারী। লাল চুল দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নারীটি অ্যালিসিয়া। এবং তাকে কোলে করে ধরে রাখা মানুষটা আর কেউ নয়, আমি। আগুন প্রায় আমার পায়ের কাছ অবধি পৌঁছে গেছে।

তবে খুব ভালো করে দেখলে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে অ্যালিসিয়াকে কি

আসলেও উদ্ধার করছি আমি, নাকি আগুনে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছি?

“এটা কেমন কথা! এখানে বেশ কয়েক বছর ধরে আসা যাওয়া করছি আমি। কেউ তো কখনো বলেনি যে আসার আগে ফোন করতে হবে। এভাবে অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অনেক কাজ ফেলে এসেছি।”

রিসিপশন ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে এভাবে তারস্বরে অভিযোগ করেই চলেছে এক মহিলা। কথা শুনে মনে হচ্ছে আমেরিকান। স্টেফানি অবশ্য তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছে। বারবি হেলমানকে চিনতে আমার কোন অসুবিধে হলো না, গ্যাব্রিয়েল খুন হবার পর পেপার-টিভিতে অহরহ দেখা যেত তাকে। ঘটনার রাতে সে-ই প্রথম ফোন করে পুলিশকে।

বার্বির বয়স পঁয়ষট্টির আশেপাশে, চুল সোনালী। দূর থেকেও তার শ্যানেল নম্বর ফাইভ পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে, প্লাস্টিক সার্জারির কারণে ঠোঁটগুলো এখন আর চেনার মত অবস্থায় নেই। বার্বি নামটা তার জন্যে আসলেও মানানসই-চেহারাসুরুত পুতুলটার মতনই (ওজন একটু বেশি আর কি)। আচরণে বোঝাই যাচ্ছে সবসময় ইচ্ছেমতন সবকিছু পেয়ে অভ্যস্ত। আর এজন্যেই তাকে যখন জানানো হয়েছে যে এখন থেকে রোগীদের সাথে দেখা করার জন্যে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হবে, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে।

“ম্যানেজারকে ডাকুন এখনই, এমন ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কথাটা বলল যেন কোন রেস্টোরাঁর ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাচ্ছে। এসবের মানে কি? কোথায় সে?”

“আমিই এখানকার ম্যানেজার, মিসেস হেলমান,” স্টেফানি বলল। “আমাদের আগেও দেখা হয়েছে।”

এই প্রথম স্টেফানির প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করছি আমি; বার্বির সাথে এভাবে কথা বলতে কারোই ভালো লাগার কথা নয়। স্বাভাবিকের চাইতে বড় দ্রুত কথা বলে বার্বি, মাঝে একবারের জন্যে বিরতিও দেয় না। ফলে তার কথার জবাবে কিছু বলা মুশকিল।

“অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়ার ব্যাপারে আগে তো কিছু বলেননি আপনি,” বার্বি হেসে বলল। “এর চাইতে তো ক্যাফে ট্যামারিন্ডে টেবিল বুকিং দেয়া সহজ।”

“আমি কি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?” সামনে এগিয়ে স্টেফানির উদ্দেশ্যে একবার হেসে বললাম।

“না, ধন্যবাদ। আমিই সামলাতে পারবো,” কিছুটা বিরক্ত মনে হলো ইউনিট ম্যানেজারকে।

চোখে আগ্রহ নিয়ে আমাকে আপাদমস্তক দেখলো বার্বি। “আপনি কে?”

“আমি থিও ফেবার। অ্যালিসিয়ার থেরাপিস্ট।”

“তাই নাকি?” বার্বি বলল। “দারুণ তো।” কথা শুনে মনে হচ্ছে ম্যানেজারদের চাইতে থেরাপিস্টদের সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে। স্টেফানির প্রতি আগ্রহ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে অ্যালিসিয়ার প্রাক্তন প্রতিবেশী। এমন আচরণ করছে যেন সে একজন সাধারণ রিসিপশনিস্ট বৈ কিছু নয়।

“আপনি নিশ্চয়ই নতুন? আগে তো দেখিনি।” প্রশ্ন করলেও আমাকে জবাব দেয়ার কোন সুযোগ দিলো না বার্বি, নিজ থেকেই আবারো বলে উঠলো, “সাধারণত প্রতি দুই মাস পরপর আসি আমি। তবে এবারে কিছুটা ব্যস্ত থাকায় লম্বা একটা সময় আসতে পারিনি। আমেরিকা গিয়েছিলাম পরিবারের সবার সাথে দেখা করতে। ফিরে আসা মাত্র তাই অ্যালিসিয়ার খোঁজ নিতে এসেছি। ওকে বড্ড মিস করছিলাম। অ্যালিসিয়া কিন্তু আমার খুব ভালো বন্ধু, জানেন বোধহয়।”

“না, জানতাম না।”

“আরে হ্যাঁ। ওরা যখন প্রথম বাড়িটায় ওঠে, আমিই সব বিষয়ে সাহায্য করি। খুব দ্রুত ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় অ্যালিসিয়ার সাথে। এমন কোন বিষয় নেই যেটা নিয়ে আমার সাথে আলাপ করতো না অ্যালিসিয়া। বুঝলেন তো কি বলছি? আমাকে সব জানাতো সে। সব।”

“আচ্ছা।”

এ সময় ইউরিকে দেখতে পেয়ে তাকে ইশারায় রিসিপশনে আসতে বললাম। “মিসেস হেলমান অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করতে এসেছেন।”

“আমাকে বার্বি বললে ডাকবেন। ইউরি তো আমাকে ভালো করেই চেনে,” বলে হেড নার্সের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো সে। “আমরা পুরনো বন্ধু। কিন্তু এই মহিলা -”

মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে স্টেফানির উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো বার্বি। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেল ইউনিট ম্যানেজার। “মাফ করবেন, মিসেস হেলমান। কিন্তু আমাদের নিয়ম কানুনে কিছুটা কড়াকড়ি করা হয়েছে রোগীদের নিরাপত্তার

স্বার্থে। এখন থেকে আগে ফোন করে”

“উফ! আবারো সেই একই প্যাচাল। কান পচে গেল আমার।”

এবারে হাল ছেড়ে দিল স্টেফানি। ইউরি বার্বিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে আমিও চললাম তাদের সাথে।

দর্শনার্থীদের জন্যে আলাদা রুম আছে থোভে। আমাদের সেখানে রেখে দ্রুত গিয়ে অ্যালিসিয়াকে ভেতর থেকে নিয়ে এলো ইউরি। রুমে টেবিল একটাই, দুপাশে দুটো চেয়ার। ইউরি বাদেও আরো দু’জন নার্স দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকে বার্বিকে দেখে কোন ভাবান্তর হলো না অ্যালিসিয়ার। মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে পড়লো।

তবে বার্বিকে সে তুলনায় যথেষ্ট আবেগী মনে হচ্ছে এখন। “অ্যালিসিয়া, তোমার কথা অনেক মনে পড়ছিল, জানো? আরো শুকিয়ে গেছে। আমার যদি এরকম ফিগার হতো! কেমন আছো তুমি? ঐ দজ্জাল মহিলার কারণে আরেকটু হলেই না দেখা করে চলে যেতে হতো আজকে

একা একাই এভাবে অনর্গল কথা চালিয়ে গেল বার্বি। স্যান ডিয়েগোতে গিয়ে কি করেছে, কার কার সাথে দেখা করেছে-সব বিস্তারিত বলল। গোটা সময় পাথরের মত মুখ করে বসে থাকলো অ্যালিসিয়া, যেন কোন কথাই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। বিশ মিনিট পর অবশেষে কথার ট্রেন থামালো বার্বি। অ্যালিসিয়াকে রুম থেকে নিয়ে গেল ইউরি, এখনও তার মুখে ঠিক আগের মতনই অনাগ্রহ।

বার্বি থোভ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাকে ডাক দিলাম আমি। “আপনার সাথে কিছু কথা বলতে পারি?”

মাথা নেড়ে সাই জানালো সে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন জানতে যে আমি আসবো। “অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কথা বলবেন? যাক, এতদিনে কারো হুশ হলো তাহলে। এমনকি পুলিশের লোকগুলোও আমার কথায় পাত্রা দেয়নি, এমন ভাব করছিল যেন আমি পাগল। কেউ বিশ্বাসই করেনি যে আমি অ্যালিসিয়ার ভালো একজন বন্ধু। ওর সব কথা জানি। এমন সব বিষয়ে আমার সাথে আলাপ করতে সে, আপনি শুনলে তাজ্জব বনে যাবেন।” আমার দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যপূর্ণ একটা হাসি দিল বার্বি। বুঝতে পেরেছে, আমি আগ্রহী অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে শুনতে।

“কী রকম বিষয়ে আলাপ করতো?”

“আসলে এখানে দাঁড়িয়ে তো কিছু বলা সম্ভব না, পরনের পশমী কোটটা ঠিকঠাক করে বলল বার্বি। “আমার একটা কাজও আছে এখন। আজ সন্ধ্যায় নাহয় বাসায় এসে পড়-ন, এই ছয়টার দিকে?”

বার্বির সাথে তার বাসায় গিয়ে কোন বিষয়ে আলাপ করার ইচ্ছে একদমই নেই আমার। ডায়োমেডেস জানতে পারলে তুলকালাম বাধিয়ে দেবেন। কিন্তু হাতে অন্য কোন উপায়ও নেই। বার্বি কতটা জানে সেটা বের করতেই হবে আমাকে। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, “আপনার ঠিকানাটা?”

হ্যাম্পস্টেড হিথের উল্টোদিকের বাসাগুলোর একটায় থাকে বার্বি। সামনেই বিশাল একটা পুকুর। বাসা তো না, ছোটখাটো একটা দুর্গ। দামও নিশ্চয়ই সেরকম।

গ্যাব্রিয়েল আর অ্যালিসিয়া পাশের বাসাটায় ওঠার অনেক আগে থেকেই হ্যাম্পস্টেড হিথে থাকে বার্বি। তার প্রাক্তন স্বামী একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার, সেই সুবাদে লন্ডন এবং নিউ ইয়র্কের আসা যাওয়ার মধ্যে থাকতে হতো তাকে। পরবর্তীতে বার্বিকে ডিভোর্স দিয়ে কম বয়সি এক মেয়েকে বিয়ে করে সে। ফলে লন্ডনের বাড়িটা পুরোপুরিভাবে বার্বির নামে লিখে দিতে হয়। দুই পক্ষেরই লাভ হয়েছে, হাসিমুখে বলল বার্বি। “বিশেষ করে আমার।”

গোটা এলাকায় একমাত্র বার্বির বাড়িটাই ফ্যাকাসে নীল রঙের, অন্যগুলোয় সাদার আধিপত্য বেশি। বাড়ির সামনের বাগানটা বেশ সাজানো গোছানো।

দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগত জানালো বার্বি। “হ্যালো, সময় মতনই এসে পড়েছেন দেখছি। এটা খুবই ভালো অভ্যাস। ভেতরে আসুন।”

পথ দেখিয়ে আমাকে লিভিংরুমে নিয়ে আসলো সে, অনর্গল কথা বলেই চলেছে। আমি কেবল সময়মতো হা-হুঁ করছি। বাসার ভেতরটা গ্রিনহাউজের মত গরম। চারদিকে নানা জাতের, নানা বর্ণের অসংখ্য ফুলগাছ। গোলাপ, লিলি, রংবেরঙের অর্কিড। পেইন্টিং, আয়না আর বেশ কয়েকটা বাঁধানো ছবির ফ্রেম টাঙিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। সেই সাথে ছোটখাট মূর্তি, দামি ফুলদানি, শোপিসও আছে। প্রত্যেকটা জিনিসই দামি, কিন্তু একসাথে ঠেসে রাখাতে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। এসব থেকে বার্বির মানসিক অবস্থার আবছা একটা ধারণা পাওয়া যায়। ভেতরে ভেতরে কোন কিছু খুব অস্থিরতা অনুভব করে সে। তার শৈশব কেমন কাটতে পারে সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলাম। এভাবে জিনিস জড়ো করা,

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেনাকাটা করা-ব্যক্তির লোভের দিকেই ইঙ্গিত করে।

বড় একটা সোফা থেকে কুশন সরিয়ে জায়গা করে বসতে হলো আমাকে। একটু বেশিই বড় সোফাটা। ড্রিংকস ক্যাবিনেট খুলে দুটো গ্লাস বের করলো বার্বি।

“কি নিবেন বলুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ভুইস্কি পছন্দ। আমার আগের স্বামী তো দিনে এক গ্যালন ভুইস্কি সাবাড় করে ফেলতো। বলতো যে আমাকে সহ্য করতে হলে নাকি ওই পরিমাণই খেতে হবে।” হাসি ফুটলো তার মুখে। “আমার অবশ্য ওয়াইন না হলে চলে না।”

বার্বি শ্বাস নেয়ার জন্যে থামলে অবশেষে কথা বলার সুযোগ পেলাম আমি। “আমার ভুইস্কি ভালো লাগে না। আসলে সচরাচর ড্রিঙ্কও করি না অতটা...বিয়ার হলেই চলবে।”

“ওহ,” একটু বিচলিত মনে হলো বার্বিকে। “আমার কাছে তো বিয়ার নেই।”

“থাক। ড্রিঙ্ক লাগবে না আমার।”

“কিন্তু আমার লাগবে। আজকে খুব ধকল গেছে।”

একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা রেড ওয়াইন ঢেলে নিয়ে আমার উল্টোদিকের আরামকেদারায় পা তুলে বসলো বার্বি, যেন লম্বা গল্লের প্রস্তুতি নিচ্ছে। “এবারে আমি একান্তই আপনার।” আবারো ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিটা ফুটল তার মুখে। “বলুন, কী জানতে চান?”

“আপনি কিছু মনে না করলে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম।”

“নিশ্চয়ই।”

“অ্যালিসিয়া কি কখনো কোন ডাক্তারের সাথে দেখা করার ব্যাপারে কিছু বলেছিল আপনাকে?”

“ডাক্তার?” প্রশ্নটা শুনে কিছুটা অবাকই হলো বার্বি। “মানে সাইকিয়াট্রিস্টের কথা বলছেন?”

“সাইকিয়াট্রিস্ট বা কোন সাধারণ ডাক্তার।”

“আসলে, ঠিক মনে-” দ্বিধা ফুটলো তার চেহারায়ে। “দাঁড়ান, আপনি বলাতে মনে পড়লো, আসলেও একজন ডাক্তার দেখিয়েছিল ও...”

“তার নামটা মনে আছে আপনার?”

“না। কিন্তু এটা মনে আছে যে ওকে আমার নিজের ডাক্তারের কথা বলেছিলাম।

ডঃ মক্‌স। চমৎকার একজন ডাক্তার ভূদ্রলোক, আপনার দিকে তাকিয়েই গড়গড় করে সমস্যার কথা বলে দিবে। কি খেতে হবে সেটাও ঠিক করে দেন। এরপর লম্বা একটা সময় ধরে সে বর্ণনা করলো যে প্রতিদিন কি কি খাবার খায় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। বারবার এটাও বলল যে আমিও যেন উঃ মক্‌সকে দেখাই। খুব বেশিক্ষণ ধৈর্য্য ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বেশ কায়দা করে তাকে মূল বিষয়ে ফিরিয়ে আনলাম।

“হত্যাকাণ্ডের দিন অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?”

“হ্যাঁ, ঘটনার ঠিক কয়েক ঘন্টা আগেই,” বলে ওয়াইনে লম্বা একটা চুমুক দিল বার্বি। “মাঝেমাঝেই ওর ওখানে গিয়ে আড্ডা দিতাম। দুজনে কফি খেতে খেতে আলাপ করতাম এটাসেটা নিয়ে। তবে আমার সাথে ওয়াইনও থাকতো। আসলে, খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা।”

ভাঙা রেকর্ডের মত কিছুক্ষণ পরপর এই কথাটা বলেই চলেছে সে। ইতোমধ্যে বার্বির স্বভাব-চরিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝে গেছি, চরম মাত্রার আত্মকেন্দ্রিক একজন মানুষ সে; অন্যদের বোঝার কোন চেষ্টা করে না। আমি এক প্রকার নিশ্চিত, তাদের কথোপকথনে অ্যালিসিয়া খুব বেশি কিছু বলতো না।

“ঐদিন বিকেলে অ্যালিসিয়ার মানসিক অবস্থা কেমন দেখেছিলেন?”

কাঁধ ঝাঁকায় বার্বি। “স্বাভাবিক। শুধু বলেছিল যে প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।”

“তাকে কোন কারণে ক্ষিপ্ত মনে হয়নি?”

“কেন, ক্ষিপ্ত মনে হওয়ার কথা ছিল নাকি?”

“আসলে, পরিস্থিতি বিবেচনা করলে...” বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকালো বার্বি। “আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে ও-ই খুনটা করেছে?” বলেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো সে। “আমি তো আপনাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম।”

“দুঃখিত আমি আসলে-”

“অ্যালিসিয়ার পক্ষে কাউকে খুন করাটা সম্ভব না। ও ওরকম মেয়ে-ই না। বিশ্বাস করুন আমার কথা। ও নির্দোষ। আমি শতভাগ নিশ্চিত।”

“এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে? সব প্রমাণ তো-”

“রাখেন আপনার প্রমাণ। এরকমটা বলার উপযুক্ত কারণ আছে আমার কাছে।”

“কী রকম?”

“তবে...আপনাকে ভরসা করা যায় কি না বুঝতে পারছি না।” যেন আমাকে যাচাই করছে এমন ভঙ্গিতে তাকায় সে।

আমি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম।

“আসলে...একটা লোক ছিল ওখানে,” হুট করেই বলে বসে বার্বি।

“একটা লোক?”

“হ্যাঁ, নজর রাখতে অ্যালিসিয়ার ওপর।”

এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেও নিজেকে দ্রুত সামলে নিলাম। “নজর রাখতে বলতে কী বোঝাচ্ছেন?”

“কী বোঝাবো আবার? নজর রাখতো। পুলিশকে বলেছিলাম বিষয়টা, কিন্তু তারা পাত্তাই দেয়নি। গ্যাব্রিয়েলের লাশের পাশে অ্যালিসিয়াকে দেখেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে খুনটা ও-ই করেছে। যত্নসব আহাম্মকের দল। অন্য ব্যাখ্যা যে থাকতে পারে, এটা মাথায়ই আসেনি তাদের।”

“অন্য আবার কি ব্যাখ্যা?”

“আপনাকে বলবো আমি। তখন বুঝতে পারবেন, আজ এখানে কেন আসতে বলেছিলাম।”

এত ভণিতা করার কি আছে, মনে মনে বললাম। মুখে অবশ্য হাসি ফুটিয়ে রেখেছি।

গ্লাসে আবারো ওয়াইন ঢেলে নিল বার্বি। “ঘটনার শুরু হত্যাকাণ্ডের দুই। সপ্তাহ আগে থেকে। অ্যালিসিয়ার ওখানে গিয়েছিলাম আড্ডা দিতে। অন্যান্য দিনের চাইতে সেদিন একটু বেশিই চুপচাপ মনে হয় ওকে। তাই জিজ্ঞেস করি যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না। তখন কাঁদতে শুরু করে, একদম হাউমাউ করে কান্না। আগে কখনো ওকে কাঁদতে দেখিনি। সবসময়ই আবেগগুলো সামলে চলতো অ্যালিসিয়া...কিন্তু সেদিন আর পারেনি বেচারা। মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল।”

“কিছু বলেছিল?”

“আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এলাকায় অপরিচিত কোন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কি না। ও নাকি খেয়াল করেছে কেউ একজন বাইরে থেকে নজর রাখে ওর ওপরে।” ইতস্ততা খেয়াল করলাম বার্বির হাবভাবে। “আচ্ছা, আপনাকে

দেখাই। আমাকে ছবিসহ একটা মেসেজও পাঠিয়েছিল।”

সদ্য ম্যানিকিউর করা হাত দিয়ে মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে ছবিটা খুঁজতে থাকে বার্বি। কিছুক্ষণ সময় লাগে খুঁজে পেতে। ফোনটা আমার সামনে মেলে ধরে এরপর।

কিছু না বলে তাকিয়ে থাকি। কি দেখছি এটা বুঝতে খানিকটা সময় লেগে যায়। একটা গাছের ছবি, অস্পষ্ট।

“এটা কি?”

“দেখে কি মনে হচ্ছে?”

“একটা গাছ?”

“গাছের পেছনে।”

গাছের পেছনে ধূসর রঙের কিছু একটা আছে। কিন্তু সেটা ল্যাম্পপোস্টও হতে পারে আবার একটা কুকুরও হতে পারে।

“একটা লোক। একটু খেয়াল করে দেখলেই বুঝবেন।”

আমার কাছে মনে হলো না গাছের পেছনে কেউ আছে, কিন্তু তর্ক করাটা অমূলক। এই মুহূর্তে বার্বির মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানো যাবে না। “আর?”

“আর কিছু না, এটুকুই।”

“কিন্তু পরে কি হয়েছিল?”

কাঁধ ঝাঁকায় বার্বি। “কিছু না। আমি অ্যালিসিয়াকে বলি পুলিশকে জানাতে, কিন্তু তখন জানতে পারি যে ও ব্যাপারটা ওর স্বামীকেও বলেনি।”

“গ্যাব্রিয়েলকে বলেনি? কেন?”

“জানি না। আমার ধারণা গ্যাব্রিয়েল হয়তো ব্যাপারটা গুরুত্ব দিত না, এজন্যে বলেনি। যাইহোক, আমি ওকে বারবার বলছিলাম পুলিশকে জানাতে। কারণ এর সাথে তো আমার নিরাপত্তাও জড়িয়ে আছে, তাই না? বাইরে অচেনা একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে? রাতের বেলা ঘুমোতে গিয়েও শান্তি পাবো না।”

“অ্যালিসিয়া আপনার পরামর্শ শুনেছিল?”

মাথা ঝাঁকায় বার্বি। “না, শোনেনি। কয়েকদিন পর বলে, গ্যাব্রিয়েলের সাথে আলাপ করেছে বিষয়টা নিয়ে। গোটাটাই নাকি তার কল্পনা ছিল, আমাকেও ভুলে

যেতে বলে। আর এটাও বলে দেয় যে গ্যাব্রিয়েলের সামনে যেন কখনো প্রসঙ্গটা না তুলি। ছবি ডিলিট করে দিতে বলেছিল, কিন্তু আমি করিনি। পুলিশকে দেখিয়েছি, কিন্তু আত্মহী মনে হয়নি তাদের। তারা আসলে অ্যালিসিয়াকেই দোষারোপ করে আসছে শুরু থেকে। আমার ধারণা তাদের বড়সড় ভুল হচ্ছে কোথাও। নিঃসন্দেহে অন্য কেউ জড়িত এসবের সাথে। আরেকটা ব্যাপার, নাটুকে ভঙ্গিতে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল বার্বি। “অ্যালিসিয়া আসলে ভয় পাচ্ছিল।”

এক চুমুকে গ্লাসের বাকি ওয়াইনটুকু সাবাড় করে দিল বার্বি। আবারো হাত বাড়ালো বোতলের দিকে। “আপনি কিছুই নেবেন না তাহলে?”

মানা করে দিলাম আবারো। ধন্যবাদ জানিয়ে কাজের অজুহাতে বেরিয়ে গেলাম ওখান থেকে। আর সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই, যা জানার ছিল ততক্ষণে জেনে গিয়েছি। সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে দেখি অন্ধকার হয়ে গেছে। পাশের বাড়িটার সামনে দাঁড়াই ক্ষণিকের জন্যে-অ্যালিসিয়ার পুরনো ঠিকানা। বিচারের পরপরই বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল বাড়িটা, এক জাপানিজ দম্পতি কিনে নিয়েছে। বার্বির মতে তাদের মধ্যে নাকি সামাজিকতা বলে কিছু নেই। আসলে কয়েকবার মেলামেশার চেষ্টা করেও সফল হয়নি সে। বার্বির মত প্রতিবেশী থাকলে আমি কি করতাম? অ্যালিসিয়াই বা মনে মনে কি ভাবতো তাকে নিয়ে?

একটা সিগারেট ধরিয়ে সদ্য শোনা কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম। অ্যালিসিয়া তাহলে বার্বিকে জানিয়েছিল যে কেউ তার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। পুলিশের লোকেরা ভেবেছে এসব বার্বির মনগড়া কথা, সেজন্যেই পাত্তা দেয়নি। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, বার্বির কথা বিশ্বাস করা আসলেও কঠিন।

তার মানে অ্যালিসিয়া এতটা ভয় পেয়েছিল যে বার্বিকে কথাটা বলতে একপ্রকার বাধ্য হয়, পরবর্তীতে গ্যাব্রিয়েলকেও জানায়। এরপর কি হয়? আর কাউকে কি অ্যালিসিয়া এ ব্যাপারে কিছু বলে? এটা জানতেই হবে আমাকে।

হঠাৎ ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল আমার। সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকা, সব কথা নিজের মধ্যে চেপে রাখা। এমন কেউ ছিল না যাকে আমি ভরসা করে কিছু বলতে পারতাম। বাবার ভয়টা তাই সার্বক্ষণিক একটা ফাসের মত চেপে থাকতো গলার কাছটায়। অ্যালিসিয়ার অবস্থাও নিশ্চয়ই সেরকমই হয়েছিল, নতুবা বার্বিকে

কিছু বলতো না সে।

কেঁপে উঠলাম, মনে হচ্ছে কেউ যেন নজর রাখছে আমার ওপরে।

ঘুরে দাঁড়ালাম, কিন্তু কাউকেই চোখে পড়লো না। আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। ছায়ায় টাকা রাস্তাটা একদম খালি, জনমানবশূন্য। চারপাশে নিচ্ছিন্ন নীরবতা।

পরদিন সকাল সকাল পৌঁছে যাই থোভে। ঠিক করেছি বার্বির বলা কথাগুলো নিয়ে আলাপ করবো অ্যালিসিয়ার সাথে (মানে আমিই যা বলার বলবো, সে শুনবে)। কিন্তু রিসিপশনে ঢোকা মাত্র একটা বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। গলা ছেড়ে আতর্নাদ করছে কেউ। পুরো করিডোরে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই আতর্নাদ।

“কি হয়েছে?”

আমার প্রশ্ন আমলে না নিয়ে দ্রুত ওয়ার্ডের দিকে ছুটে গেল নিরাপত্তা কর্মী। আমিও গেলাম তার পিছু পিছু। যতই সামনে এগোছি, চিৎকারের মাত্রা বাড়ছে। আশা করি অ্যালিসিয়া ঠিক আছে, এসবের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কেন যেন মনে কু ডাকছে।

ডান দিকের করিডোরে পা রাখলাম। নার্স স্টেশনের বাইরে ভিড় জমিয়েছে সবাই। ডায়োমেডেস ফোনে প্যারামেডিকদের সাথে কথা বলছেন। তার শার্ট ভিজে গেছে রক্তে, তবে রক্তগুলো তার নয়। দুজন নার্স হাঁটু গেড়ে বসে আছে মেঝেতে চিৎকাররত মহিলার পাশে। কিন্তু অ্যালিসিয়া নয় সেটা।

এলিফ।

প্রচণ্ড যন্ত্রনায় ডাঙায় ভোলা মাছের মত তড়পাচ্ছে এলিফ, চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছে তার। কিছু একটা গঁথে আছে ডান চোখে। প্রথম দেখায় কাঠি মনে হলেও ভালো করে তাকাতে বুঝে গেলাম জিনিসটা কি। একটা তুলি।

অ্যালিসিয়া দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের পাশে। ইউরি এবং আরেকজন নার্স শক্ত করে ধরে রেখেছে তাকে। তবে ধরে না রাখলেও কোন অসুবিধে ছিল না। একদম শান্ত সে। তার ভাবলেশহীন চেহারা অ্যালসেস্টিস ছবিটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে তার দৃষ্টি আমার দিকে।

অস্বীকার করবো না, প্রথমবারের মত কিছুটা ভয় পেলাম।

“এলিফ কেমন আছে?” ইউরিকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে ফিরতে দেখে

জিঙেস করলাম। নার্স স্টেশনে বসে আছি এখন।

“কিছুটা ভালো,” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সে। “পরিস্থিতি খারাপের দিকে গড়াবে না আশা করি।”

“ওর সাথে দেখা করতে চাই আমি।”

“এলিফ, নাকি অ্যালিসিয়া?”

“আগে এলিফের সাথে।”

মাথা নাড়লো ইউরি। আজকের রাতটা ওকে বিশ্রাম নিতে হবে। কালকে সকালে তোমাকে নিয়ে যাবো ওর কাছে।”

“কি হয়েছিল? তুমি ছিলে ঘটনার সময়? নিশ্চয়ই অ্যালিসিয়াকে উদ্ধে দিয়েছিল?”

আবার লম্বা শ্বাস ছেড়ে কাঁধ বাঁকালো ইউরি। “আমি আসলে জানি না। অ্যালিসিয়ার স্টুডিওর বাইরে ঘুরঘুর করছিল এলিফ। কিছু একটা তো বলেছেই। কি নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়, কে জানে।”

“তোমার কাছে চাবি আছে না? চলো ঘরটা দেখে আসি। কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।”

নার্স স্টেশন থেকে বেরিয়ে অ্যালিসিয়ার স্টুডিওতে চলে আসলাম আমরা। ইউরি দরজা খুলে ভেতরে আলো জ্বালো।

কাংখিত জবাবটা পেতে খুব একটা সময় লাগে না আমাদের। ইজেলের দিকে তাকাতেই বুঝে যাই কি ঘটেছিল।

অ্যালিসিয়ার নতুন পেইন্টিংটা নষ্ট করে দিয়েছে কেউ। লাল রঙ দিয়ে মোটা হরফে ‘মাগি লেখা সেখানে।

মাথা নাড়লাম। “তাহলে এই ব্যাপার।”

“তোমার কি মনে হয়, এলিফ করেছে কাজটা?”

“আর কে করবে?”

এলিফের সাথে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা করলাম। স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। এক চোখের ওপরে পুরু ব্যান্ডেজ। দেখে বোঝাই যাচ্ছে, প্রচণ্ড উত্তেজিত, সাথে ব্যথা তো আছেই।

“ভাগ এখন থেকে,” আমাকে দেখেই খঁকিয়ে উঠলো সে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার পাশে বসলাম। “আমি দুঃখিত, এলিফ। আসলেই দুঃখিত। খুব খারাপ হয়েছে তোমার সাথে, কণ্ঠে সহানুভূতি ঢেলে শান্তস্বরে বললাম।

“আর ভং ধরতে হবে না, যাও এখান থেকে,” আগের চেয়ে কিছুটা নরম হয়েছে তার কণ্ঠ।

“কী ঘটেছিল, আমাকে খুলে বলল।”

“শূয়োরের বাচ্চা আমার চোখ তুলে নিতে চেয়েছিল। দেখছে না তুমি!” মুখ খারাপ করা থামালো না এলিফ।

“হঠাৎ এরকম কেন করলো অ্যালিসিয়া? ঝগড়া হয়েছিল তোমাদের?”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছে সব দোষ আমার? কিছুই করিনি আমি!”

“না, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। শুধু বুঝতে চাইছি, এরকম একটা কাজ কেন করলো সে।”

“কারণ ওর মাথার কয়েকটা ফুঁ টিলা।”

“ছবিটার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই? আমি দেখেছি ক্যানভাসে কি লিখেছো তুমি।”

অক্ষত চোখটা বন্ধ করে ফেললো এলিফ।

“কাজটা কিন্তু মোটেও ভালো করোনি, এলিফ। তবে অ্যালিসিয়া যা করেছে সেটাও একদমই উচিৎ হয়নি, তবুও-”

“আসলে ঐ কারণে আমাকে আক্রমণ করেনি ও,” চোখ খুলে বলল এলিফ, দৃষ্টিতে ঘৃণা।

“তাই?” দ্বিধাশ্রিত স্বরে বললাম। “তাহলে কেন বলেছে?”

একটা বিকৃত হাসি ফুটলো এলিফের ঠোঁটে। কিছু বলল না সে। চুপচাপ ওভাবেই কিছুক্ষণ বসে থাকলাম আমরা। হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়বো, এমন সময় কথা বলতে শুরু করলো সে।

“ওকে শুধু সত্যটা বলেছিলাম।”

“কোন সত্যের কথা বলছো?”

“এটাই যে তুমি ওর প্রেমে পড়েছে।”

অবাক না হয়ে পারলাম না।

“তুমি ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবারো কথা বলে উঠলো এলিফ। “এটাই বলেছিলাম। ও তোমাকে ভালোবাসে। থিও আর অ্যালিসিয়া চিপায় গিয়ে...” মুখ দিয়ে বিকৃত শব্দ করলো সে কিছুক্ষণ, এরপরেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। কি ঘটেছিল তা বুঝতে এখন আর সমস্যা হচ্ছে না। রাগ সামলাতে না পেরে হাতের তুলিটা এলিফের চোখে গঁথে দেয় অ্যালিসিয়া।

“ওর মাথায় সমস্যা আছে,” হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে এলিফের। “শালী একটা সাইকো।”

এলিফের ব্যান্ডেজ করা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। তার কথায় কিছুটা হলেও সত্যতা আছে।

মিটিংটা ডায়োমেডেসের অফিসে হলেও শুরু থেকেই স্টেফানি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এবারের মিটিংয়ের আলোচনার মূল বিষয় যেহেতু ‘সার্বিক নিরাপত্তা, সুতরাং তার আদেশই শিরোধার্য। এটা খুব ভালো করেই জানে সে। ডায়োমেডেসের গম্ভীর চেহারা দেখা মনে হচ্ছে তিনিও বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা।

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে স্টেফানি; চোখমুখে স্পষ্ট উত্তেজনা। তার কথা মানতে যে আমরা সবাই বাধ্য, এটা ভেবে মজা পাচ্ছে নিশ্চয়ই। কিছুদিন আগেই এখানকার সকলে জোট বেঁধে তার মতের বিরোধীতা করেছিল, এখন সেটারই প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েছে সে।

“গতকাল সকালে যা ঘটেছে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়,” বলল স্টেফানি। “আমি মানা করেছিলাম তার হাতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম তুলে দিতে, কিন্তু আমার কথা শোনেননি আপনারা। তাকে আলাদা সুবিধা দেয়ার কারণে অন্যেরা তো অসন্তুষ্ট হবেই। জানতাম এ রকম কিছু ঘটবে। এখন থেকে নিরাপত্তার বিষয়েই সবচেয়ে বেশি জোর দেব আমরা।”

“অ্যালিসিয়াকে আলাদা করে রাখা হয়েছে কেন?” জিজ্ঞেস করলাম। “নিরাপত্তার খাতিরে?”

“নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তার জন্যে ভ্রমকি সে। এলিফকে যেভাবে আঘাত করেছে-খুব সহজে মেরেও ফেলতে পারতো।”

“ওকে উসকে দেয়া হয়েছিল।”

ক্লান্তভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ডায়োমেডেস। “উসকে দিলেও এরকম কিছু করা

একদমই ঠিক হয়নি তার। কোনভাবেই এর সপক্ষে যুক্তি দেখানো চলবে না।”

“সেটাই বলতে চাচ্ছি আমি,” স্টেফানি মাথা নাড়ে।

“এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা,” বললাম। “অ্যালিসিয়াকে এভাবে একঘরে করে রাখাটা কিন্তু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমরা মধ্যযুগে বাস করছি নাকি?” ব্রডমুরে আইসোলেশন রুমে অনেক রোগিকে থাকতে দেখেছি আমি। রুমগুলোয় কোন জানালা থাকে না, কোনমতে একটা বিছানা ঢোকানো হয় কেবল। কয়েক দিন কি, কয়েক ঘন্টা ওখানে থাকলেই সুস্থ কারো মাথা বিগড়ে যাবে। সেখানে অ্যালিসিয়া আগে থেকেই মানসিক সমস্যায় ভুগছে।

কাঁধ ঝাঁকালো স্টেফানি। “এই ক্লিনিকের ম্যানেজার হিসেবে নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার আছে। তাছাড়া ক্রিস্টিয়ানের সাথে কথা বলেছিলাম বিষয়টা নিয়ে, সে-ও সম্মতি জানিয়েছে।”

“তা তো দেবেই।”

মুখে ত্রুর একটা হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকালো ক্রিস্টিয়ান। ডায়োমেডেসের দৃষ্টিও যে আমার দিকে, তা টের পাচ্ছি। জানি তাদের মাথায় কি ঘুরছে-আমি ব্যাপারটার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জড়িয়ে গেছি; সেজন্যেই এরকম আচরণ করছি এখন। যা ইচ্ছে ভাবুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

“তাকে এভাবে বন্দি করে রাখলে তো কোন সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের উচিত তার সাথে কথা বলা, তাকে বোঝার চেষ্টা করা।”

“সবকিছু ঠিকঠাকই বুঝেছি আমি,” ক্রিস্টিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে কোন অবুঝ শিশুর সাথে কথা বলছে। “সমস্যাটা তোমাকে নিয়ে, থিও।”

“আমাকে নিয়ে?”

“নতুবা কি? তুমি আসার পর থেকেই তো গোলমালের শুরু।”

“কী রকম গোলমাল?”

“সত্যটা শুনতে খারাপ লাগছে? তুমিই ওর ওষুধের ডোজ কমানোর ব্যাপারে ঘোট পাকিয়েছে-”

হেসে ফেললাম। “ঘোট পাকিয়েছি? ওকে যে পরিমাণ ওষুধ দেয়া হতো তাতে একটা ঘোড়াও কারু হয়ে পড়বে।”

“ফালতু কথা।”

ডায়োমেডেসের দিকে ফিরলাম। “আপনিও কি একই কথা ভাবছেন?”

মাথা বাঁকালো ডায়োমেডেস। “প্রশ্নই আসেনা,” বলে চোখ নামিয়ে নিলেন। “তবে এটা ঠিক যে ওষুধের ডোজের তারতম্যের কারণে সমস্যা হয়েছে।”

“আমি এটা মানতে নারাজ।”

“তুমি বোধহয় গোটা ব্যাপারটার সাথে একটু বেশিই জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে,” দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডায়োমেডেস। “আর এ মুহূর্তে কোন ভুলের সুযোগ নেই আমাদের-এটা খুব ভালো করেই জানো। ক্লিনিকের ভবিষ্যৎ একটা সুতোয় দুলছে এখন। আমাদের প্রতিটা ভুল ট্রাস্টকে ইন্ধন যোগাবে ক্লিনিকটা বন্ধ করে দিতে।”

প্রফেসরকে এভাবে হাল ছেড়ে দিতে দেখে বিরক্ত লাগছে। তাই বলে তো অ্যালিসিয়াকে কড়া ডোজের ওষুধ দিয়ে একঘরে করে রাখতে পারি না আমরা! তাহলে জেলখানার সাথে পার্থক্যটা কি থাকলো?”

“তোমার কথার সাথে একমত আমি, থিও,” ইন্দিরা বলে উঠলো এ সময়। “সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের ঝুঁকি নেয়ার কোন ইচ্ছেই নেই। তাই একজন রোগিকে ইচ্ছেমতন ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই যৌক্তিকভাবে অনেকে। কিন্তু সাইকোলজিস্ট বা সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে আমাদের আরো সাহসী হতে হবে। রোগীদের সাময়িক উন্মাদনাটুকু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই সবচেয়ে ভালো সমাধান, এভাবে আটকে রাখাটা পাশবিক।”

চোখ বাঁকালো ক্রিস্টিয়ান। কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে এ সময় হাত উঁচিয়ে তাকে থামালেন ডায়োমেডেস। “সেজন্যে বড় দেরি হয়ে গেছে। আসলে দোষটা আমারই। সাইকোথেরাপি অ্যালিসিয়ার জন্যে নয়। শুরুতেই মানা করে দেয়া উচিত ছিল।”

ডায়োমেডেস মুখে বলছেন, পুরো দোষ তার, কিন্তু মনে মনে আসলে আমাকেই দোষি ভাবছে সবাই। সবার চোখ এখন আমার দিকে। ডায়োমেডেসের দৃষ্টিতে হতাশা, ক্রিস্টিয়ানের দৃষ্টিতে বিদ্রূপ আর ইন্দিরার দৃষ্টিতে খেলা করছে দুশ্চিন্তা।

“অ্যালিসিয়ার ছবি আঁকা থামিয়ে দিতে পারেন আপনারা। কিন্তু তার থেরাপি বন্ধ করবেন না-তাহলে আর তার স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন আশাই থাকবে না,” চেষ্টা করলাম যাতে কণ্ঠে মিনতির ভাব না ফোটে।

“আমার তো এখন মনে হচ্ছে অ্যালিসিয়া আর কখনোই স্বাভাবিক হবে না,”
প্রফেসর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

“আমাকে আর কয়েকটা দিন সময়-”

“না,” ডায়োমেডেসের কণ্ঠের দৃঢ়তা শুনেই বুঝতে পারলাম, এ বিষয়ে
আলোচনা করা বৃথা।

আমার সুযোগ শেষ।

প্রফেসর ডায়োমেডেসের কিন্তু সেদিন ভুল আন্দাজ করেছিলেন। তুষারপাত
হয়নি। বরং প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় বিকেলের দিকে। মুহূর্মুহ বজ্রপাতে একটু
পরপর কেঁপে উঠছিল চারপাশ।

অ্যালিসিয়ার জন্যে থেরাপি রুমে অপেক্ষা করছি। আজকেও বৃষ্টি ঝরছে
বাইরে। ভেতরে ভেতরে খুবই ক্লান্ত আর বিষণ্ণ আমি। অ্যালিসিয়াকে সাহায্য করার
আগেই সুযোগটা হারালাম; এখন আর কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

দরজায় কেউ কড়া নাড়লো এসময়, তাকিয়ে দেখি অ্যালিসিয়াকে নিয়ে এসেছে
ইউরি। যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতেও খারাপ অবস্থা তার। চেহারা একদম
ফ্যাকাসে, যেন জীবন্ত লাশের দিকে তাকিয়ে আছি। ঠিকঠাক হাঁটতেও পারছে না,
ডান পাটা অনবরত কাঁপছে। খ্রিস্টিয়ানকে মনেমনে গালি দিলাম আবারো, ওর
প্রেসক্রাইব করা ওষুধ খেয়েই অ্যালিসিয়ার এই অবস্থা।

ইউরি চলে যাবার পর লম্বা একটা সময় চুপচাপ ঘরটায় বসে থাকি দু’জনে।
অ্যালিসিয়া চোখ নামিয়ে রেখেছে। এক পর্যায়ে মুখ খুলতেই হলো আমাকে।
এমনভাবে কথাগুলো বললাম যেন স্পষ্ট শুনতে পায় সে।

“অ্যালিসিয়া, আপনাকে যে আইসোলেশন রুমে আটকে রাখা হয়েছে, সেজন্যে
আমি দুঃখিত। আসলেও দুঃখিত।”

কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

“এলিফের সাথে যা করেছেন,” দ্বিধাশ্রিত স্বরে বললাম, “সেটার জন্যে আমাদের
বোধহয় আর থেরাপি চালিয়ে যাবার সুযোগটা নেই। তবে সিদ্ধান্তটা আমার ছিল না,
আমি বরং এর প্রতিবাদ করেছি। আপনি চাইলে আমাকে জানাতে পারেন, এলিফ
এবং আপনার মাঝে ঠিক কী হয়েছিল? নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতর অপরাধবোধ হচ্ছে
আপনার? সে ব্যাপারেও আলোচনা করতে পারি আমরা।”

অ্যালিসিয়া কিছু বলল না। এই ঘোরের মধ্যে আমার কথা তার মাথায় আদৌ ঢুকছে কি না, সে ব্যাপারে সন্দিহান আমি।

“আচ্ছা আমার কেমন লাগছে আগে সেটা বলি নাহয়। এই মুহূর্তে আসলে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আমার। কারণ আমরা একসাথে ঠিকমতো কাজ শুরু করার আগেই সুযোগটা হারাতে হচ্ছে। আপনার ওপরেও রাগ হচ্ছে কারণ আপনি আরেকটু চেষ্টা করলেই আজ এই দিন দেখতে হতো না।”

এবার মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া।

“জানি আপনি ভয় পাচ্ছেন। আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। আমি, কিন্তু সুযোগটা দেননি। আর এখন পুরো পরিস্থিতিই বিগড়ে গেছে।”

চুপ হয়ে গেলাম। পরাজিত মনে হচ্ছে নিজেকে।

ঠিক এই সময় অ্যালিসিয়া এমন একটা কাজ করলো যা আমি সারাজীবনেও ভুলতে পারবো না।

কাঁপা কাঁপা হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় সে। কিছু একটা শক্ত করে ধরে রেখেছে সেখানে-একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো নোটবুক।

“এটা কি?”

বরাবরের মতনই কোন উত্তর নেই। হাতটা এখনও সামনে বাড়িয়েই রেখেছে।

“আমাকে দিচ্ছেন এটা?” কৌতূহলী কণ্ঠে বললাম।

এবারেও জবাব না পাওয়ায় অগত্যা তার হাত থেকে সাবধানে নোটবুকটা নিলাম। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টেই বুঝে গেলাম জিনিসটা কি।

অ্যালিসিয়ার ডায়েরি।

ভেতরের লেখাগুলো দেখে মনে হচ্ছে লেখার সময় মন খুব অস্থির ছিল তার। তীর চিহ্নের মাধ্যমে একটা প্যারার সাথে আরেক প্যারা জুড়ে দিয়েছে। শেষদিকের লেখাগুলো তো প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। লেখার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম ছবি আঁকা। ফুল, লতাপাতা, পাখি। আবার কয়েকটা পাতায় লাইনের পর লাইন লিখে কেটে দেয়া হয়েছে হিজিবিজি করে।

“আমি এটা দিয়ে কি করবো?” অ্যালিসিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

প্রশ্নটা অবশ্য না করলেও হতো। সে কেন আমাকে এটা দিয়েছে তা একদম পরিস্কার।

অ্যালিসিয়া চাইছে আমি যেন তার ডায়েরিটা পড়ি।

তৃতীয় পর্ব

স্বাভাবিকতার সাথে অস্বাভাবিকতার মিশ্রনের স্বভাব মানুষের সহজাত; আর সেজন্যেই ডায়েরি লেখার অভ্যাসটা বিপদজনক মনে হয় আমার কাছে। একজনের পক্ষে সবকিছুই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করাটা খুব সহজ সেখানে।

-জাঁ পল সাত্রে

সচরাচর আমার মধ্যে সত্যের দেখা পাবেন না, কিন্তু মাঝেমাঝে নিজের অজান্তেই সত্যটা বলে ফেলি।

-উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, দ্য উইন্টার'স টেইল

অ্যালিসিয়ার বেরেনসনের ডায়েরি

৮ অগাস্ট

খুব অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে আজকে।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কফি বানাচ্ছিলাম। পানি গরম হবার ফাঁকে জানালা দিয়ে বাইরে দেখছি, এসময় একটা জিনিসের ওপর নজর আটকে যায়। না, জিনিস না, মানুষ। একটা লোক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের বাসার উল্টোদিকের রাস্তায়, পার্কের প্রবেশমুখে। গাছের আড়ালে থাকায় তার চেহারা ঠিকমতো দেখতে পারিনি, কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া। মাথায় ক্যাপ আর চোখে সানগ্লাসও ছিল।

লোকটা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল কি না সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু অদ্ভুত লাগে ব্যাপারটা, সাধারণত ওখানটায় দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করে সবাই, কিন্তু লোকটা বাসের জন্যে দাঁড়ায়নি। আমাদের বাসার ওপরে লক্ষ্য রাখছিল সে।

কিছুক্ষণ পর টের পাই, এক জায়গাতেই বেশ অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তাই জানালার পাশ থেকে সরে কফি নিয়ে স্টুডিওতে চলে যাই। কিন্তু সেখানে কাজে মন বসে না। বারবার লোকটার কথা ভাবছিলাম। তাই ঠিক করি বিশ মিনিট পর রান্নাঘরে গিয়ে দেখবো সে তখনও দাঁড়িয়ে আছে কি না। যদি থাকতো তাহলে কি করতাম? ভুল তো কিছু করছিল না। এই এলাকায় চোরের উৎপাত নেই সত্যি,

কিন্তু সবকিছুরই তো একটা প্রথমবার আছে। যদি চুরির জন্যে রেকি করতে আসে, তখন? আবার এমনটাও হতে পারে, এই রাস্তার শেষ মাথায় নতুন বাড়িটা কিনবে, সেজন্যে দেখতে এসেছিল।

কিন্তু রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে তাকে আর দেখিনি। কেউ ছিল না রাস্তার অন্য পাশে।

আর জানা হবে না কি উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অদ্ভুত।

১০ অগাস্ট

গতকাল জিন-ফিলিক্সের সাথে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। গ্যাব্রিয়েল অবশ্য মানা করেছিল, কিন্তু আমি শুনিনি। সত্যি বলতে আমার নিজেরও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু পরে ভাবি, জিন-ফিলিক্সের কথা অনুযায়ী ‘শেষবার যদি একসাথে ঘুরতে বের হই, তাহলে খুব একটা ক্ষতি হবে না। এরপরে নিশ্চয়ই আর কিছু বলার থাকবে না তার?’

নাটক শুরু হবার বেশ আগেই দেখা করি আমরা, একসাথে কোথাও ড্রিঙ্ক করা যাবে তাহলে-জিন-ফিলিক্সের বুদ্ধি। সূর্য ততক্ষণে ডুবতে বসেছে, মনে হচ্ছিল কেউ লাল আবীর মিশিয়ে দিয়েছে নদীর পানিতে। ন্যাশনাল থিয়েটারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। আমিই আগে দেখি তাকে, মানুষের ভিড়ে মুখ বাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দৃশ্যটা দেখে ওর সাথে সম্পর্ক শেষ করে দেয়ার ব্যাপারে তখনও যেটুকু সন্দেহ ছিল আমার ভেতরে, তা-ও দূর হয়ে যায়। এখন বুঝতে পারি, জিন-ফিলিক্সকে কেমন যেন ভয় পাই আমি, পুরোপুরি বলে বোঝানো যাবে না ব্যাপারটা। ঘুরে পালানোর কথা চিন্তাভাবনা করছি, এসময় আমাকে দেখে ফেলে জিন ফিলিক্স। অগত্যা তার দিকে হাঁটতে শুরু করি। মুখে জোর করে একটা হাসি ফোঁটাই, সে-ও তাই করে।

“তুমি আসাতে আমি সত্যিই অনেক খুশি হয়েছে,” বলে জিন-ফিলিক্স। “ভাবছিলাম শেষ মুহূর্তে হয়তো মত পাল্টে ফেলতে পারো। চলো কোথাও বসে ড্রিঙ্ক করা যাক, নাকি?”

ন্যাশনাল থিয়েটারের পাশেই আন্ডারস্টাডি পাবে চলে যাই আমরা। ওখানে কাটানো সময়টুকু অস্বস্তিকর ছিল বললেও কম হয়ে যাবে। হাবিজাবি নিয়ে আলাপ করি দু’জনে, আসলে জিন-ফিলিক্স বলছিল আর আমি শুনছিলাম। খালি পেটে পাবে

যাওয়ায় দুই পেগ ড্রিন্কেই মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে আমার; এজন্যেই বোধহয় আমাকে পাবে নিয়ে গিয়েছিল জিন-ফিলিক্স। ভেবেছিল মদ খেয়ে মাতাল হলে তার সাথে আরো প্রাণবন্তভাবে আলাপ করবো। তার প্রতিটা কথা শুরু হচ্ছিল-তোমার কি মনে আছে যখন আমরা বা একসাথে ওখানে গিয়ে আমরা'-এই কথাগুলো দিয়ে। যেন এভাবে অতীতের ঘনিষ্ঠতার কথা বললেই আমি আমার ভুলটা বুঝতে পারবো। কিন্তু ও একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিল না, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি। সেটা আর বদলাবে না।

তবে দিনশেষে মনে হয়েছে বের হওয়ার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ভালোই করেছিলাম। জিন-ফিলিক্সের সাথে দেখা হয়েছে এজন্যে বলছি না কথাটা, আসলে নাটকটা খুবই পছন্দ হয়েছে আমার। অ্যালসেস্টিসের কথা আগে শুনি নি আমি। এই প্রথম কোন ট্রাজেডিতে দেখলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন মোটামুটি বাস্তবভাবে দেখানো হয়েছে (পাতাললোক থেকে অ্যালসেস্টিসের ফিরে আসার ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝরে ফেললে)। সেজন্যেই আরো বেশি ভালো লেগেছে। নাটকটা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটা লোক মৃত্যুদণ্ড পেলে তার স্ত্রী, অ্যালসেস্টিস, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। অ্যালসেস্টিসের নামভূমিকায় যে অভিনেত্রী অভিনয় করেছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন গ্রিক পুরাণ থেকে উঠে আসা কোন দেবী। বারবার মনে হচ্ছিল, তার একটা ছবি আঁকবো আমি। জিন-ফিলিক্সকে কথাটা প্রায় বলেও ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে থামাই নিজেকে। তাকে আর আমার জীবনের কোন ব্যাপারে জড়াবো না। নাটকের শেষ দৃশ্য দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। ঠিক কোন বিষয়টা আমাকে নাড়া দিয়েছে তা নিয়ে আরো ভাবতে হবে। জিন-ফিলিক্স অবশ্য একটার পর একটা মন্তব্য করেই যাচ্ছিল, কিন্তু কোনটাই আমার মতের সাথে মিলছিল না। তাই এক পর্যায়ে তার কথা শোনা বাদ দিয়ে দেই।

অ্যালসেস্টিসের মৃত্যুর জগত থেকে ফিরে আসার দৃশ্যটা মাথা থেকে দূর করতেই পারছিলাম না। ব্রিজ থেকে স্টেশনের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময়েও সেটা নিয়েই ভাবছিলাম। এসময় জিন-ফিলিক্স জিজ্ঞেস করে যে আবারো ড্রিন্ক করতে যাবে কি না, কিন্তু আমি ক্লান্তির অজুহাত দেখাই। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে আমাদের মাঝে। স্টেশনে পৌঁছে গেলে বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাই,

বলি যে সময়টা ভালো কেটেছে।

“একটা ড্রিঙ্কই তো,” জিন-ফিলিক্স বলে। “পুরনো সময়ের খাতিরে?”

“না, বাসায় ফিরতে হবে আমাকে।”

ঘুরে দাঁড়িয়েছি, এসময় আমার হাত ধরে জিন-ফিলিক্স।

“অ্যালিসিয়া,” বলে সে। “তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমি।”

“না, বলো না, প্লিজ। কিছু বলার নেই আর...”

“তুমি যা ভাবছো সেরকম কিছু বলবো না।”

ঠিকই বলেছিল জিন-ফিলিক্স, আমি মনে মনে যা ভেবেছিলাম ওরকম কোন কথা বের হয়নি তার মুখ দিয়ে। ধরেই নিয়েছিলাম যে বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে গ্যালারি ছেড়ে দেয়ার কারণে আমার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করবে। কিন্তু তার কথাগুলো শুনে চমকে যাই।

“তোমাকে আরো সাবধানী হতে হবে,” বলে জিন-ফিলিক্স। “মানুষকে খুব সহজে ভরসা করে ফেলল। যারা তোমার আশেপাশে থাকে...তাদের বিশ্বাস করো। এই স্বভাবটা বদলাও। কাউকে ভরসা করার আগে তাকে ভালোমতো চেনার চেষ্টা করো।”

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। বেশ খানিকটা সময় লাগে গলা দিয়ে শব্দ বের হতে।

“কি বলছো এসব? কার কথা বোঝাচ্ছে?”

কিন্তু আর কিছু বলে না জিন-ফিলিক্স। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে আমার হাত ছেড়ে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করে। পেছন থেকে ডাক দেই আমি।

“দাঁড়াও, জিন-ফিলিক্স।”

কিন্তু একবারের জন্যেও তাকায় না সে। কিছুক্ষণ পর মিশে যায় ভিড়ের মাঝে। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি স্টেশনের বাইরে। মাথায় বারবার ওর বলা কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ রকম হেঁয়ালি করার মানে কি? এটাও হতে পারে যে আমাকে ইচ্ছে করে এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে চলে গেছে সে। খুব ভালো করেই জানে যে আমার মাথায় সন্দেহ ঢুকলে সেটা দূর না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাইনা। এ যাত্রায় তাকে সফলই বলতে হবে।

সেই সাথে প্রচণ্ড রাগও লাগছিল। অবশ্য এই কাজটা করে একদিক ভালোই

করেছে সে। সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে গেছে। জিন-ফিলিক্সের আর কোন স্থান নেই আমার জীবনে। আশপাশের মানুষদের সহজেই ভরসা করে বলতে নিশ্চয়ই গ্যাব্রিয়েলের কথাই বুঝিয়েছে। কিন্তু কেন?

না, এ নিয়ে মাথা ঘামাবো না আমি। এটাই চাইছিল জিন-ফিলিক্স; আমাকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলতে। গ্যাব্রিয়েল আর আমার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করাটাই তার লক্ষ্য।

কিন্তু তার ফাঁদে পা দেব না আমি। এ বিষয়ে আর ভাববো না।

বাসায় ফিরে দেখি গ্যাব্রিয়েল ঘুমিয়ে পড়েছে। সকাল পাঁচটায় উঠে একটা ফটোশ্যুটে যেতে হবে। তবুও ওকে ডেকে তুলে সেক্স করি। আসলে আমি চাইছিলাম ওকে একদম আমার ভেতরে অনুভব করতে, ওর দেহে মিশে যেতে। ও-ই পারবে আমাকে সবকিছু থেকে নিরাপদ রাখতে।

অগাস্ট ১১

আবারো লোকটাকে দেখেছি আমি। এবারে আগের তুলনায় কিছুটা দূরে ছিল সে, পার্কের ভেতর দিককার একটা বেঞ্চে। কিন্তু তাকে চিনতে কোন সমস্যা হয়নি আমার। এরকম আবহাওয়ায় খুব কম লোকই কালো শার্ট প্যান্ট আর ক্যাপ পরে বের হওয়ার কথা ভাববে। আগের দিনের মত চোখে সানগ্লাসও ছিল। আমাদের বাসার ওপর নজর রাখছে।

এসময় একটা ভাবনা খেলে যায় আমার মাথায়। এমনটাও হতে পারে, সে কোন চোর-ছ্যাচড় নয়, বরং আমার মতনই একজন পেইন্টার। হয়তো আমাদের রাস্তাটা আঁকার কথা ভাবছে, সেজন্যেই দেখতে এসেছে। কিন্তু ভাবনাটা যে সত্যি নয় সেটা আমি একরকম নিশ্চিত। যদি আসলেও বাড়িটা আঁকতে চাইতো সে, তাহলে এভাবে বসে থাকতো না। স্কেচবুকে খসড়া স্কেচ আঁকতো।

বিষয়টা নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় গ্যাব্রিয়েলকে ফোন করে বসি। খুব বড় একটা ভুল ছিল সেটা। জানতাম যে ও ব্যস্ত থাকবে, এসময় যদি আমি হুট করে ফোন দিয়ে বলি কেউ আমাদের বাসার ওপরে নজর রাখছে, তাহলে রাগ হবারই কথা।

তাছাড়া লোকটা যে আসলেও আমাদের বাসার ওপরে নজর রাখছে, সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিতও নই।

আবার এমনটাও হতে পারে যে তার লক্ষ্য আসলে আমি।

অগাস্ট ১৩

আবার এসেছিল সে।

গ্যাব্রিয়েল সকালে বের হয়ে যাবার পরেই তাকে বাথরুমের জানালা থেকে দেখি আমি। গোসল করছিলাম তখন। আজকে আগের দিনগুলোর তুলনায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, বাসস্ট্যান্ডের পাশে।

কি ভাবছিল? এভাবে বোকা বানাবে আমাকে?

দ্রুত কাপড় পরে রান্নাঘরে চলে যাই ভালো করে দেখার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে উধাও হয়ে যায় সে।

ঠিক করি গ্যাব্রিয়েল বাসায় ফেরার পর বলবো কথাটা। ভেবেছিলাম আবারো হয়তো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিবে ও, কিন্তু আজকে মনোযোগ দিয়ে শোনে সবকিছু। চেহারায় দুশ্চিন্তা ভর করে।

“জিন-ফিলিক্স না তো?” কোন রাখঢাক ছাড়াই বলে গ্যাব্রিয়েল।

“না! ওর কথা ভাবছো কেন?”

চেপ্টা করছিলাম কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলতে, কিন্তু আমি নিজেও আসলে বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি। জিন-ফিলিক্স আর অচেনা লোকটার শারীরিক গঠন একরকম। হতেও পারে যে গ্যাব্রিয়েল ঠিক সন্দেহই করছে। কিন্তু আমার মন সেটা মানতে চাইছিল না। আমাকে তো এভাবে ভয় দেখানোর কথা নয় তার। তাই না?

“জিন-ফিলিক্সের নম্বর কোথায়?” গ্যাব্রিয়েল বলে। “আমি এখনই ফোন করবো ওকে।”

“না, ডার্লিং, প্লিজ। এরকম কিছু করো না। আমি নিশ্চিত লোকটা জিন-ফিলিক্স না।”

“আসলেই?”

“হ্যাঁ। তাছাড়া ওরকম কিছু তো হয়নি। আমি বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই করছি। থাক, বাদ দাও।”

“কতক্ষণ ছিল লোকটা এখানে?”

“খুব বেশিক্ষণ না। এই ধরো এক ঘন্টা, এর পরেই উধাও হয়ে যায়।”

“উধাও হয়ে যায় মানে?”

“মানে গায়েব হয়ে যায়।”

“ওহ। আচ্ছা জান, রাগ কোরো না। একটা কথা জিজ্ঞেস করি?”

“কি?” ওর প্রশ্নের ধরণটা ভালো লাগলো না আমার।

“পুরো ব্যাপারটা তোমার কল্পনা নয় তো?”

“না,” দৃঢ় কণ্ঠে বলি। “বিশ্বাস করো আমার কথা।”

“বিশ্বাস তো করছিই।”

কিন্তু ওর কথা শুনে বুঝতে পারি যে আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছিল না তখন। বিশ্বাস করার ভান করছিল। সত্যি বলতে, প্রচণ্ড রাগ লাগে তখন। এত রাগ যে...আজকে এখানেই লেখা থামাতে হবে। নতুবা এমন কিছু লিখে ফেলবো যেটা নিয়ে পরে পস্তাতে হতে পারে।

১৪ অগাস্ট

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানালার কাছে চলে যাই। মনে মনে আশা করছিলাম লোকটাকে হয়তো দেখতে পাবো, তাহলে গ্যাব্রিয়েলকেও ডেকে দেখানো যাবে। কিন্তু তার কোন চিহ্নই ছিল না বাইরে। নিজেকে আরো বেশি আহাম্মক মনে হয় তখন।

বিকেলে সিদ্ধান্ত নেই গরমের মধ্যেও হাঁটতে বের হবো। আসলে বাড়ি থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পালাতে চাইছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে পার্লামেন্ট হিলের কাছে চলে যাই, চারপাশে অনেকেই রোদ পোহাচ্ছিল। একটা খালি বেঞ্চ দেখতে পেয়ে বসে পড়ি। লন্ডনের অনেকটা দেখা যায় ওখান থেকে।

কিন্তু গোটা সময় মনে হচ্ছিল যে কেউ আমার ওপরে নজর রাখছে। বারবার পিছু ফিরে তাকালেও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু কেউ একজন ছিল সেখানে, বুঝতে পারছিলাম সেটা।

বাসায় ফেরার পথে পুকুর পাড় দিয়ে হাঁটছি এসময় হঠাৎই মুখ তুলে তাকাই। সাথে সাথে থমকে যাই সেখানেই। পুকুরের অন্যপাশ থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল লোকটা। চেহারা ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না অবশ্য, কিন্তু আমার চিনতে ভুল হয় না।

ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে। পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আপনা থেকেই চৈঁচিয়ে উঠি:

“জিন-ফিলিক্স? আমাকে অনুসরণ করছো কেন? বন্ধ করো এসব!”

কিন্তু লোকটা দাঁড়িয়েই থাকে। যত দ্রুত সম্ভব পকেট থেকে ফোন বের করে তার একটা ছবি তুলি। এতে লাভ কি হয়েছে, জানি না। এরপর উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করি, একবারও পেছনে তাকাইনি। ভয় হচ্ছিল যে পেছনে ফিরলেই দেখতে পাবো কাছাকাছি চলে এসেছে।

তা সত্ত্বেও নিজেকে আটকাতে পারিনি। ঘরে তাকাই। কিন্তু আবারো উধাও হয়ে গিয়েছিল সে।

মনেপ্রাণে চাইছিলাম যাতে জিন-ফিলিক্স না হয় লোকটা।

বাসায় ফেরার পর খুব অস্থির লাগছিল। সব পর্দা টেনে বাতি নিভিয়ে দেই। কি মনে করে জানালা দিয়ে বাইরে একবার উঁকি দিতেই থমকে যাই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, রাস্তার অন্যপাশে। দৃষ্টি আমার দিকে। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এসময় কেউ আমার নাম ধরে ডাক দেয়ায় চমকে উঠি।

“অ্যালিসিয়া? আছো?”

পাশের বাসার বিরক্তিকর মহিলাটা আবার এসেছিল। বার্বি হেলমান। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পেছনের দরজাটা খুলে দেই। ইতোমধ্যে বাগানে ঢুকে পড়েছিল সে, হাতে ওয়াইনের বোতল।

“কেমন আছো ডার্লিং? স্টুডিওতে দেখলাম না তাই ভাবলাম কি করছে।”

“একটু বাইরে গিয়েছিলাম। কেবলই ফিরেছি।”

“ওয়াইন?” বাচ্চাদের মত করে বলল সে, এরকমটা প্রায়ই করে মহিলা। বিরক্ত লাগে আমার।

“আসলে, কাজ করতে হবে আমাকে এখন।”

“আরে কাজ তো আমারো আছে। একটু পরেই ইটালিয়ান ক্লাসে যাবো। এর আগে একটু গল্পগুজব করি দু’জনে।”

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। ঘর অন্ধকার দেখে জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিল বিনা অনুমতিতে। তাকে থামাতে যাবো এসময় বাইরে তাকিয়ে দেখি লোকটা চলে গেছে।

আমি আসলে ঠিক জানি না যে কেন বার্বিকে তার ব্যাপারে বলেছি। মহিলাকে

একদমই পছন্দ কই না আমি, ভরসা করা তো দূরের কথা। আসলে ওই সময়টা বাসায় যে-ই থাকতো, তাকেই বলতাম কথাগুলো। ওয়াইন পেটে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে শুরু করি। বিস্ফোরিত নয়নে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে বার্বি। আমার সব বলা শেষ হলে হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাসটা নামিয়ে রাখে টেবিলে। “আরো কড়া কিছু দরকার।” কেবিনেট থেকে হুইস্কি বের করে দুটো মগে ঢেলে একটা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

“এই নাও, এটা এখন দরকার তোমার।”

আসলেও দরকার ছিল। মাথাটা একটু শান্ত হয় অবশেষে। এবারে আমার শোনার পালা। একটানা কথা বলতে থাকে বার্বি। বারবার বলছিল যে আমাকে ভয় দেখানোর কোন উদ্দেশ্য নেই তার, কিন্তু তার কথাগুলো ভয়ংকরই শোনাচ্ছিল। “এরকমটা টিভিতে হাজারবার দেখেছি আমি। কিছু করার আগে রেকি করে নিচ্ছে হারামিটা।”

“আপনার কি মনে হয়? লোকটা চোর?”

কাঁধ নাচায় বার্বি। “ধর্ষকও হতে পারে। তাতে কিছু আসে যায়? ভালো উদ্দেশ্যে যে আসেনি, এটা নিশ্চিত।”

হেসে ফেলি তখন। আসলে এটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলাম যে কেউ একজন আমার কথা বিশ্বাস করেছে-হোক সেটা বার্বি। তাকে আমার ফোনে ভোলা ছবিটা দেখাই।

“আমাকে মেসেজ করে দাও। বাসায় গিয়ে চশমা পরে ভালো করে দেখবো। এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তোমার জামাইকে বলেছে এ ব্যাপারে?”

“না,” মিথ্যে বলি।

একটু অবাক হয় বার্বি। “কেন?”

“আসলে...আমি ভয় পাচ্ছি যে গ্যাব্রিয়েল হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে। ভাববে পুরোটাই আমার কল্পনা।”

“তোমার কি মনে হয়, আসলেও কল্পনা করছো?”

“না।”

সন্তুষ্টি ফুটলো বার্বির চেহারায়। “গ্যাব্রিয়েল যদি তোমার কথা আমলে না নেয় তাহলে আমি যাবো তোমার সাথে পুলিশের কাছে। এমনভাবে কথা বলবো যে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে ওরা।”

“ধন্যবাদ । কিন্তু সেটার আপাতত কোন প্রয়োজন নেই ।”

“কে বলল প্রয়োজন নেই? এগুলো হেলাফেলার বিষয় নয় । আজকে গ্যাব্রিয়েল ফিরলে অবশ্য কথা বলবে তার সাথে, ডার্লিং । আমাকে কথা দাও ।”

আমি মাথা নাড়ি । কিন্তু ততক্ষণে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে গ্যাব্রিয়েলকে এ বিষয়ে আর একটা কথাও বলবো না । লোকটা যে আসলেও আমাকে অনুসরণ করছে বা আমার ওপরে নজর রাখছে এর শক্ত কোন প্রমাণ নেই । বার্বি ঠিকই বলেছে, ছবিটা একদমই স্পষ্ট না ।

পুরোটাই আমার কল্পনা-গ্যাব্রিয়েলের যখন এটাই ধারণা, তাকে কিছু না বলাই ভালো । উল্টো আরো বিরক্ত হবে তখন । সেটা চাই না আমি ।

মাথা থেকে ঝেঁরে ফেলবো ব্যাপারটা ।

রাত ৪টা ।

আজকের রাতটা ভালো যাচ্ছে না ।

দশটার দিকে বাড়ি ফিরে গ্যাব্রিয়েল । সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত । তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে তাই । আমিও ঘুমোনের চেষ্টা করি, কিন্তু ঘুম আসেনা । চোখে ।

দুই ঘন্টা আগে হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ শুনতে পাই । বাইরের বাগান থেকে আসছিল শব্দটা । দ্রুত জানালার পাশে গিয়ে বাইরে তাকাই-কাউকে দেখি না । কিন্তু মনে হতে থাকে যে কেউ একজন খেয়াল করছে আমাকে । গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে ।

দৌড়ে বেডরুমে ফিরে এসে গ্যাব্রিয়েলকে ডেকে তুলি ।

“লোকটা বাইরে,” বলি আমি, “বাগানের ওখানে শব্দ শুনেছি ।”

গ্যাব্রিয়েল প্রথমে ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারেনা যে কি বলছি আমি । যখন বোঝে তখন বিরক্তি ফোটে চোখেমুখে । “এত রাতে কি শুরু করেছে । আর তিন ঘন্টা পর বের হতে হবে আমাকে । এসব চোর-পুলিশ খেলতে পারবো না ।”

“চোর পুলিশ খেলা না, আমার কথা বিশ্বাস করো, প্লিজ । একবার এসে দেখো ।”

অগত্যা আমার সাথে আসে ও ।

কিন্তু বাইরে কেউই ছিল না তখন, ঠিক যেমনটা ভয় পাচ্ছিলাম ।

গ্যাব্রিয়েলকে বলি একবার বাইরে গিয়ে দেখতে, কিন্তু মানা করে দেয় । হনহন

করে ওপর তলায় উঠে যায় বিরক্তভঙ্গিতে। আমি ওর রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করি কিন্তু লাভ হয় না। গেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

আমি আর বিছানায় যাইনি। তখন থেকে এখানেই বসে আছি। কান পেতে রেখেছি শব্দের অপেক্ষায়, কিছুক্ষণ পরপর জানালা দিয়ে তাকাছি বাইরে। কিন্তু লোকটার কোন হৃদিস নেই এখন অবধি।

আলো ফুটতে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা।

১৫ অগাস্ট

ফটোশ্যুটের জন্যে তৈরি হয়ে নিচে নেমে আসে গ্যাব্রিয়েল। আমাকে জানালার পাশে বসে থাকতে দেখে যখন বুঝতে পারে যে সারারাত ওখানেই ছিলাম, চেহারার অভিব্যক্তি পাল্টে যায়।

“চুপ করে বসো অ্যালিসিয়া। কথা আছে তোমার সাথে।”

“হ্যাঁ, কথা তো আছেই। আমার কথা একবিন্দুও বিশ্বাস করোনি তুমি।”

“কিন্তু তুমি যে আসলেও বিশ্বাস করছো ব্যাপারটা সেটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার।”

“এরকম হেঁয়ালি করে কথা বলছো কেন? আমি বিশ্বাস করছি মানে? আমি কি পাগল যে অবাস্তব কিছু বিশ্বাস করবো? যা দেখেছি সেটাই বলেছি তোমাকে।”

“তোমাকে কিন্তু একবারের জন্যেও পাগল বলিনি আমি।”

“তাহলে কি বলছো এসব?”

আমি ভেবেছিলাম দু’জনের বোধহয় তখনই ঝগড়া লেগে যাবে, কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের কথাগুলো শুনে একদম থমকে যাই। ফিসফিস করে বলে:

“আমি চাই তুমি কারো সাথে এ ব্যাপারে কথা বলো।”

“কার সাথে কথা বলবো? পুলিশ?”

“না,” আবারো রাগ ভর করে গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠে। “পুলিশ না।”

আমি আসলে বুঝেছিলাম যে ও কি বলতে চাচ্ছে। কিন্তু সেটা ওর মুখ থেকেই শুনতে চাচ্ছিলাম। “তাহলে কার সাথে?”

“ডাক্তার।”

“আমি কোন ডাক্তার দেখাবো না, গ্যাব্রিয়েল-”

“আমার জন্যে কাজটা করো, জান। আমি তো তোমাকে বোঝার চেষ্টা করছি,

তুমিও একটু-”

“না, তুমি বোঝার চেষ্টা করছো না!”

এতটা অসহায় দেখাচ্ছিল ওকে। বারবার মনে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেই। “সব ঠিক হয়ে যাবে, জান,” শেষমেষ নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেই ফেলি। ওকে এভাবে দেখা সম্ভব না আমার পক্ষে। “দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো গ্যাব্রিয়েল। “ডঃ ওয়েস্টের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করবো। সম্ভব হলে আজকেই,” বলে চোখে দ্বিধা নিয়ে আমার দিকে তাকালো ও। “ঠিক আছে?”

ইচ্ছে করছিল গ্যাব্রিয়েলের সামনে বাড়িয়ে দেয়া হাতটা চাপড় দিয়ে সরিয়ে দেই; ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, চেষ্টা করে বলি, “তোমার ধারণা আমি পাগল হয়ে গেছি! আমি পাগল না! আমি পাগল না!”

কিন্তু সেরকম কিছু করিনি। বরং মাথা নেড়ে গ্যাব্রিয়েলের হাতটা ধরি।

“ঠিক আছে, ডার্লিং,” বলি আমি। “তুমি যা চাও সেটাই হবে।”

১৬ অগাস্ট

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডঃ ওয়েস্টের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আজকে।

তার সবকিছুই অপছন্দ আমার। ছোট বাড়িটা থেকে শুরু করে সবসময় লিভিং রুমে ঘুরঘুর করা কুকুরটাকেও বিরক্ত লাগে। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘেউঘেউ থামায়না হতচ্ছাড়া। ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে কুকুরটাকে চুপ করতে বলি। ভেবেছিলাম ডঃ ওয়েস্ট নিজেই বোধহয় কিছু একটা করবেন, কিন্তু তিনি এমন একটা ভাব ধরেন যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। হয়তো আসলেও শুনতে পাচ্ছিলেন না। অন্তত আমার বলা কথাগুলো তার কানে যাচ্ছিল না, এটা নিশ্চিত। তাকে সব খুলে বলি আমি, কিন্তু জবাবে মুখে একটা হাসি ঝুলিয়ে বসে থাকেন। তার দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল একটা রঙিন গিরগিটির দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি গ্যাব্রিয়েলের বন্ধু, কিন্তু এরকম একটা লোকের সাথে কিভাবে ওর বন্ধুত্ব হলো কে জানে। গ্যাব্রিয়েল যেখানে সবসময় কোমল আচরণ করে, সেখানে ডঃ ওয়েস্টের হাবভাব একদম শীতল। একজন ডাক্তারের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলা উচিত হচ্ছে না, জানি। কিন্তু তার মধ্যে দয়ামায়ার কোন বালাই নেই।

লোকটার ব্যাপারে আমার সব কিছু বলা শেষ হলে লম্বা একটা সময় কিছু

বললেন না তিনি। তার এই অভ্যাসটাও আমাকে বিরক্ত করে। কথা বলার আগে অনেকক্ষণ ধরে ভাবেন, যেন ইচ্ছে করে অপেক্ষা করাচ্ছে আমাকে। শব্দ বলতে কেবল নিচতলা থেকে কুকুরটার ঘেউঘেউ কানে আসছে। আওয়াজটা শুনতে শুনতে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে চলে যাই। ডঃ ওয়েস্ট যখন আচমকা কথা বলে ওঠেন, তখন আসলেও চমকে যাই।

“আমাদের মধ্যে আগেও এ বিষয়ে কথা হয়েছে, তাই না অ্যালিসিয়া?”

শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই আমি। ধরতে পারছি না কি বলতে চাচ্ছেন।
“হয়েছে কি?”

“হ্যাঁ, হয়েছে,” মাথা নাড়েন ডঃ ওয়েস্ট।

“আপনি বোধহয় ভাবছেন যে পুরোটাই আমার কল্পনা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বানিয়ে বলছি না।”

“গতবারও এটাই বলেছিলেন। মনে আছে কি হয়েছিল?”

জবাব দেইনি। আসলে তাকে সেই সন্তুষ্টিটুকু দিতে চাচ্ছিলাম না। চোখ পাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকি, ছোট বাচ্চাদের মতন।

ডঃ ওয়েস্ট অবশ্য আমার জবাবের অপেক্ষা করলেন না। বাবার মৃত্যুর পর কি ঘটেছিল সে বিষয়ে কথা বলেই গেলেন। সবসময় একটা আতঙ্কের ভেতরে থাকতাম তখন, মনে হতো কেউ আমাকে দেখছে সর্বক্ষণ, নজর রাখছে। “আমরা আগেও এ বিষয়ে কথা বলেছি, বুঝলেন তো?”

“কিন্তু এবারে পরিস্থিতি ভিন্ন। গতবার শুধু ওরকমটা মনেই হয়েছিল আমার, কাউকে দেখিনি। এবারে আসলেও একজনকে দেখেছি।”

“কাকে দেখেছেন?”

“ইতোমধ্যে বলেছি আপনাকে। একটা লোককে।”

“তার বর্ণনা দিন তো?”

“সেটা পারবো না,” দ্বিধাবিহীন স্বরে বলি।

“কেন পারবেন না?”

“আসলে তাকে ঠিকমতো দেখতে পারিনি কোনবারই। বলেছিল তো আপনাকে-
দূর থেকে লক্ষ্য রাখে সে।”

“আচ্ছা।”

“তাছাড়া হচ্ছে করেই একটা কাপ আর সান্ধাস পরে আসে, যাতে চেহারাটা দেখতে না পাই।”

“অনেকেই কিন্তু এই আবহাওয়ায় সান্ধাস চোখে দিয়ে বাইরে বের হয়। মাথায় ক্যাপও পড়ে। তারা সবাই কি কারো ওপর নজর রাখে?”

মেজাজ গরম হতে শুরু করে আমার। “আমি জানি আপনি কি চাইছেন।”

“কি?”

“আপনি আমার মুখ থেকেই শুনতে চাচ্ছেন যে ভুলভাল দেখছি আমি। বাবা মারা যাবার পর মাথা বিগড়ে যেতে শুরু করেছিল, সেরমটাই হচ্ছে আবারো-এটাই তো বলাতে চাচ্ছেন আমাকে দিয়ে, নাকি?”

“আপনার কি ধারণা? সেরকম কিছু কি হচ্ছে আপনার সাথে?”

“না। তখন মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম আমি। কিন্তু এবারে একদম ঠিক আছি। কোন সমস্যা নেই। একটা লোক আমাদের বাসার ওপর নজর রাখছে প্রতিনিয়ত, এটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে সমস্যা মনে হচ্ছে না!”

মাথা নাড়লেন ডঃ ওয়েস্ট কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। নোটবুকে কী যেন টুকে নিলেন।

“আপনাকে আবারো কিছু ওষুধ খেতে হবে। সাবধানতাবশতই কাজটা করছি আমি। এবারে পরিস্থিতি আগের মত খারাপ হতে দেয়া চলবে না, বুঝেছেন?”

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলাম। “কোন ওষুধ খাবো না আমি।”

“বেশ। যদি ওষুধ না-ই খান, তাহলে কিন্তু এর পরিণাম নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকে।”

“কি পরিণাম? আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?”

“আমার সাথে এর কোন লেনদেন নেই। আমি আপনার স্বামীর ব্যাপারে কথা বলছি। গতবার আপনার ওরকম পরিস্থিতি দেখে গ্যাব্রিয়েলের কেমন লেগেছিল?”

কল্পনায় গ্যাব্রিয়েলকে নিচতলার লিভিংরুমে দেখতে পেলাম। কুকুরটা তার পাশে বসেই ঘেউঘেউ করে চলেছে। “জানিনা আমি, ওকেই জিজ্ঞেস করছেন না কেন?”

“আপনি কি এটাই চান, আবারো সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাক সে? আপনার কি মনে হয় না তার সহ্যের একটা সীমা আছে?”

“কী বলছেন এসব? গ্যাব্রিয়েল আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? আপনার এটাই ধারণা?”

কথাটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। ওকে হারাতে হবে, এটা চিন্তাই করতে পারি না। গ্যাব্রিয়েলকে নিজের কাছে রাখার জন্যে যে কোন কিছু করতে রাজি আমি। তাই রাজি হয়ে যাই ডঃ ওয়েস্টের কথায়। বলি যে যদি যে অশরীরি কেউ আমার মাথার ভেতরে কথা বলার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই জানাবো। ওষুধগুলোও খাবো নিয়মিত।

সন্তুষ্টি ফোটে ডঃ ওয়েস্টের চেহারা। বলেন যে নিচতলায় গিয়ে গ্যাব্রিয়েলের সাথে দেখা করতে পারি আমরা। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মনে হচ্ছিল তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই। দিলেই ভালো হতো।

বাসায় ফেরার পথে খুব খুশি দেখায় গ্যাব্রিয়েলকে। বারবার হাসিমুখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। “তোমার মতো সাহসী মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো।”

মাথা নাড়লেও ওর কথার জবাবে কিছু বলিনি ইচ্ছে করেই। কারণ ডঃ ওয়েস্টের কাছে যাওয়াটা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়।

একাই সবকিছু সামলাতে হবে আমাকে।

আসলে কাউকে বলাটাই ভুল হয়েছিল। কালকে বার্বিকে মেসেজ করে বলবো ব্যাপারটা ভুলে যেতে। জানি যে আমার মেসেজ পেয়ে বিরক্ত হবেন তিনি। তার নাটক শুরুতেই থামিয়ে দিচ্ছি আমি। কিন্তু কিছুদিন পরেই ভুলে যাবেন। আমিও ভাব ধরবো যে সব ঠিকঠাক চলছে। কেউ এক মুহূর্তের জন্যেও কিছু বুঝতে পারবে না।

একটা ফার্মেসি থেকে আমার ওষুধগুলো কিনে ফেলে গ্যাব্রিয়েল। বাসায় ফিরেই সরাসরি রান্নাঘরে গিয়ে গ্লাসে পানি ঢেলে আনে। হলুদ ওষুধগুলো আমার হাতে দিয়ে বলে, “খেয়ে ফেলো।”

“আমি বাচ্চা নই। এভাবে হাতে তুলে দেয়ার কিছু নেই।”

“আমি জানি তুমি বাচ্চা নও, কিন্তু এগুলো যে আসলেও খাচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করতে চাইছিলাম।”

“খাবো আমি।”

“এখনই খাও।”

গ্যাব্রিয়েলের সামনে ওষুধগুলো মুখে দিয়ে অল্প একটু পানি খাই।

“গুড গার্ল।” আমার গালে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ও।

সাথে সাথে ওষুধগুলো মুখ থেকে বের করে সিল্কে ফেলে দেই। আমি আর কোন ওষুধ খাবো না। গতবার ডঃ ওয়েস্টের দেয়া ওষুধগুলো খেয়ে প্রায় পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। এবারে সেই ঝুঁকি নিব না।

নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রন রাখতে হবে আমাকে।

সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

অগাস্ট ১৭

ডায়েরিটা এখন লুকিয়ে রাখি আমি। গেস্টরুমে একটা পাটাতন আলাগা করা যায়। সেখানেই রেখে দেই, সহজে আর কারো চোখে পড়বে না তাহলে। কেন? আসলে এখানে খোলাখুলি অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি। বলা যায় না, গ্যাব্রিয়েল যদি ডায়েরিটা দেখে তাহলে পড়া শুরু করে দিতেও পারে। তখন জেনে যাবে আমি ওষুধ না খেয়ে ফেলে দেই। খুব কষ্ট পাবে বেচারি, এরকমটা হতে দিতে পারি না আমি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই ডায়েরিটায় মনের কথা লিখতে পেরেছি, নতুবা মাথা আসলেও বিগড়ে যেত। কেউ নেই আমার সাথে কথা বলার মতো।

কাকে ভরসা করবো?

২১ অগাস্ট

গত তিন দিনে একবারের জন্যেও বাইরে যাইনি। গ্যাব্রিয়েল বাসায় ফিরলে ভাব ধরি যে বিকেলে হাঁটতে বের হয়েছি। কিন্তু সেটা মিথ্যে।

আসলে বাইরে যাবার কথা মনে হলেই ভয় লাগে। যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে। অন্তত বাসার ভেতরে আমি নিরাপদ। জানালার পাশে বসে। চুপচাপ বাইরে নজর রাখতে পারবো। রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে যায় তাদের সবাইকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খেয়াল করি। অবশ্য আমার দৃষ্টি বারবার একজনকেই খুঁজে ফেরে।

আচ্ছা, সে যদি সান্ধ্যাস আর ক্যাপ খুলে আসে তাহলে চিনবো কি করে? তার চেহারা কেমন এটা তো জানি না। তখন সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও বুঝতে পারবো না।

এটা একটা চিন্তার বিষয়।

২২ অগাস্ট

এখন পর্যন্ত দেখিনি তাকে। কিন্তু ধৈর্য্যহারা হওয়া চলবে না। আজ হোক আর কাল, ফিরে সে আসবেই। সেজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে আমাকে। উপযুক্ত পদক্ষেপও নিতে হবে।

আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরই গ্যাব্রিয়েলের বন্দুকটার কথা মনে হয়। গেস্ট রুম থেকে সরিয়ে হাতের কাছে কোথাও এনে রাখবো ওটা। জানালার পাশের কেবিনেটে রাখলেই সবচেয়ে সুবিধে হবে।

আমি জানি কথাগুলো কেমন শোনাচ্ছে। আশা করি পরিস্থিতি এতটাও খারাপ হবে না। লোকটা না এলেই ভালো।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবসময় মনে হয় সে আসবেই।

সে কোথায় এখন? আসছে না কেন? আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় চমকে দিতে চায়? কিন্তু আমি সবসময় তৈরিই থাকবো। জানালার পাশ থেকে সতর্ক নজর রাখবো বাইরে। অপেক্ষা করবো তার আগমনের।

২৩ অগাস্ট

এখন তো আমার মনে হচ্ছে গ্যাব্রিয়েল আর ডঃ ওয়েস্টের কথাই ঠিক। পুরোটাই কি কল্পনা ছিল?

গ্যাব্রিয়েল বারবার জিজ্ঞেস করে যে কেমন আছি আমি। আসলে জানতে চায় পাগলামিটা মাথা থেকে দূর হয়েছে কিনা। ও যে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার অভিনয় ঠিকঠাক হচ্ছে না বোধহয়, আরো ভালো করে চেষ্টা করতে হবে। সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার অভিনয় করি। কিন্তু আসলে কিছুই আঁকানো হয় না, মনোযোগ ছাড়া এ ধরনের কাজ অসম্ভব। এই কথাগুলো লেখার সময়েও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না যে জীবনে আর কখনো ঠিকঠাক ছবি আঁকতে পারবো কি না। অন্তত এই ঝামেলা শেষ হবার আগে তো পারবোই না।

বাইরে না যাবার ব্যাপারে এতদিন নানারকম অজুহাত দেখিয়েছি। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল বলেছে যে আজ রাতে বের হতেই হবে, ম্যাক্স দাওয়াত দিয়েছে আমাদের।

এরকম সময়ে ম্যাক্সের সাথে দেখা হবে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করছে। গ্যাব্রিয়েলের সাথে অনেকক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করেছি, কিন্তু লাভ হয়নি। বরং ও বলে যে গেলেই নাকি লাভ হবে আমার! মন থেকেই কথাটা বলেছে সে, তাই আমিও আর না করতে পারিনি।

আজ রাতে কি হবে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে খুব। কারণ একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করার পরই সব পরিস্কার হয়ে যায়। একদম খাপে খাপে মিলে গেছে। এতদিন কেন ব্যাপারটা বুঝিনি, সেটাই রহস্য।

বাইরে থেকে যে লোকটা আমার ওপর নজর রাখে, সে জিন-ফিলিক্স নয়। ওকে খুব ভালো করেই চিনি আমি, এতটা নিচে সে কখনোই নামবে না। কিন্তু আমাকে ইচ্ছে করে জ্বালাতন করার মত আর কে বাদ থাকে? যার উদ্দেশ্যে আমাকে এভাবে শাস্তি দেয়া?

ম্যাক্স।

এছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। আমাকে পাগল বানানোর যুদ্ধে নেমেছে সে।

খুব ভয় লাগছে, কিন্তু মনে সাহস জড়ো করতে হবে। আজকে রাতেই কাজটা করবো আমি।

ওর মুখোমুখি হবো।

২৪ অগাস্ট

এতদিন পর গতরাতে বাসা থেকে বের হয়ে একটু অদ্ভুতই লাগছিল।

মনে হচ্ছিলো যেন অ্যাকুরিয়াম থেকে সাগরে এসে পড়েছি। মাথার ওপরে বিশাল খোলা আকাশটাও অচেনা ঠেকছিল। পুরোটা সময় গ্যাব্রিয়েলকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম।

আমাদের পছন্দের রেস্টোরাঁ অগাস্টো'সে গিয়েও ভালো লাগছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল কি যেন একটা নেই। আর গন্ধটাও অন্যরকম ঠেকছিল, কোন কিছু পোড়ার গন্ধ। গ্যাব্রিয়েলকে জিজ্ঞেস করলে বলে যে সে কোন গন্ধ পাচ্ছে না। গোটাটাই আমার কল্পনা।

“সব ঠিকঠাকই আছে,” বলে ও। “শান্ত হও।”

“আমি তো শান্তই আছি। দেখে কি মনে হচ্ছে তোমার?”

গ্যাব্রিয়েল জবাব দেয়নি। চোয়াল শক্ত করে বসে ছিল, বিরক্ত হলে যেমনটা করে। চুপচাপ ম্যাক্সের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি আমরা।

ম্যাক্স ওর রিসিপশনিস্ট তানিয়েকে নিয়ে এসেছিল। ওদের মধ্যে কিছু একটা চলছে। ম্যাক্সের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন রাজরাণীকে সাথে করে নিয়ে এসেছে। একটু পর পর নানা ছুতোয় তার হাতে হাত রাখছিল, চুমু খাচ্ছিলো। আমার দিক থেকে কিন্তু চোখ ফেরায়নি এক মুহূর্তের জন্যেও। কি ভাবছিল? ওকে তানিয়ার সাথে দেখলে হিংসায় জ্বলবো আমি? ওর কথা ভাবলেই ঘেন্না লাগে আমার।

তানিয়াও বুঝতে পারে কোন একটা সমস্যা আছে। ম্যাক্সকে কয়েকবার আমার দিকে তাকাতে দেখে ফেলে সে। সাবধান করে দিতে হবে মেয়েটাকে। সামনে কি অপেক্ষা করছে সেটা জানলে হয়তো ভুলটা করবে না। কিন্তু এখনই কিছু বলবো না। আগে আমার নিজের সমস্যার সমাধান হোক।

ডিনারের এক পর্যায়ে ম্যাক্স বলে যে বাথরুমে যাবে সে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমিও একই অজুহাত দেখিয়ে উঠে যাই।

বাথরুমের কাছে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরি শক্ত করে।

“তোমাকে থামাতে হবে এসব! বুঝেছছ? থামাতে হবে!”

শয়তানি হাসি ফোটে ম্যাক্সের চেহারায়। “কি থামাবো?”

“আমার ওপর নজর রাখছো তুমি, ম্যাক্স। আমি জানি!”

“আবোলতাবোল কি বলছো এসব, অ্যালিসিয়া?”

“মিথ্যে বলবে না,” স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। “আমি দেখেছি তোমাকে, ঠিক আছে? ছবিও তুলেছি। আমার কাছে তোমার ছবি আছে!”

হাসে ম্যাক্স। “তোমার মাথার স্কু আসলেও টিলা হয়ে গেছে।”

আর সহ্য হয় না। জোরে থাপ্পড় দেই ওর গালে।

একটা শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়ে দেখি তানিয়া দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল থাপ্পড়টা তার গালেই পড়েছে।

একবার ম্যাক্স আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে কিছু না বলেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যায় সে।

চোখ গরম করে আমার দিকে তাকায় ম্যাক্স। তানিয়াকে অনুসরণ করার আগে নিচুগলায় বলে, “তোমার পেছনে সময় নষ্ট করতে আমার বয়েই গেছে। একবারও

তোমাদের বাসার ওদিকে যাইনি। আর নজর রাখবোই বা কেন? সরো, যেতে দাও আমাকে।”

তার কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে বুঝতে পারি সে সত্যিটাই বলছে। না চাইতেও বিশ্বাস করতে হয় কথাটা।

কিন্তু লোকটা যদি ম্যাক্স না হয়, তাহলে কে?

২৫ অগাস্ট

বাইরে থেকে একটা শব্দ কানে এসেছে কেবলই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কেউ একজন ছায়ায় নাড়াচাড়া করছে।

লোকটা এসেছে। বাইরে সুযোগের অপেক্ষা করছে এখন।

গ্যাব্রিয়েলকে ফোন দিয়েছিলাম, কিন্তু ও ধরেনি। পুলিশকে ফোন দিব? কি করবো বুঝতে পারছি না। হাত এত কাঁপছে যে লিখতেও

নিচতলা থেকে এখন ক্রমাগত শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জানালা খোলার চেষ্টা করেছে কিছুক্ষণ। এখন দরজা ধাক্কাচ্ছে। ভেতরে ঢোকান চেষ্টা করছে

আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। পালাতে হবে যে করেই হোক।

ঈশ্বর! তার হাঁটার শব্দ এখন একদম স্পষ্ট

ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বাসার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

স্বাভাবিকতার সাথে অস্বাভাবিকতার মিশ্রনের স্বভাব মানুষের সহজাত; আর সেজন্যেই ডায়েরি লেখার অভ্যাসটা বিপদজনক মনে হয় আমার কাছে। একজনের পক্ষে সবকিছুই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করাটা খুব সহজ সেখানে।

-জাঁ পল সাদ্রে

সচরাচর আমার মধ্যে সত্যের দেখা পাবেন না, কিন্তু মাঝেমধ্যে নিজের অজান্তেই সত্যটা বলে ফেলি।

-উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, দ্য উইন্টার'স টেইল

চতুর্থ পর্ব

অনেকেই ভাবেন যে থেরাপির মাধ্যমে অতীতের ভুল শোধরানো হয়, এটা বেশ বড়সড় ভুল। বরং বলা যায় যে একজন সাইকোথেরাপিস্ট তার রোগিকে নিজের অতীত সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, মুখোমুখি হতে শেখান।

-অ্যালিস মিলার

অ্যালিসিয়ার ডায়েরিটা বন্ধ করে ডেস্কের ওপরে নামিয়ে রাখলাম।

একদম স্থির হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম সেখানে, জানালায় বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। আলতো শব্দটা মনকে শান্ত করার জন্যে আদর্শ। এতক্ষণ যা পড়লাম তা বোঝার চেষ্টা করছি। অ্যালিসিয়া বেরেনসনকে চেনার অনেকটাই বাকি ছিল এতদিন। তার মনের বন্ধ দুয়ারের অপর পাশে কী আছে তা খানিকটা হলেও জানতে পেরেছি অবশেষে। আর তথ্যগুলো যে আমাকে চমকে দিয়েছে, সেটা বলাই বাহুল্য।

অনেক প্রশ্ন জড়ো হয়েছে মনে। অ্যালিসিয়া সন্দেহ করতো যে কেউ তার ওপর নজর রাখছে। লোকটার পরিচয় কি বের করতে পেরেছিল সে? কাউকে বলেছিল? এটা জানতে হবে আমাকে। যতদূর বুঝেছি গ্যাব্রিয়েল, বার্বি হেলমান আর ডঃ ওয়েস্টের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করেছিল সে। আর কেউ কি জানে? আরেকটা প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে আমাকে। ডায়েরিটা এরকম হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল কেন? এর পরের ঘটনাগুলো কি অন্য কোথাও লেখা হয়েছে? অন্য কোন ডায়েরি, যেটা সে দেয়নি আমাকে? তাছাড়া আমাকে অ্যালিসিয়ার নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরি পড়তে দেয়ার কারণটাও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। এর অর্থ কি আমাকে বিশ্বাস করে সে? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

এই ডঃ ওয়েস্টকেও খুঁজে বের করতে হবে যে করেই হোক। গোটা ব্যাপারটার একজন গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষী তিনি, হত্যাকাণ্ডের আগের দিনগুলোয় অ্যালিসিয়ার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কেও তথ্য আছে তার কাছে। তা সত্ত্বেও অ্যালিসিয়ার বিচার চলাকালীন সময়ে তিনি এগিয়ে আসেননি। কেন? তার কথা

কোথাও কেউ উল্লেখও করেনি। ডায়েরিতে নামটা না দেখলে তার অস্তিত্বের কথা জানতামই না। কতটা জানেন তিনি? কেন কিছু বলেননি?

ডঃ ওয়েস্ট।

আমি যার কথা ভাবছি সে হতেই পারে না। তাদের নাম মিলে যাওয়াটা একান্তই কাকতালীয়। তবে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।

ডেস্কের ড্রয়ারে ডায়েরিটা রেখে উঠে দাঁড়ালাম। পরক্ষণেই মত পাল্টে ওটা বের করে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম, নিজের কাছে রাখাটাই নিরাপদ।

আমার অফিস থেকে বেরিয়ে নিচতলায় চলে এলাম। গন্তব্য করিডোরের শেষ মাথার রুমটা।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। একটা ছোট ফলকে নাম খোদাই করা সেখানে।

ডঃ সি. ওয়েস্ট।

নক করার তোয়াক্কা না করেই দরজা খুলে ভেতরে পা রাখলাম।

ডেস্কে বসে চপস্টিকস দিয়ে আয়েশ করে সুশি খাচ্ছিল ক্রিস্টিয়ান। দ্রুত কুঁচকে তাকালো আমার দিকে।

“তোমাকে কি কেউ নক করা শেখায়নি?”

“জরুরি কথা আছে।”

“খাচ্ছি এখন, পরে বোলো।”

“খুব বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করবো না। একটা প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন আমার। তুমি কি কখনো অ্যালিসিয়া বেরেনসনের চিকিৎসা করেছিলে?”

মুখের সুশিটা গিলে অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো ক্রিস্টিয়ান। “মানে? তুমি তো জানোই যে আমিই এখানে ওর চিকিৎসা দলের প্রধান।”

“এখানকার কথা বলছি না। থোভে ভর্তি হবার আগে কখনো ওর চিকিৎসা করেছিলে?”

খুব ভালো করে লক্ষ্য করি ক্রিস্টিয়ানকে। চেহারার অভিব্যক্তির পরিবর্তন দেখেই যা বোঝার বুঝে গেলাম। ডঃ ওয়েস্টকে পেয়ে গেছি। পরো লাল হয়ে গেছে বেচারার চেহারা। চপস্টিকগুলো নামিয়ে রাখলো।

“কী বলছো এসব?”

অ্যালিসিয়ার ডায়েরিটা পকেট থেকে বের করে ওকে দেখালাম।

“গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হাতে এসেছে আমার। অ্যালিসিয়ার ডায়েরি। হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস আগে এখানে লেখা শুরু করেছিল সে। পুরোটা পড়া শেষ করলাম একটু আগে।”

শঙ্কা ফুটলো ক্রিস্টিয়ানের চেহারায়ে। “কোথায় পেলে এটা?”

“অ্যালিসিয়া নিজেই দিয়েছে।”

“এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?”

“তোমার কথা এখানে লিখেছে সে।”

“আমার কথা?”

“থোভে ভর্তি হবার আগেও ওর সাথে দেখা হয়েছে তোমার। এটা তো জানতাম না।”

“আমি...আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা। নিশ্চয়ই কোন ভুল হচ্ছে।”

“মনে হয় না। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অংশ হিসেবে তুমি বেশ কয়েকবারই ওর চিকিৎসা করেছে। তা সত্ত্বেও বিচার চলাকালীন সময়ে আদালতে কিছু বলোনি। অথচ তোমার কথাগুলো আদালতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচ্য হতো। অ্যালিসিয়াকে যে আগে থেকেই চিনতে, সেটা এখানে কাজ শুরু করার সময় স্বীকারও করোনি। কিন্তু তোমাকে চিনতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়নি অ্যালিসিয়ার। সে যে কথা বলে না, এটা তোমার সৌভাগ্য।”

স্বাভাবিক স্বরে কথাগুলো বললেও ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছি। এখন বুঝতে পারছি যে অ্যালিসিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ক্রিস্টিয়ান কেন এভাবে আমার পেছনে লেগেছে। সে চুপ থাকলেই ওর জন্যে ভালো।

“এতটা স্বার্থপর হয় কিভাবে মানুষ?”

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো ক্রিস্টিয়ান। “ধুর, বিড়বিড় করে বলল একবার। “ধুর। থিও, শোনো-তুমি যা ভাবছো আসলে ব্যাপারটা ওরকম না।”

“তাহলে কী রকম?”

“ডায়েরিতে আর কি লেখা?”

“আর কি লেখা থাকার কথা?”

জবাব দিলনা ক্রিস্টিয়ান। “আমি কি একবার পড়তে পারি?” হাত সামনে

বাড়িয়ে জিঙেস করলো।

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলাম। “সেটা ঠিক হবে না।”

হাতের চপস্টিকগুলো আনমনে নাড়াচাড়া করছে খ্রিস্টিয়ান। “আসলে কাজটা করা উচিত হয়নি আমার। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার খারাপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না।”

“বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। তুমি যদি সাধুই হতে তাহলে বিচার চলাকালীন সময়ে কিছু বলোনি কেন?”

“কারণ, আমি তো অ্যালিসিয়ার চিকিৎসা করেছি গোপনে। গ্যাব্রিয়েলের অনুরোধে। ইউনিভার্সিটির বন্ধু আমরা। ওর বিয়েতেও গিয়েছিলাম। এরপর অবশ্য যোগাযোগ কমে যায়। একদিন হঠাৎ ফোন দিয়ে বলে ওর স্ত্রীকে দেখাবার জন্যে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট খুঁজছে। বাবার মৃত্যুর পর একদম ভেঙে পড়েছে সে।”

“আর তুমি নিজেই চিকিৎসা করার জন্যে লাফিয়ে উঠলে।”

“না, একদমই না। বরং উল্টোটা ঘটেছিল। আমি আমার এক সহকর্মীর কথা বলেছিলাম গ্যাব্রিয়েলকে। কিন্তু ও বারবার বলে, আমাকেই দেখতে হবে অ্যালিসিয়াকে। আসলে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর কোন ইচ্ছে ছিল না অ্যালিসিয়ার, তাই গ্যাব্রিয়েল ভাবে, পরিচিত কেউ হলে সে অতটা আপত্তি করবে না। আমার ইচ্ছে ছিল না আসলেই।”

“তা তো বুঝতেই পারছি।”

আহত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় খ্রিস্টিয়ান। “এভাবে ব্যঙ্গ করার মতন কিন্তু কিছু হয়নি।”

“কোথায় তোমার সাথে দেখা করতে অ্যালিসিয়া?”

“আমার গার্লফ্রেন্ডের বাসায়। কিন্তু তোমাকে যেমনটা বললাম,” দ্রুত যোগ করলো সে, “পুরোটাই অনানুষ্ঠানিক, বলা যায় গল্প গুজবের ফাঁকে ওর সমস্যাগুলোর কথা শুনেছিলাম। তাও অল্প কয়েকবার।”

“আচ্ছা। সেই ‘অনানুষ্ঠানিক’ গল্প গুজবের জন্যে ফি নিয়েছিলে?”

চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল খ্রিস্টিয়ান। “ইয়ে মানে, গ্যাব্রিয়েলের জোরাজুরির কারণে-”

“নগদেই নিয়েছিলে নিশ্চয়ই?”

“থিও-”

“নগদ নিয়েছিলে কি না সেটা বলো।”

“হ্যাঁ, কিন্তু

“কাগজে কলমে এই লেনদেনের তো কোন অস্তিত্ব নেই?”

কোন জবাব দিল না ক্রিস্টিয়ান। অর্থাৎ আমার ধারণাই ঠিক। সেজন্যেই অ্যালিসিয়ার বিচার চলাকালীন সময়ে কিছু বলেনি সে। এরকম ‘ব্যক্তিগতভাবে আর কতজনকে ‘অনানুষ্ঠানিক চিকিৎসা দেয় সে কে জানে।

“দেখো, ডায়োমেডেস যদি এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে, তাহলে...তাহলে আমার চাকরিই চলে যাবে। এটা তো বুঝতে পারছে তুমি, নাকি?” ওর কণ্ঠে করুণা প্রার্থনার ছাপ স্পষ্ট।

কিন্তু আমার সহানুভূতির বিন্দু পরিমাণও ক্রিস্টিয়ানের জন্যে বরাদ্দ নয়। ওর কাছ থেকে কখনোই ভালো ব্যবহার পাইনি। “প্রফেসরের কথা বাদ দাও। একবার যদি মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে খবরটা যায়, তাহলে কি হবে বলো দেখি? তোমার লাইসেন্স কেড়ে নিবে।”

“সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি যদি না বলো, তাহলে তো কেউ জানবে না। থিও, আমার ক্যারিয়ারের ব্যাপার এটা, বোঝার চেষ্টা করো। প্লিজ।”

“সেটা আগে চিন্তা করা উচিত ছিল, তাই না?”

“থিও, প্লিজ-”

আমার কাছে এরকম অনুনয় করতে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না ক্রিস্টিয়ানের। সত্যি বলতে আমিও যে কোনপ্রকার আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি, এমনটা নয়। বরং বিরক্তি লাগছে। ডায়োমেডেসকে কিছু জানানোর ইচ্ছে আপাতত আমার নেই। ওকে ঝুলিয়ে রাখাটাই আমার জন্যে সুবিধাজনক। তাহলে হাতের মুঠোয় থাকবে।

“কাউকে কিছু বলবো না। আপাতত।”

“ধন্যবাদ, থিও। মন থেকে বলছি কথাটা। তোমার কাছে সদা ঋণী থাকবো।”

“বাদ দাও এসব। তবে আমাকে অনেক কিছুই নিশ্চয়ই বলার আছে তোমার?”

“কি জানতে চাও?”

“অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে।”

“অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে কি?”

“সবকিছু।”

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো খ্রিস্টিয়ান, আবারো চপস্টিকগুলো নাড়াচাড়া করছে। কয়েক সেকেন্ড ভাবনা চিন্তার পর কথা বলা শুরু করলো।

“আসলে খুব বেশি কিছু বলার নেই। তুমি ঠিক কি জানতে চাচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি না। কোথা থেকে শুরু করবো?”

“একদম প্রথম থেকেই। বেশ কয়েক বছর ধরেই তো ওকে দেখে আসছো তুমি?”

“না, মানে হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যতটা ভাবছো, ওরকম দেখা সাক্ষাৎ হতো না আমাদের। ওর বাবা মারা যাবার পর দুই কি তিনবার এসেছিল আমার কাছে।”

“শেষবার কবে যায়?”

“হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ আগে।”

“তখন তার মানসিক অবস্থা কেমন মনে হয়েছিল তোমার?”

“ওহ...” চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো খ্রিস্টিয়ান, আপাতত বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পারছে। “খুবই খারাপ। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতো, উল্টোপাল্টা জিনিস কল্পনা করতো। এরকমটা আগেও হয়েছিল। এর সমস্যা তার বহুদিনের। এই ভালো তো এই খারাপ। বর্ডারলাইন রোগিরা যেমন হয় আর কি।”

“এসব টেকনিকাল টার্ম কপচানোর কোন দরকার নেই। যেটুকু জিজ্ঞেস করছি সেটুকু ঠিকঠাক উত্তর দাও, ব্যস।”

আবারো আহত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো খ্রিস্টিয়ান। তবে তর্ক করলো না। “কি জানতে চাচ্ছে?” ক্লান্ত কণ্ঠে বলল।

“অ্যালিসিয়া বলেছিল যে কেউ তার ওপরে লক্ষ্য রাখছিল, তাই তো?”

শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় খ্রিস্টিয়ান। “লক্ষ্য রাখছিল মানে?”

“কেউ নজর রাখতে অ্যালিসিয়াদের বাড়িতে। তোমাকে তো এ ব্যাপারে বলেছিল বোধহয়?”

অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠলো খ্রিস্টিয়ান।

“হাসির কি আছে এখানে?”

“তুমি কি আসলেও কথাটা বিশ্বাস করেছো? কেউ সবসময় নজর রাখতো ওর ওপরে?”

“কেন, তোমার বিশ্বাস হয়নি?”

“পুরোটাই ওর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। আমি তো ভেবেছিলাম এটা বুঝতে পেরেছো তুমি।”

মাথা নাড়লাম জবাবে। “ডায়েরিতে এমনভাবে বর্ণনা দেয়া যে বিশ্বাস না করে পারিনি।”

“ব্যাপারটা যে কল্পনা সেটা তো আর অ্যালিসিয়া জানতো না। সুতরাং বর্ণনা বাস্তবই হবে। ওর সম্পর্কে যদি আগে থেকে না জানতাম তাহলে আমিও বিশ্বাস করতাম। আসলে ও মানসিক সমস্যায় ভুগছিল।”

“বারবার কথাটা বলছো। ডায়েরি পড়ে কিন্তু আমার সেরকমটা মনে হয়নি। এখানে সে যা লেখেছে এরকমটা কিন্তু অহরহ ঘটে চলেছে।”

“আরে তোমাকে তো বললামই, ওর বাবা মারা যাবার পরেও এমনটা হয়েছিল। তখন ওয়েস্ট গ্রিনে থাকতো গ্যাব্রিয়েল আর অ্যালিসিয়া। ওখানকার বাসাটা ছেড়ে দেয় শেষ পর্যন্ত। বলতো যে, এক বয়স্ক লোক নাকি নজর রাখতে ওর ওপরে। বেশ হৈচৈও করে এটা নিয়ে। শেষমেষ দেখা যায় বেচারি অন্ধ। আগে থেকেই নানারকম সমস্যায় ভুগছিল ও। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। এরপর আর পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।”

“অ্যালিসিয়া তার বাবার ব্যাপারে তোমার সাথে কখনো আলাপ করেছিল?”

কাঁধ ঝাঁকালো ক্রিস্টিয়ান। “নাহ, খুব বেশি কিছু কখনো বলেনি। কথায় কথায় তার প্রসঙ্গ উঠলে বলতো, দুজনের সম্পর্ক স্বাভাবিকই ছিল। মানে ওর মা আত্মহত্যা করার পর যতটা স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব আর কি। আসলে আমার কাছে যে একটু হলেও মুখ খুলেছিল অ্যালিসিয়া, এটাই অনেক। রোগি হিসেবে সুবিধের ছিল না। তুমিও নিশ্চয়ই এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছো।”

কোন মন্তব্য করলাম না এ ব্যাপারে। “বাবা মারা যাবার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সে?”

আবারো কাঁধ ঝাঁকালো ক্রিস্টিয়ান। “চাইলে সেটাকে আত্মহত্যার চেষ্টা বলতে পারো তুমি। কিন্তু আমি বলবো না।”

“তুমি কি বলবে শুনি?”

“বড়জোর আত্মঘাতী আচরন বলতে পারো, কিন্তু আত্মহত্যা করারটা কখনোই

ওর মূল উদ্দেশ্য ছিল না। নিজেকে কষ্ট দেয়াটা ওর মত আত্মকেন্দ্রিক কারো পক্ষে সহজ কাজ নয়। মানে সে কতটা মানসিক কষ্টে আছে এটা বোঝানোর জন্যে ওষুধ খাবার নাটকটা করেছিল। গ্যাব্রিয়েলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল আর কি। ছেলেটার কথা ভাবলে খারাপই লাগে আমার। যদি অ্যালিসিয়ার বলা কথাগুলো গোপন রাখতে বাধ্য না হতাম, তাহলে ওকে হয়তো বলেই বসতাম যে সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে আসতে।”

“আহহা...তোমার ন্যায়পরায়ণতার জন্যে বেচারার প্রাণটা খোঁয়াতে হলো।”

যেন কষ্ট পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো ক্রিস্টিয়ান। “থিও, আমি জানি যে তুমি মন থেকে রোগীদের ভালো চাও। সেজন্যেই একজন সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে সফল তুমি। কিন্তু অ্যালিসিয়া বেরেনসনের পেছনে আসলেও সময় নষ্ট করছে। অন্তর্দৃষ্টি বলতে কখনোই কিছু ছিল না ওর। সবসময় নিজেকে আর ঐসব আঁকাআঁকি নিয়ে ভাবতো। ও তোমার সহমর্মিতার যোগ্য নয়। তোমার বিপদের সময় কিন্তু ওর কাছ থেকে সহমর্মিতা পাবে না। একটা আস্ত গাড়ল সে।”

ক্রিস্টিয়ানের বলা কথাগুলোয় ঘৃণার ছাপ স্পষ্ট। মানসিকভাবে অসুস্থ কারো জন্যে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির কোন বলাই নেই ওর মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্যে তো মনে হলো অ্যালিসিয়া না, ক্রিস্টিয়ান নিজেই বর্ডারলাইন।

উঠে দাঁড়ালাম। “অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করবো আমি। কিছু প্রশ্নের জবাব দরকার।”

“অ্যালিসিয়ার কাছ থেকে?” অবাক মনে হলো ক্রিস্টিয়ানকে। “কিভাবে পাবে জবাবগুলো, শুনি?”

“সরাসরি প্রশ্ন করবো ওকে।”

বেরিয়ে এলাম রুমটা থেকে।

ডায়োমেডেস তার অফিসরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া অবধি অপেক্ষা করলাম। স্টেফানি ট্রাস্টের লোকদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত। নার্স স্টেশনে এসে দেখি ভার মুখ করে বসে আছে ইউরি।

“অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করতে হবে আমাকে।”

“তাই?” অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো হেড নার্স। “কিন্তু আমি তো

শুনেছি ওর জন্যে থেরাপি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।”

“ঠিকই শুনেছো। আমি ওর সাথে আলাদাভাবে কিছু ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে চাই।”

“আচ্ছা।” ইউরির কণ্ঠে সন্দেহ। “থেরাপি রুমে তো ইন্দিরা তার রোগীদের সাথে কথা বলবে আজকে।” একমুহূর্ত কী যেন ভাবলো সে। “তবে আর্ট রুমটা খালি আছে, ওখানে দেখা করবে? তবে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু।”

জানি কেন কথাটা বলল ও। কেউ দেখে ফেলার আগেই যত দ্রুত সম্ভব অ্যালিসিয়ার সাথে কথা শেষ করতে হবে। কেউ যদি স্টেফানিকে বলে দেয় তাহলে সমস্যায় পড়ে যাবো। ইউরি আমার পক্ষে আছে দেখে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো মনটা; আসলেও ভালো মানুষ সে। শুরুতে তাকে ভুল বুঝেছিলাম ভেবে একটু অপরাধবোধই হচ্ছে এখন।

কথা রাখলো ইউরি। দশ মিনিট পর নিজেকে অ্যালিসিয়ার মুখোমুখি আবিষ্কার করলাম। আর্ট রুমের টেবিলগুলোর একটায় বসেছি আমরা।

অ্যালিসিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবি আঁকার জন্যে পোজ দিচ্ছে। চোখের দৃষ্টি বরাবরের মতনই নির্মোহ।

“ডায়েরিটা আমাকে পড়তে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,” পকেট থেকে ওটা বের করে টেবিলে রাখলাম। “ভরসা থেকেই নিশ্চয়ই দিয়েছেন।”

হাসলাম তার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আমার হাসির প্রেক্ষিতে অ্যালিসিয়ার চেহারায় কোন অনুভূতি খেলা করলো না। আমাকে ডায়েরিটা পড়তে দিয়ে পস্তাচ্ছে না তো সে? হয়তো তার সম্পর্কে স্পর্শকাতর অনেক কিছু এখন আমার জানা দেখে লজ্জা পাচ্ছে।

“ডায়েরিটা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে,” নোটবুকের খালি পাতাগুলো উল্টে কিছুক্ষণ পর বললাম। “আমাদের থেরাপি সেশনগুলোর মতনই...অসমাপ্ত।”

অ্যালিসিয়া কোন কথা বলল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেবল। আমি নিজেও জানি না যে তার কাছ থেকে আসলে কি আশা করছিলাম। ডায়েরিটা পেয়ে ভেবেছিলাম এবারে হয়তো সে কোন পরিষ্কার ইঙ্গিত দিবে, কিন্তু তেমনটা হচ্ছে না।

“জানেন, আমি ভেবেছিলাম এই ডায়েরিটার মাধ্যমে আমার সাথে পরোক্ষভাবে যোগাযোগ করার পর এবারে হয়তো আরেক ধাপ এগিয়ে...কথা বলতে রাজি হবেন

আপনি।”

কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

“আমার ধারণা আমাকে ডায়েরিটা দিয়েছিলেন কথা বলার জন্যেই। এক অর্থে কিন্তু মুখ না খুলেও কথা বলেছেন, এই পাতাগুলোর মাধ্যমে। এখন আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি। কতটা একাকী ছিলেন, কতটা ভয় পেয়েছিলেন শেষ দিকে, কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন-এগুলো আসলেও দরকারী তথ্য। যেমন ডঃ ওয়েস্টের সাথে আপনার সাক্ষাতের ব্যাপারটাই ধরুন না কেন।”

ভেবেছিলাম ক্রিস্টিয়ানের নামটা বলার পর হয়তো কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবো, কিন্তু অমন কিছুই হলো না। পাথরের মত মুখ করে রেখেছে। অ্যালিসিয়া। একবারের জন্যে পলকও ফেলছে না।

“থোভে ভর্তি হবার আগে থেকেই যে ক্রিস্টিয়ান ওয়েস্টকে চিনতেন আপনি, এটা জানতাম না আমি। বেশ কয়েক বছর ধরে তার কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন। থোভে তাকে প্রথমবার দেখেই চিনে ফেলেছিলেন নিশ্চয়ই? বিষয়টা আপনার জন্যে পীড়াদায়ক ছিল, তাই না?”

প্রশ্নোচ্ছলে কথাটা বললেও তার পক্ষ থেকে কোন জবাব পেলাম না। ক্রিস্টিয়ানের কথা শুনেও কোন ভাবান্তর হলো না তার মধ্যে। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে-যেন বিরক্ত হচ্ছে আমার বকবকানি শুনে। এখন আর কোন কিছু আশা করছে না আমার কাছ থেকে। ওর কাছে হয়তো ব্যর্থ মনে। হচ্ছে আমাকে।

কিন্তু আমি তো এখনও হাল ছাড়িনি।

“এখানে ভিন্ন কোন ব্যাপার আছে। ডায়েরিটা পড়ে শেষ করার পরেও অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পাইনি, সেগুলোর উত্তর আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। কিছু বিষয় আমার বোধগম্য হচ্ছে না, ঠিক মিলছে না তথ্যগুলো। আপনি যখন নিজে থেকে আমাকে ডায়েরি পড়তে দিয়েছেন, তাই এসকল ব্যাপারে আরো খোঁজখবর নেয়াটা আমার দায়িত্ব বলে মনে হচ্ছে। আশা করি কথাগুলো আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।”

অ্যালিসিয়াকে ডায়েরিটা ফিরিয়ে দিলাম। জিনিসটা নিয়ে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে আমার দিকে তাকালো সে।

“আমি আপনার পক্ষে,” কিছুক্ষণ পর বললাম। “সেটা তো নিশ্চয়ই জানেন,

তাই না?”

উত্তর দিল না অ্যালিসিয়া।

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিলাম।

ক্যাথি ইদানীং আর সাবধানতার ধার ধারে না। আসলে এমনটাই হবার ছিল। ভেবেছে এতদিনেও যখন তার পরকীয়া সম্পর্কে আমি কিছু বুঝতে পারিনি, আর পারবোও না।

বাড়ি ফিরে দেখি বাইরে যাওয়ার জন্যে রেডি হচ্ছে ও।

“একটু হাঁটতে বের হবো,” জুতো পায়ে গলিয়ে বলল। “বেশি দেরি করবো না।”

“আমিও ব্যায়ামের কথা ভাবছিলাম। আসবো নাকি তোমার সাথে?”

“নাহ্, হাঁটতে হাঁটতে সংলাপগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে।”

“তুমি চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি।”

“থাক, তোমার কষ্ট করতে হবে না। আর আমি একা প্র্যাকটিস করলেই মনে রাখতে সুবিধে হবে। দ্বিতীয় পর্বের সংলাপগুলো একটু জটিল। পুরো পার্কে হাঁটি আর আপনমনে কথা বলি। সবাই এমনভাবে তাকায় যেন পাগল হয়ে গেছি।”

এমনভাবে কথাগুলো বলল ক্যাথি যে আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে বিশ্বাস করেই ফেলতো। একবারের জন্যেও চোখ অন্যদিকে সরায়নি। একদম পাক্কা অভিনেত্রী যাকে বলে?

তবে আমিও কম যাই না। মুখে একটা উষ্ণ হাসি ফুটিয়ে বললাম, “সাবধানে হেঁটো।”

ও ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর আমিও বের হয়ে আসলাম। নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছি। কিন্তু একবারের জন্যেও পেছনে ফিরে তাকালোনা ক্যাথি। বললাম না, এখন আর সাবধানতার ধার ধারে না।

পাঁচ মিনিট হাঁটার পর পার্কের প্রবেশপথের কাছে পৌঁছুল সে। এ সময় ছায়া থেকে একজন বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল তার দিকে। তবে উল্টোদিকে ঘুরে থাকায় চেহারাটা দেখতে পেলাম না। মাথার চুল কালো, শক্তপোক্ত শরীর, আমার থেকে বেশ খানিকটা লম্বা।

ক্যাথি লাফিয়ে পড়লো লোকটার ওপরে। শক্ত করে একে অপরকে কিছুক্ষণ

জড়িয়ে ধরে রাখলো দু'জনে। কিছুক্ষণ পরেই এক হয়ে গেল তাদের ঠোঁট। যেমন অনেকদিনের ক্ষুধার্ত, এমনভাবে একজন আরেকজনকে আদর করছে তারা। যা চলছে আমার সামনে, তার বর্ণনা কিভাবে দেব জানি না। ক্যাথির দেহে পরপুরুষের স্পর্শ-ব্যাপারটা অদ্ভুত বলাটা কি ঠিক হবে? আসলে আমার ভেতরের অনুভূতিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছিল না সে মুহূর্তে। আড়ালে যাবারও প্রয়োজনবোধ করেনি তারা। এখন কাপড়ের ওপর দিয়েই ক্যাথির স্তনগুলো নিয়ে খেলছে লোকটা।

বুঝতে পারছি, আমার লুকিয়ে পড়া উচিৎ। ক্যাথি যদি একবার পিছে ফেরে, তাহলেই ধরা পড়ে যাবো। তবুও নড়তে পারছিলাম না। কি এক জাদুবলে আমাকে সেখানেই আটকে ফেলেছিল দৃশ্যটা।

এক সময় চুমুর পর্ব শেষ হলো তাদের। হাত ধরাধরি করে পার্কে ঢুকে পড়লো। রোবটের মত পিছু নিলাম আমি, এখনও বেশ খানিকটা দূরেই আছি। উচ্চতার কথা বাদ দিলে লোকটার দেহাবয়ব আমার মতনই, একবার তো মনে হলো নিজেকেই দেখছি পার্কে ক্যাথির সাথে হেঁটে বেড়াতে।

গাছপালায় ঘেরা একটা নির্জন জায়গায় লোকটাকে নিয়ে গেল ক্যাথি। দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল দুজনে।

পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো আমার। বেশ খানিকক্ষণ ধরেই ভারি নিশ্বাস পড়ছে। মাথার ভেতরে ক্রমাগত একটা কণ্ঠ শুনেই যাচ্ছি-চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও, চলে যাও। কিন্তু গেলাম না আমি। বরং ওদের অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

খুব সাবধানে এগোচ্ছি, যাতে কোন শব্দ না হয়। তবুও পায়ের নিচে বেশ কয়েকটা শুকনো ডাল মটমট করে ভাঙলো। ওদেরকে কোথাও চোখে পড়লো না, আসলে এদিকে গাছপালা এত ঘন হয়ে জেনেছে যে দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা দায়।

তাই যেখানে ছিলাম সেখানেই থেমে কান পাতলাম। প্রথমে একটা খচখচ শব্দ কানে এলো। ভাবলাম বাতাসে পাতা নড়ার শব্দও হতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলটা ভেঙে গেল। আরেকটা খুব পরিচিত শব্দ কানে এসেছে।

ক্যাথির শিকার। কখন এরকম শব্দ করে ও সেটা খুব ভালো করেই জানা আছে আমার।

আরেকটু সামনে এগোনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুকনো ডাল আর পাতার কারণে সুবিধে করতে পারলাম না। নিজেকে মাকড়সার জালে আটকা পড়া শিকারের মতন মনে হচ্ছে। আধো আলো আধধা অন্ধকারে, স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। ক্যাথির গোঙানি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। লোকটা নিশ্চয়ই এখন চড়ে বসেছে ওর ওপরে। ঝোঁপের আড়ালে লীলাখেলায় মত্ত দুই মানব-মানবী।

ঘেন্নায় রীতিমতো কাঁপছি এখন আমি। হঠাৎ করেই উদয় হয়ে আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে লোকটা। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। জীবন এতটা নিষ্ঠুর হয় কী করে? আমি তো কখনো কোন পাপ করিনি। অন্য কারো স্ত্রীর দিকে চোখ তুলেও তাকাইনি। একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে এরকম অসুস্থ কাজ করা সম্ভব? আসলে সে মানুষই না, আস্ত জানোয়ার। কেন? কেন এসব হচ্ছে। আমার সাথে। কাউকে নিজের চাইতে বেশি ভালোবাসাটাই কি তাহলে ভুল ছিল? নাকি ফাঁক ছিল আমার ভালোবাসায়?

এই লোকটা কি ক্যাথিকে ভালোবাসে? সন্দেহ আছে সে ব্যাপারে। অন্তত আমার মত করে ভালোবাসে না। শুধু ওর দেহটাকে ভালোবাসে। আসলে আমি যেভাবে ক্যাথিকে ভালোবাসি, সেটা অন্য কারো কাছ থেকে পাবে না সে। ওর জন্যে আমি জান দিতেও রাজি, জান নিতেও রাজি।

বাবার কথা মনে হলো, আমার জায়গায় সে হলে কি করতো? এখানেই লোকটাকে খুন করতো নিশ্চিত। পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুষের মত আচরণ করো, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সেরকম কিছুই কি করা উচিত আমার? মেরে ফেলবো লোকটাকে? তাহলে অবশ্য এই সমস্যার সমাধান হবে। শুধু স্মৃতি হিসেবে ক্যাথির মনে থেকে যাবে সে-এই যা। একসময় স্মৃতিটা ভুলেও যাবে। ইচ্ছে করলে এখানেই কাজটা করতে পারি আমি। পার্কের পুকুরে চুবিয়ে মারতে পারি তাকে। দেহ অসাড় হয়ে আসা অবধি শক্ত করে পানির নিচে মাথাটা চেপে ধরে রাখলেই হবে। কিংবা তার পিছু নিয়ে মেট্রো রেল স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে সুযোগমতো ধাক্কা দিয়ে লাইনের ওপরে ফেলে দিয়েও কাজ সারা যায়। লোকে ভাববে আত্মহত্যা করেছে। কিংবা নির্জন কোন রাস্তায় পেছন থেকে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে ঘিলু বের করে ফেলতে পারি।

হঠাৎ করেই ক্যাথির শিক্ষারের শব্দ বেড়ে গেল। উত্তেজনার চরম মুহূর্তে আছে নিশ্চয়ই এখন...পরক্ষণেই কানে এলে পরিচিত হাসিটা। ডাল ভাঙার শব্দ হলো এসময়। গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসছে দুজনে।

লুকিয়ে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হাত দিয়ে ডালপালা সরিয়ে বেরিয়ে এলাম আড়াল থেকে। চোখা ডাল লেগে বেশ কয়েক জায়গায় ছিলে গেছে।

দু'চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে এখন। রক্তাক্ত হাত দিয়েই চোখের পানি মুছলাম।

পার্ক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। নিজেকে ঘরপালানো কোন অভিমানী কিশোর মনে হচ্ছে।

“জিন-ফিলিক্স?”

রিসিপশন ডেস্ক ফাঁকা। আমার ডাক শুনেও কেউ বেরুলো না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে গ্যালারিতে ঢুকেই পড়লাম।

শূন্য করিডোরগুলো পেরিয়ে অ্যালসেসিসের সামনে পৌঁছে গেলাম একটু পর। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আবারো সেই আগের অনুভূতিই হলো। এখনও অ্যালিসিয়ার এই শিল্পকর্মের রহস্য অধরাই রয়ে গেছে আমার কাছে। ছবিটার মাধ্যমে কোন একটা বার্তা তো আলবত দিতে চাইছে সে, কিন্তু সেটা কি?

এ সময় হঠাৎই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করে চমকে উঠলাম, আগে চোখে পড়েনি। ছবিতে অ্যালিসিয়ার পেছনে অন্ধকারে একটা ছায়াবয়ব দেখা যাচ্ছে, তবে খুব ভালো করে খেয়াল না করলে বোঝাই যাবে না যে ওখানে কেউ আছে। নিশ্চয়ই এই লোকটাই অ্যালিসিয়ার ওপর নজর রাখা সেই আততায়ী।

“কি চাই আপনার?”

চমকে উঠলাম কণ্ঠস্বরটা শুনে। পেছনে ঘুরে দেখি জিন-ফিলিক্স দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। “এখানে কেন এসেছেন?”

কেবলই কি আবিষ্কার করেছি সেটা তাকে বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। শেষ মুহূর্তে। কেন যেন মনে হচ্ছে সে বিষয়টাকে সহজভাবে নেবে না।

বরং হাসলাম তার উদ্দেশ্যে। “আরো কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমার। এখন কি সময় দিতে পারবেন?”

“আপনাকে যা বলার সব তো বলেছিই। আর আবার কি প্রশ্ন?”

“আসলে নতুন কিছু তথ্য জানতে পেরেছি।”

“কী রকম তথ্য?”

“এই যেমন গতবার যখন আমাদের দেখা হয়েছিল, তখনও জানতাম না অ্যালিসিয়া আপনার গ্যালারি ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছিল।”

এবারে জবাব দেয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল জিন-ফিলিক্স। “কি বলছেন এসব?” দাঁতে দাঁত চেপে বলল অবশেষে।

“ভুল কিছু তো বলিনি?”

“এসবের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?”

“আমি অ্যালিসিয়ার সাইকোথেরাপিস্ট। আমার উদ্দেশ্যে আবারো তাকে স্বাভাবিক জগতে ফিরিয়ে আনা, সেজন্যে প্রথমে তাকে কথা বলাতে হবে। এখন তো মনে হচ্ছে সে চুপ থাকলেই আপনার জন্যে সুবিধে।”

“কি বোঝাতে চাচ্ছেন?”

“অ্যালিসিয়া আপনার গ্যালারি ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছিল, এটা যদি কেউ না জানে তাহলে তার ছবিগুলো যতদিন ইচ্ছে নিজের কাছে রাখতে পারবেন আপনি।”

“আমাকে কিসের জন্যে দোষারোপ করছেন, বুঝতে পারছি না।”

“আপনাকে মোটেও দোষারোপ করছি না আমি। যা সত্য সেটাই বলছি কেবল।”

হাসলো জিন-ফিলিক্স। “সেটা দেখা যাবে। আমি আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলবো। আপনার নামে গোপনে লিখিত অভিযোগও করবো।”

“আমার মনে হয় না আপনার সেরকম কিছু করা উচিত হবে।”

“কেন?”

“কারণ এখনও আমি বলিনি যে অ্যালিসিয়ার গ্যালারি ছেড়ে দেয়ার কথাটা কিভাবে জেনেছি আমি।”

“আপনাকে যে-ই কথাটা বলে থাকুক না কেন, ভুল বলেছে।”

“অ্যালিসিয়া ভুল বলেছে?”

“কিহ?” কয়েক মুহূর্তের জন্যে একদম থমকে গেল জিন-ফিলিক্স।

“মানে...মানে ও কথা বলেছে?”

“অনেকটা সেরকমই । আমাকে অ্যালিসিয়া তার ডায়েরিটা পড়তে দিয়েছেন ।”

“ওর... ডায়েরি?” কয়েকবার চোখ পিটপিট করলো সে, যেন তথ্যটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে । “অ্যালিসিয়া ডায়েরি লেখে, এটা তো জানতাম না ।”

“ডায়েরি তো ব্যক্তিগত জিনিস, এ ব্যাপারে না জানাটাই স্বাভাবিক । গ্যাব্রিয়েল মারা যাবার আগ দিয়ে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে আপনাদের, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত লেখেছে সে ডায়েরিতে ।”

ইচ্ছে করেই আর কিছু বললাম না । আসলে বলার দরকারও ছিল না । পরিস্থিতি কিছুটা গুমোট হয়ে উঠেছে । জিন-ফিলিক্স একদম চুপ ।

“আপনার সাথে শিঘ্রই যোগাযোগ করব আমি ।” একবার হেসে বেরিয়ে এলাম গ্যালারি থেকে ।

সোহো স্ট্রিটে ওঠার পর জিন-ফিলিক্সের সাথে ওভাবে কথা বলার জন্যে কিছুটা খারাপই লাগলো । কিন্তু কাজটা ইচ্ছে করেই করেছি আমি । আসলে দেখতে চাইছিলাম যে কথাগুলো শোনার পর তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় । কিছু একটা তো নিশ্চয়ই করবে সে ।

এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে ।

হাঁটতে হাঁটতেই অ্যালিসিয়ার ফুপাতো ভাই পল রোজের নম্বরে ফোন দিয়ে দিলাম । তাদের বাসাতেই যাচ্ছি আমি । গতবার হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যেরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি হোক সেটা চাই না । মাথার পেছনে এখনও হাত দিলে ব্যথা করে ।

কাঁধ দিয়ে ফোন চেপে ধরে একটা সিগারেট মুখে দিলাম । সবে একবার টান দিয়েছি এমন সময় ফোন ধরলো কেউ । মনে মনে আশা করছিলাম যাতে লিডিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে না হয় । প্রার্থনাটা কাজে দিল ।

“হ্যালো?”

“পল, আমি থিও ফেবার বলছি ।”

“ওহ, কি খবর? মা ঘুমোচ্ছে তো, তাই এভাবে ফিসফিসিয়ে কথা বলছি । আপনার মাথার ব্যথাটা কমেছে?”

“হ্যাঁ, আগের চেয়ে অনেক কম এখন ।”

“বেশ, বেশ । হঠাৎ ফোন দিলেন যে?”

“আসলে, অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে নতুন কিছু তথ্য শুনেছি। সেগুলো নিয়েই আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।”

“কী রকম তথ্য?”

অ্যালিসিয়ার ডায়েরির ব্যাপারে তাকে জানালাম।

“ও ডায়েরি লিখতো? এটা তো জানতাম না। কি লেখা সেখানে?”

“সামনাসামনি কথা বললেই ভালো হবে। আজকে কি সময় দিতে পারবেন?”

“আজকে বাড়িতে আপনি না এলেই ভালো,” কিছুক্ষণ পর দ্বিধামাখা কণ্ঠে বলল পল। “মা’র মেজাজ আসলে...ভালো না। তাছাড়া আপনাকে গতবার দেখে রেগে গিয়েছিল ভীষণ।”

“হ্যাঁ, আমিও সেটাই ভাবছিলাম।”

“আমাদের বাড়ির রাস্তার শেষ মাথার একটা পাব আছে। দ্য হোয়াইট বিয়ার

“মনে আছে আমার। সেখানেই দেখা করি নাহয়। কখন আসবো?”

“পাঁচটা নাগাদ? তখন কিছুক্ষণের জন্যে বের হতে পারবো মনে হয়।”

এ সময় লিডিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ঘুম ভেঙে গেছে মহিলার।

“রাখছি এখন। বিকেলে দেখা হবে।” ফোন কেটে দিল পল।

কয়েক ঘন্টা পর রওনা দিলাম ক্যামব্রিজের উদ্দেশ্যে। কিছুদূর আসার পর পকেট থেকে ফোনটা বের করি, ম্যাক্স বেরেনসনকে ফোন দেয়াটা ঠিক হবে কি না ভাবছি। ইতোমধ্যে একবার ডায়োমেডেসের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে সে। সুতরাং আমার কণ্ঠস্বর শুনে খুশি হবে না, এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আর কোন উপায় নেই।

তানিয়া ধরলো ফোনটা। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা কিছুটা কমেছে। কিন্তু আমাকে চেনামাত্র কথা বলার সুর পাল্টে গেল তার। “আমার মনে হয় না...মানে, ম্যাক্স একটু ব্যস্ত। বেশ কয়েকটা মিটিং আছে আজকে।”

“তাহলে পরে ফোন দেব।”

“আসলে সেটা উচিৎ হবে কি না। আমি-”

ম্যাক্সের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এসময়। তানিয়ার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলছে সে। “আমি ফোনে এসব বলতে পারবো না”-কথাটা ম্যাক্সকে বলল তানিয়া।

একরকম বাধ্য হয়েই তাই ফোন হাতে নিল ম্যাক্স। “জাহান্নামে যান, তানিয়াকে এটাই বলতে বলেছি।”

“আপনার সাহস তো কম না। আমি প্রফেসরকে ফোন করে একবার জানিয়েছি, তাও আপনি...”

“হ্যাঁ, সে বিষয়ে অবগত আমি। কিন্তু নতুন কিছু তথ্য হাতে এসেছে আমার, সেগুলোর সাথে আপনিও জড়িত। তাই ফোন না দিয়ে পারলাম না।”

“মানে? কি জেনেছেন? কোথা থেকে জেনেছেন?”

“অ্যালিসিয়ার ডায়েরি পড়েছি আমি। গ্যাব্রিয়েলের হত্যাকাণ্ডের আগের দিনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আছে সেখানে।”

এবারে আর কিছু বলল না ম্যাক্স।

“সেখানে আপনাকে নিয়ে কিন্তু বেশ বিস্তারিতই লিখেছে অ্যালিসিয়া। এটাও বলেছে যে তাকে ভালোবাসার কথা স্বীকার করেছিলেন আপনি। ভাবছিলাম-”।

কেটে গেলো লাইন। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছে। টোপটা গিলেছে ম্যাক্স। এবারে শুধু দেখতে হবে যে তার প্রতিক্রিয়া কি হয়।

মিথ্যে বলবো না, ম্যাক্সকে আসলে একটু ভয়ই পাই আমি। ঠিক যেমন তানিয়া তাকে ভয় পায়। তবে তানিয়া সেদিন আমাকে পলকে যে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, সেটা করা হয়নি এখন পর্যন্ত। অ্যালিসিয়ার মায়ের দুর্ঘটনার পরের দিন কিছু একটা ঘটেছিল, এ বিষয়ে আমাকে আরো কিছু বলবে সে এমন সময় ম্যাক্স উপস্থিত হয় সেখানে। তখন হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে যায় তানিয়া। নাহ, ম্যাক্স বেরেনসনকে খাটো করে দেখাটা উচিৎ হবে না।

খুব বড় একটা ভুল হবে সেটা।

ট্রেন লন্ডন ছেড়ে আসার কিছুক্ষণ পর থেকেই দৃশ্যপট পাল্টে যেতে লাগলো। এখন আর বড় বড় দালানকোঠা তেমন একটা চোখে পড়ছে না। সেই তাপমাত্রাও কমে গেছে অনেকখানি। স্টেশন থেকে বের হওয়ার সময় কোটের কলার তুলে দিলাম। শীতল বাতাস ছুরির ফলার মত এসে বিঁধছে গালে। এর মধ্যেই পলের সাথে দেখা করার জন্যে পাবটার দিকে পা বাড়ালাম।

দ্য হোয়াইট বিয়ার বেশ পুরনো, কয়েকবার সংস্করণ করা হয়েছে নিশ্চয়ই। তবুও প্রাচীন ভাবটা যায়নি। দুই তরুণ এই ঠাণ্ডার মধ্যেই পাবের বাইরের টেবিলে বসে আছে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে, রক্ত গরম থাকলে যা হয় আর কি। হাতে সিগারেটও আছে। পাবের ভেতরটা বাইরের তুলনায় বেশ গরম। একপাশে গনগন করে আগুন

জ্বলছে আদিকালের ফায়ারপ্লেসে, আরামদায়ক এই উষ্ণতার উৎস।

একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে আশপাশে তাকালাম পলের খোঁজে। বেশ কয়েকটা ছোট ছোট কেবিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে, একদম কোণার দিকে মূল বার কাউন্টার। আলো কম হওয়ায় অন্যদের চেহারা আসলে ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে না। গোপনে কারো সাথে দেখা করার জন্যে একদম আদর্শ জায়গা।

অবশেষে একটা কেবিনে খুঁজে পেলাম পলকে। জায়গাটা ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি হওয়ায় বেশ গরম। তবে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসার কারণে তার চেহারাটা এখনও দেখতে পাচ্ছি না। তাকে চেনার জন্যে অবশ্য চেহারা দেখার কোন দরকার নেই। বিশাল দেহটাই যথেষ্ট।

“পল?”

চমকে উঠে ঘুরে তাকালো সে। ছোট কেবিনটায় বেমানান লাগছে তাকে।

“ঠিক আছেন?” চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খারাপ খবর শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। চেপে আমার জন্যে জায়গা করে দিল। আগুনের কাছাকাছি কেবিনটা বেছে নেয়ার কারণে তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

“লন্ডনের থেকে এখানে ঠাণ্ডা অনেক বেশি।”

“সরাসরি সাইবেরিয়া থেকে বাতাস আসে এখানে,” পল বলল। “ডায়েরির ব্যাপারে যেন কী বলছিলেন ফোনে?” আর তর সইছে না তার। “অ্যালিসিয়া ডায়েরি লিখতো এটা জানতাম না আমি।”

“না জানারই কথা।”

“সেটা আপনাকে পড়তে দিয়েছে?”

মাথা নেড়ে সাই জানালাম।

“কী লেখা সেখানে?”

“আপনাদের শেষ যেবার দেখা হয়েছিল, সেসম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছে অ্যালিসিয়া। হত্যাকাণ্ডের দু’মাস আগের ঘটনা। কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়েছে আমার।”

“কী রকম অসঙ্গতি?”

“আপনি আমাকে যা বলেছিলেন তার সাথে অ্যালিসিয়ার ডায়েরির লেখার মিল নেই।”

“কি বলছেন এসব?” হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকালো পল।

“এই যেমন আপনি বলেছিলেন হত্যাকাণ্ডের আগে বেশ কয়েক বছর আপনার সাথে দেখা হয়নি অ্যালিসিয়ার।”

“তাই বলেছিলাম নাকি?” পলের কণ্ঠে দ্বিধা।

“আর ডায়েরিতে অ্যালিসিয়া লিখেছে গ্যাব্রিয়েল মারা যাবার কয়েক সপ্তাহ আগে আপনাদের দেখা হয়েছে। আপনি নাকি তার বাসায় গিয়েছিলেন।”

দৃশ্যতই চুপসে গেল পল। এখন মনে হচ্ছে চুরি করে ধরা পড়ে গেছে এমন কোন বাচ্চা ছেলের সামনে বসে আছি। ভয় পেয়েছে সে, এটা পরিষ্কার। বেশ কিছুক্ষণ কিছু বলল না সে। মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে।

“আমি কি একবার ডায়েরিটা দেখতে পারি?”

মাথা ঝাঁকালাম জবাবে। “না। সেটা উচিত হবে না বোধহয়। তাছাড়া সাথে করে নিয়েও আসিনি আমি।”

“তাহলে আমি কি করে বিশ্বাস করবো, আপনি সত্যিটাই বলছেন?”

“মিথ্যে বলার কোন কারণ আমার নেই, পল। কিন্তু আপনি আমাকে মিথ্যে বলেছেন, কেন?”

“সেসবের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, এজন্যে বলিনি।”

“সম্পর্ক নেই কথাটা ভুল বললেন। অ্যালিসিয়ার ব্যাপারে সবকিছু জানা দরকার আমার। আমি তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছি।”

“কিন্তু ওর সুস্থ হবার সাথেও তো এসবের কোন লেনদেন নেই। আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি।”

“আমি কিন্তু বলিনি যে আপনি তার ক্ষতি করেছেন।”

“তাহলে?”

“আপনিই নাহয় পুরোটা খুলে বলুন।”

কাঁধ ঝাঁকালো পল। “লম্বা কাহিনী।” বলবে কি বলবে না এটা নিয়ে কিছুক্ষণ দোটানায় ভুগে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেললো শেষমেষ। খুব দ্রুত কথা বলতে শুরু করলো এরপর। এতদিন চেপে রাখা কথাগুলো কাউকে বলতে পেরে যে শান্তি পাচ্ছে সে, তা বুঝতে পারছি। “খুব বাজে একটা সমস্যায় ফেঁসে গিয়েছিলাম। জুয়া

খেয়ালার বদভ্যাস আছে আমার। সে কারণেই অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছি বিভিন্ন সময়ে। তাদের একজন এমনভাবে চাপ দিতে শুরু করে যে নগদ কিছু না দিলে হচ্ছিলোই না।”

“তাই অ্যালিসিয়ার কাছে টাকা চেয়েছিলেন? দিয়েছিল সে কিছু?”

“ডায়েরিতে কি লেখা?”

“কিছু লেখা নেই এ ব্যাপারে।”

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালো পল। “না, দেয়নি। বলেছিল ওর কাছে টাকা নেই।”

আবারো মুখের ওপরে মিথ্যে বলল সে। কেন?

“তাহলে টাকাটা কিভাবে জোগাড় করেছিলেন?”

“আমি-আমি আমাদের সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু টাকা তুলি। দয়া করে কথাটা কাউকে বলবেন না, মা জানতে পারলে তুলকালাম বাধিয়ে দিবে।”

“লিডিয়াকে এসবে জড়ানোর কোন প্রয়োজন দেখছি না।”

“আসলেই?” মুখে রঙ ফিরলো পলের। আগের চেয়ে স্বস্তিবোধ করছে এখন।
“অনেক ধন্যবাদ।”

“অ্যালিসিয়া কি কখনো আপনাকে এ ধরনের কিছু বলেছিল যে কেউ নজর রাখছে তার ওপরে?”

গ্লাস নামিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো পল। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এরকম কিছু শোনেনি।

অ্যালিসিয়ার সন্দেহের ব্যাপারে বিস্তারিত সবকিছু তাকে খুলে বললাম।

মাথা ঝাঁকালো পল। “ওর মাথায় একটু সমস্যা ছিল আগে থেকেই।”

“আপনার ধারণা পুরোটাই ওর কল্পনা?”

“সেরকমটা হবার সম্ভাবনাই তো বেশি, তাই না?” পল কাধ নাচিয়ে বলল।
“আপনার কি মনে হয়? পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না অবশ্য সম্ভাবনাটা, কেউ হয়তো আসলেই-”।

“-নজর রাখছিল তার ওপরে,” পলের মুখের কথা টেনে নিয়ে বলি। “আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি তাহলে।”

“নাহ। আসলে অ্যালিসিয়া আর আমার কখনোই খুব বেশি কথা হতো না।

চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করতো ও। আমাদের পরিবারটাই অমন ছিল। অ্যালিসিয়া প্রায়ই বলতো, অন্যান্য বাসাবাড়িতে পরিবারের সবাই হাসিঠাট্টা করে, কথা বলে। কিন্তু আমাদের বাসায় কখনো অমনটা হতো না, এটা অদ্ভুত লাগতো তার কাছে। মা শুধু একের পর এক আদেশ দিয়ে যেত, আর আমরা অন্ধরে অন্ধরে পালন করতাম।”

“আর অ্যালিসার বাবা? ভার্নন? তিনি কেমন ছিলেন?”

“ভার্ননও খুব বেশি কথা বলতো না। ইভা মারা যাবার পর থেকেই একটু অন্যরকম হয়ে যায় সে। অ্যালিসিয়ার ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য।”

“ওহ, একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বারবার ভুলে যাই। তানিয়া বলেছিল কথাটা।”

“তানিয়া বেরেনসন? তার সাথে কথা হয়েছে আপনার?”

“খুব সামান্য। সে-ই আমাকে বলে আপনার সাথে কথা বলতে।”

“তাই?” লাল হয়ে গেছে পলের গাল। “আমি...আমি আসলে খুব ভালো করে চিনি না তাকে। কিন্তু যতবার দেখা হয়েছে খুব ভালো ব্যবহার করেছে আমার সাথে। খুব ভালো মানুষ। দু’বার আমাদের বাসাতেও এসেছিল।” হাসি ফুটেছে পলের মুখে।

তানিয়ার প্রেমে পড়েছে পল, ভাবলাম। ম্যাক্স বিষয়টাকে কিভাবে নেবে কে জানে।

“তানিয়া কী বলেছে?”

“বলছিল, আপনাকে অ্যালিসিয়ার মায়ের দুর্ঘটনার পরের দিনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। বিস্তারিত শোনার সুযোগ পাইনি।”

“ওহ, আমি জানি কি বলতে চেয়েছিল তানিয়া। আসলে ঘটনাটা বিচার চলাকালীন সময়ে আমিই বলেছিলাম তাকে। সেই সাথে কাউকে বলতে নিষেধ করে দেই।”

“সেজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে। তবে বলবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত আপনার। না বলতে চাইলে...”

এক চুমুকে গ্লাস খালি করে ফেললো পল। “আসলে ওরকম কিছু না। কিন্তু অ্যালিসিয়াকে বুঝতে হয়তো সুবিধে হবে আপনার। ও...” চুপ হয়ে গেল সে।

“বলুন।”

“অ্যালিসিয়া...দুর্ঘটনার পরদিন হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরার পর ছাদে চলে যায় সে। আমিও যাই ওর পিছু পিছু। সারা রাত সেখানেই ছিলাম। ছোট থাকতেও এমনটা করতাম আমরা।”

“ছাদে গিয়ে বসে থাকতেন?”

দ্বিধা ভর করলো পলের চেহারায়। আমার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে কিছুক্ষণ। এরপর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

“চলুন,” উঠে দাঁড়াল সে। “আপনাকে দেখাই।”

আমরা পৌঁছে দেখি পুরো বাড়ি অন্ধকার।

“আসুন আমার সাথে,” পল বলে ফিসফিস করে।

বাড়ির এক পাশে লোহার পুরনো মই লাগানো। জমে যাওয়া কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে সেদিকে এগিয়ে গেলাম দুজনে। আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই মই বেয়ে উঠতে শুরু করলো পল।

খুব বেশি ঠাণ্ডা লাগছে এখন। এরকম সময়ে ছাদে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। তবুও মইয়ে পা রাখলাম। তুষারের কারণে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। ছাদে পৌঁছাতে পৌঁছাতে হাতের আঙুলগুলো রীতিমত অবশ হয়ে গেল, বরফ শীতল বাতাসের ঝাঁপটা তো আছেই। কিশোরসুলভ হাসি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল পল। আকাশে এক টুকরো বাঁকা চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে মাঝেমাঝে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। আলো বলতে ওটুকুই।

হঠাৎ আমার দিকে পলকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে যাই। হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেয় সে। ভেবেছিলাম ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলেই দিবে বুঝি। ডানদিকে ঘুরে যাই সাথে সাথে, কিন্তু শক্ত করে আমাকে ধরে ফেলে পল।

“বেশি কিনারায় যাবেন না, মাঝে থাকুন,” বলে সে।

মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। আসলে হুট করে এখানে আসাটা একদমই উচিৎ হয়নি আমার। পলের আশপাশে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছি না কিছুতেই। নিচে নামার কথা বলবো এমন সময় পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে সাধলো সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সিগারেট মুখে দিয়ে জ্বালবার সময় আঙুলগুলো কাঁপছিল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানলাম দুজনে।

“এখানেই বসতাম আমরা। আমি আর অ্যালিসিয়া। প্রায় প্রতিদিন।”

“আপনাদের বয়স কেমন ছিল তখন?”

“আমার আট, অ্যালিসিয়ার দশ।”

“তাহলে তো মই বেয়ে ছাদে ওঠাটা বিপজ্জনক ছিল।”

“হয়তো। কিন্তু তখন আমাদের কাছে সেরকম কিছু মনে হতো না। বয়স একটু বাড়ার পর এখানে বসে লুকিয়ে সিগারেট খেতাম আর ড্রিঙ্ক করতাম আমরা।”

কিশোরী অ্যালিসিয়ার চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। বাবা আর বিরক্তিকর ফুপির কাছ থেকে লুকিয়ে ছোট ভাইয়ের সাথে এখানে বসে থাকতো সে। হয়তো একা একা সময় কাটানোর জন্যে ছাদে আসতো, কিন্তু পলের জন্যে সেটা সম্ভব হতো না।

“লুকোনোর জন্যে জায়গাটা আদর্শ,” বললাম।

মাথা নাড়লো পল। “ভার্নন মামা মই বেয়ে ওপরে উঠতে পারতো না, ওজনের কারণে।”

“আমারই তো কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ওই গাছটার পাতাগুলোর কারণে কিন্তু পা পিছলে যায়। একদম মইয়ের সাথে লেগে থাকে।”

“জুই গাছ, সবুজ পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল পল। “বসন্তে ফুল ফুটবে। খুব সুন্দর ঘ্রাণ।” এক মুহূর্তের জন্যে স্মৃতির দেশে হারিয়ে গেল সে। “কেমন যেন...”

“কি কেমন যেন?”

“কিছু না,” কাঁধ নাচালো পল। “উঁই গাছটা নিয়েই ভাবছিলাম। অ্যালিসিয়ার মা, ইভা যখন মারা যায়, গাছভর্তি ফুল ছিল তখন।”

তার দিকে তাকালাম। “আপনি আর অ্যালিসিয়া পরদিন এখানে এসেছিলেন, তাই না?”

মাথা নেড়ে সাই জানালো পল। “মা আর ভার্নন মামা আমাদের খুঁজছিল। তাদের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু জবাব দেইনি। লুকিয়েই থাকি এখানে। ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটে।”

সিগারেট ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা হাসি দিল পল। “সেজন্যেই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আপনি তাহলে ক্রাইম সিনটা দেখতে পাবেন।”

“ক্রাইম সিন?”

জবাব দিল না পল, এখনও হাসছে।

“কিসের কথা বলছেন, পল?”

“আমার চোখে ভার্নন মামা সেদিন থেকেই অপরাধী, জানেন? তাকে কোনভাবেই ভালো মানুষ বলা যাবে না।”

পলের হেঁয়ালি কথাবার্তা মাথায় ঢুকছে না।

“অপরাধী?”

“সেদিন রাতেই কাজটা করেছিল মামা।”

“কোন কাজ?”

“অ্যালিসিয়াকে খুন করেছিল।”

মনে হলো যেন ভুল শুনছি। “অ্যালিসিয়াকে খুন করেছিল? মাথা ঠিক আছে তো আপনার?”

জবাবে উঠোনের দিকে দেখালো পল। “মা’র সাথে সেদিন ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল ভার্নন মামা। গলা পর্যন্ত মদ গিলেছিল। মা বারবার চেষ্টা করছিল তাকে ভেতরে নিয়ে যেতে, কিন্তু পারেনি। অ্যালিসিয়ার উদ্দেশ্যে চেষ্টাচ্ছিল মামা। খুব রেগে ছিল ওর ওপরে।”

“অ্যালিসিয়া লুকিয়ে ছিল সেজন্যে? কিন্তু আগের দিন যে বাচ্চা মেয়েটার মা মারা গেছে, সে তো এমন করতেই পারে।”

“বললাম না, ভার্নন মামা মানুষ ভাল ছিল না। ইভা মামীই ছিল তার জীবনের সবকিছু, ব্যস। সেজন্যেই কাজটা করেছিল।”

“কি করেছিল?” ধৈর্য্য সামাল দেয়া কষ্টকর হয়ে উঠছে ক্রমশই। “একটু পরিস্কার করে বলুন সবকিছু।”

“ইভা মামীকে কতটা ভালোবাসে এসব বলছিল বারবার চিৎকার করে। “কেন মারা গেল ইভা? কেন? ওর জায়গায় অ্যালিসিয়া কেন মরলো না?”

ভাষা হারিয়ে ফেললাম কিছুক্ষণের জন্যে। “ওর জায়গায় অ্যালিসিয়া কেন মরলো না?”

“হ্যাঁ, এটাই বলেছিল সেদিন।”

“আর এখান থেকে সব শুনতে পায় অ্যালিসিয়া?”

“হ্যাঁ। এরপর আমার উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে অ্যালিসিয়া যে কথাটা বলে, সেটা আমি কখনো ভুলবো না। এর চেয়ে বাবা আমাকে খুন করতো।”

এ মুহূর্তে বিস্ফোরিত নয়নে পলের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। এরকম একটা কথা শোনার পর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

তবে আমি যা খুঁজছিলাম এতদিন, তা পেয়ে গেছি। ধাঁধার শেষ সূত্রটা।

লন্ডনে ফেরার পথে গোটা সময় পলের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো নিয়ে ভাবলাম। এখন বুঝতে পারছি, কেন অ্যালসেস্টিস নাটকটা দেখে এতটা প্রভাবিত হয়েছিল অ্যালিসিয়া। সেখানে অ্যাডমেতাস যেমন অ্যালসেস্টিসকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তেমনি দুর্ঘটনায় ইভা মারা যাবার পর ভার্নন রোজও অ্যালিসিয়াকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর পথে। তবে পার্থক্যটা হলো অ্যালিসিয়ার মৃত্যুটা মানসিক। আর অ্যাডমেতাস একটু হলেও ভালোবাসতো অ্যালসেস্টিসকে। কিন্তু ভার্নন রোজের ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য নয়। ঠিকই বলেছে পল, সেদিন রাতে আসলেও খুন করেছিল লোকটা

‘এর চেয়ে বাবা আমাকে খুন করতো’-কতটা কষ্ট পেলে একজন মানুষ একথা বলে?

এতদিনে ধাঁধার টুকরোগুলো ঠিক জায়গামত বসে যাচ্ছে। ছোটবেলায় এরকম মানসিক আঘাত ভবিষ্যতে যে কারো মানসিকতায় বিস্তর প্রভাব ফেলে-এটা খুব ভালো করেই জানা আছে আমার। চিন্তা করে দেখুন বিষয়টা, আপনার নিজের বাবা বলছে যে আপনি মারা গেলেই তিনি খুশি হতেন। এরকম নিদারুণ মানসিক আঘাত ভাষায় প্রকাশ করা কোনভাবেই সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে। এ কথা শুনে নিজের আত্মমর্যাদা চৌচির হয়ে যাবে যে কারো, আর অ্যালিসিয়া তখন নেহায়েতই একজন কিশোরী। কষ্টটা গিলে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার। কিন্তু এরকম গ্লানি বা ক্রোধ ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। পরিণত বয়সে ঠিকই কোন না কোন কাজের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। অ্যালিসিয়ার ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে। তবে তার প্রতিশোধের আগুনের শিকার হয়েছে গ্যাব্রিয়েল বেরেনসন, যে লোকটাকে ভালোবাসতো সে, যার প্রতি নিজের জীবন সঁপে দিয়েছিল।

যখন গ্যাব্রিয়েলের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে পাঁচবার গুলি চালায় অ্যালিসিয়া, তখন কিন্তু কারণটা জানা ছিল না তার। অজান্তেই কাজটা করে

আঁধার কেটে লন্ডনের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন। অবশেষে, ভাবলাম, অবশেষে আমি জানতে পেরেছি কিভাবে অ্যালিসিয়ার নাগাল পাবো।

এবারে আসল কাজ শুরু করা যাবে।

চুপচাপ অ্যালিসিয়ার সামনে বসে আছি।

ইদানীং আর এই নীরবতাটুকু আগের মত অসহ্য লাগে না। মানুষের স্বভাবই এমন, সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিতে পারে। সত্যি বলতে ছোট ঘরটায় অ্যালিসিয়ার মুখোমুখি দীর্ঘ সময় বসে থাকাটা স্বাভাবিকই মনে হয় এখন।

নির্দিষ্ট ছন্দে হাতের মুঠো একবার খুলছে আবার বন্ধ করছে অ্যালিসিয়া, অনেকটা হৃৎস্পন্দনের মত। আমার দিকে ঘুরে থাকলেও তার দৃষ্টি জানালার বাইরে। বৃষ্টি থেমেছে কিছুক্ষণ আগে। মেঘ সরে গিয়ে বিবর্ণ আকাশ দেখা যাচ্ছে অল্পসময়ের জন্যে, আবার কিছুক্ষণ পর সেটুকুও ঢাকা পড়ছে।

“আপনার ফুপাতো ভাইয়ের কাছ থেকে একটা ঘটনার কথা জানতে পেরেছি।”

যতটা সম্ভব নরম সুরে বললাম কথাটা। অ্যালিসিয়া কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না, তাই কথা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

“পল বলেছে যে আপনার মা মারা যাবার পরদিন খুব খারাপ একটা কথা বলেছিলেন মি, ভার্নন রোজ। উত্তেজিত অবস্থায় এক পর্যায়ে আপনার মৃত্যু কামনা করেছিলেন তিনি।”

ভেবেছিলাম কথাটা শোনার পর হয়তো কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে অ্যালিসিয়া, কিন্তু সেরকম কিছু হলো না।

“আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, পল এই কথাটা আমাকে জানিয়ে ঠিক করেনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে সাহায্য করার আশাতেই তার সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম।”

এবারেও মুখ খুলল না অ্যালিসিয়া।

“আপনার একটা বিষয় জানা উচিত, তাহলে বোধহয় বুঝতে সুবিধা হবে। সত্যটা হচ্ছে, আমি আপনার পরিস্থিতি খুব ভালো করেই অনুধাবন করতে পারছি। কারণ ছোটবেলায় আমাকেও একই রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আমরা দুজনেই অল্প বয়সে বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু খুব শিঘ্রই আবিষ্কার করতে হয়েছে যে ওভাবে ছুটে পালানোই সব সমস্যার সমাধান নয়। কিছু কিছু

ব্যাপার চাইলেও ভোলা যায় না। আপনার শৈশব কতটা কঠিন কেটেছে তা জানি আমি। ব্যাপারটার গুরুত্ব আপনাকে বুঝতে হবে। আপনার বাবা মানসিকভাবে হত্যা করেছিলেন আপনাকে।”

এবারে প্রতিক্রিয়া দেখলাম তার মাঝে

মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো অ্যালিসিয়া। সম্ভব হলে দৃষ্টিবাণে সেখানেই ছারখার করে ফেলত। তবে চোখ সরিয়ে নিলাম না আমি। ওর খুনে দৃষ্টির দিকে নির্মোহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলাম।

“অ্যালিসিয়া। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ। প্রফেসর ডায়োমেডেস জানেন না, আমি এখানে এসেছি। এভাবে যদি একের পর এক নিয়ম ভাঙতে থাকি তাহলে চাকরি হারাতে হবে। সেজন্যেই আজকের পরে আমাদের আর দেখা হবে না। বুঝতে পারছেন কি বলছি?”

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে দেখেই কথাগুলো বললাম। অ্যালিসিয়ার কাছ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাবার আশায় নয়। আসলে কানাগলিতে ঘুরপাক খেতে খেতে অতিষ্ঠ আমি। কিন্তু এসময়...

প্রথমে ভাবলাম হয়তো কল্পনা করছি বা ভুলভাল শুনছি। অবাক চোখে তাকাই অ্যালিসিয়ার দিকে। বুকের ভেতরে কেউ হাতুড়িপেটা করছে। মুখ শুকিয়ে কাঠ।

“আপনি-আপনি কি...কিছু বললেন?”

আবারো নীরবতা নেমে আসলো ঘরটায়। নিঃসন্দেহে ভুল হয়েছে আমার। পুরোটাই কল্পনা করেছি। কিন্তু তখনই...আবারো ঘটলো ব্যাপারটা।

খুব ধীরে ধীরে নড়ছে অ্যালিসিয়ার ঠোঁট, যেন কথা বলতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে।

“কি...” ফিসফিসিয়ে বলল সে। এরপর চুপ করে থাকলে কিছুক্ষণ। “কি..কি-”

কয়েক মুহূর্ত একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম দু’জন। আমার চোখ ভিজে উঠেছে। এই অশ্রু অবিশ্বাসের, কষ্টের আর কৃতজ্ঞতার।

“কি চাই আমি? আমি চাই আপনি কথা বলুন...আমার সাথে কথা বলুন, অ্যালিসিয়া-”।

আমার দিকে তাকিয়েই রইলো অ্যালিসিয়া। কিছু একটা ভাবছে। এরপর সিদ্ধান্তটা নিয়েই নিল।

“ঠিক আছে,” খুব ধীরে মাথা নেড়ে বলল সে।

“কী বলেছে?”

বিস্ফোরিত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর ডায়োমেডেস। ক্লিনিকের বাইরে একসাথে ধূমপান করতে বেরিয়েছিলাম আমরা। তিনি যে যারপরনাই বিস্মিত, সেটা হাত থেকে চুরুট পড়ে যেতে দেখেই বুঝেছি। উত্তেজনায় রীতিমত টগবগ করে ফুটছেন। “কথা বলেছে সে? অ্যালিসিয়া আসলেও কথা বলেছে?”

“হ্যাঁ।”

“অসাধারণ! তাহলে তুমি ঠিকই ছিলে। ভুলটা হয়েছে আমার।”

“আরে নাহ, এভাবে বলবেন না। আপনার অনুমতি ছাড়া অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করাটা আমার উচিত হয়নি, প্রফেসর। মাফ করবেন। কেন যেন মনে হচ্ছিল-”

হাত নেড়ে আমার কথা উড়িয়ে দেন ডায়োমেডেস। “তোমার মন যেটা বলছিল, সেটাই করেছে। আমি হলেও এরকমটাই করতাম, থিও। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস থাকাটাই সবথেকে জরুরি।”

এই অগ্রগতিকেই বিজয় ধরে নিতে রাজি নয় আমি। “আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হয়নি। এটা ঠিক যে অ্যালিসিয়ার কথা বলাটা আসলেও বিশাল একটা অগ্রগতি। কিন্তু এই নিশ্চয়তা এখনও দেয়া সম্ভব নয় যে সে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না।”

মাথা নেড়ে আমার কথার সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ডায়োমেডেস। “ঠিক বলেছো। আমাদের অতিসত্বর একটা ফর্মাল রিভিউয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। এছাড়া জুলিয়ানের মত ট্রাস্টের কাউকে প্যানেলে নিয়ে অ্যালিসিয়ার সাথে যদি একটা বৈঠকের আয়োজন করা যায়, যেখানে-”

“একটু বেশি তাড়াতাড়িই সব ভেবে ফেলছেন, প্রফেসর। আমরা আরেকটু অপেক্ষা করে দেখি। এরপর নাহয় ঘোষণা দেয়ার কথা ভাববো। আপাতত ধৈর্য ধরা যাক।”

মাথা নাড়লেন ডায়োমেডেস। আমার কথা বুঝতে পারছেন। “সাক্ষাৎ থিও, তোমাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার,” কাঁধে হাত রেখে একদম মন থেকে বললেন কিছুক্ষণ পর।

একজন বাবা তার ছেলেকে বাহবা দিলে যেরকম গর্ব অনুভব হয়, আমরা সেরকমই লাগছে এখন। আসলে অবচেতন মনে আমি নিজেও চাচ্ছিলাম আমার

কাজের মাধ্যমে ডায়োমেডেসকে খুশি করতে, তার আস্থার প্রতিদান দিতে। তাই কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। সেটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালাম। “এখন কি করবো?”

“যা করছে সেটা চালিয়ে যাবে। নিয়মিত দেখা করবে অ্যালিসিয়ার সাথে।”

“আর যদি স্টেফানি জানতে পারে?”

“স্টেফানিকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, ওকে আমি সামলাবো। এখন তোমার একমাত্র লক্ষ্য অ্যালিসিয়া। সেদিকেই মনোযোগ দাও।”

গুরুর আদেশ শিরোধার্য।

পরবর্তী সেশনে অ্যালিসিয়ার সাথে অনর্গল কথা বললাম। আসলে, অ্যালিসিয়াই বলেছে যা বলার, আমি কেবল শুনে গেছি। এতদিনের মৌনতার পর অ্যালিসিয়ার মুখ থেকে কথা শুনতে আসলেও অদ্ভুত লাগছিল। প্রথমদিকে একটু ইতস্ততবোধ করলেও ধীরে ধীরে জড়তা একদম কেটে যায় তার। শুনলে মনেই হবে না, এই মানুষটাই এতদিন চুপ করে ছিল। অবশ্য এক অর্থে, মুখ কখনোই বন্ধ করেনি সে।

সেশন শেষে আমার অফিসে ফিরে এলাম। ডেস্কে বসে অ্যালিসিয়ার কাছ থেকে সদ্য শোনা কথাগুলো দ্রুত লিখে ফেললাম, যাতে পরে ভুলে না যাই। চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে সবকিছু লিখতে।

গল্পটা যে অসাধারণ, সেটা নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনারা নিজেরাও সেটা বুঝতে পারবেন।

তবে বিশ্বাস করা না করা আপনাদের মর্জি।

থেরাপি রুমে আমার মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে আছে অ্যালিসিয়া।

“শুরু করার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। কিছু বিষয় এখনও পরিষ্কার হয়নি...”

কোন জবাব দিল অ্যালিসিয়া। সেই অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

“আসলে, আমি আপনার এই দীর্ঘদিন মুখ বন্ধ রাখার ব্যাপারটা বুঝতে চাইছি। জানতে চাই যে কেন কথা বলা থামিয়ে দিয়েছিলেন।”

প্রশ্নটা শুনে দৃশ্যতই হতাশ মনে হলো অ্যালিসিয়াকে। জানালার দিকে মুখ ফেরালো সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দু'জন। উত্তর জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে অধীর হয়ে উঠলেও, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। তাহলে কি অ্যালিসিয়ার কথা বলাটা সাময়িক ছিল? এখন আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে সে? তা হতে দিতে পারি না আমি।

“অ্যালিসিয়া, আমি জানি ব্যাপারটা আপনার জন্যে কষ্টের। কিন্তু একবার যদি আমার সাথে এ বিষয়ে কথা বলা শুরু করেন, তাহলে দেখবেন অনেকটাই সহজ লাগছে, সত্যি।”

কোন উত্তর নেই।

“চেষ্টা করুন। প্লিজ। এতটা পথ পাড়ি দেয়ার পর হাল ছেড়ে দিবেন না। বলুন আমাকে...কেন কথা বলেননি এতদিন?”

শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল অ্যালিসিয়া। এরপর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল :

“কিছু...কিছু বলার নেই।”

“মাফ করবেন, আপনার এই কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। বলার মত কিছু না কিছু অবশ্যই আছে।”

আবারো বিরতি। কাঁধ নাচালো অ্যালিসিয়া। “হয়তো। হয়তো...ঠিকই বলছেন আপনি।”

“বলুন তাহলে।”

দ্বিধা ফুটলো অ্যালিসিয়ার চেহারায়ে। “য-যখন গ্যাব্রিয়েল মারা যায়...প্রথমে...আ-আমি কথা বলার চেষ্টা করি...কিন্তু পারিনি। মুখ খুলেছিলাম, কিন্তু কোন শব্দ বের হয়নি। অনেকটা স্বপ্নের মত... যেখানে চেষ্টা করেও চিৎকার করতে পারি না আমরা...”

“আপনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তখন। কিন্তু এর পরে তো কথা বলতে সমস্যা হবার কথা নয়, তাই না?”

“ততদিনে...অর্থহীন মনে হচ্ছিল সবকিছু। বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল।”

“দেরি হয়ে গিয়েছিল? আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা বলছেন?”

একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো অ্যালিসিয়া। তার মুখের হাসিটা দুর্বোধ্য ঠেকছে এখন। কোন কথা বলল না।

“আবারো কথা বলা শুরু করলেন কেন?”

“সেটার উত্তর তো আপনি জানেন।”

“আসলেই জানি কি?”

“আপনার জন্যে।”

“আমি?” বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে।

“আপনি এখানে এসেছেন বলেই...”

“তাতে কি আসলেও পরিস্থিতির কোন রদবদল হয়েছে?”

“হয়েছে, আলবত হয়েছে।” পরবর্তী কথাগুলো নিচুস্বরে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল অ্যালিসিয়া। “আমি চাই আপনি বুঝুন, আমার সাথে কী হয়েছিল, কেমন লেগেছিল। আপনার বোঝাটা জরুরি।”

“আমি আসলেও বুঝতে চাই। সেজন্যেই তো ডায়েরিটা দিয়েছিলেন, তাই না? যাতে আমি বুঝতে পারি। আপনার কাছের মানুষগুলো সেই লোকটার ব্যাপারে আপনার কথা বিশ্বাস করেনি। আপনি বোধহয় নিশ্চিত হতে চাইছিলেন...আমি আপনাকে বিশ্বাস করি কি না।”

“আপনি বিশ্বাস করেন।” সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, এই চিরন্তন সত্যটা সবাই যেভাবে বলে, সেভাবেই কথাটা বলল অ্যালিসিয়া।

মাথা নাড়লাম। “হ্যাঁ। আপনাকে বিশ্বাস করি আমি। তাহলে সেখান থেকেই শুরু করি নাহয়? ডায়েরির একদম শেষে লিখেছিলেন যে লোকটা আপনাদের বাসায় ঢুকে পড়েছে। এরপর কি হয়েছিল?”

“কিছু না।”

“কিছু না?”

মাথা ঝাঁকালো অ্যালিসিয়া। “ভুল ভেবেছিলাম আমি। অন্য একজন এসেছিল”

“কে?”

“জিন-ফিলিক্স। প্রদর্শনীর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিল সে।”

“আপনার ডায়েরির লেখাগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, তখন কারো সাথে কথা বলার মত অবস্থায় ছিলেন না আপনি।”

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো অ্যালিসিয়া।

“কতক্ষণ ছিল জিন-ফিলিক্স?”

“খুব বেশিক্ষণ না। ওকে চলে যেতে বলি আমি। কষ্ট পেয়েছিল, কিছুক্ষণ চিৎকার-চেষ্টামেচিও করে। কিন্তু কথা শোনে।”

“এরপর? জিন-ফিলিক্স চলে যাবার পর কি হলো?”

“সে ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি না।”

“কিছুই বলবেন না?”

“আপাতত না।”

আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবারো জানালার দিকে মুখ ফেরায় অ্যালিসিয়া। অন্ধকার হয়ে আসা আকাশ দেখছে জানালার ফাঁক দিয়ে। মাথা কাত করে রাখার ভঙ্গিতে অনেকটা ছেলেমানুষী ভাব, ঠোঁটের কোণায় হাসির আভাস। আসলে আমাকে এভাবে কৌতূহলের মধ্যে রেখে মজা পাচ্ছে সে।

“তাহলে কি নিয়ে কথা বলতে চান?” জিজ্ঞেস করলাম।

“জানি না। শুধু কথা বলতে চাই।”

তাই আলাপ চালিয়ে গেলাম আমরা। লিডিয়া আর পলের ব্যাপারে কথা বললাম। অ্যালিসিয়ার মায়ের গল্প শুনলাম। আমাদের দুজনের শৈশব নিয়ে স্মৃতিচারণ করলাম। আমার অতীত নিয়ে খুবই কৌতূহলী মনে হলো অ্যালিসিয়াকে। বাবার ব্যাপারে সব বললাম, কিভাবে ভয়ের মধ্যে বড় হয়েছি, কিভাবে বাসা থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে এসেছি-এগুলোও বাদ দিলাম না। বোধহয় আজকের এই আমাকে অতীতে কোন বিষয়গুলো প্রভাবিত করেছে সেটা জানাটাই মূল উদ্দেশ্যে ছিল তার।

গোটা সময় আমি ভাবছিলাম যে আবারও শুরু থেকে সব আরম্ভ করার কোন সুযোগ নেই। একজন থেরাপিস্ট আর তার রোগির মধ্যে যে দেয়ালটা থাকে, সেটা আরো আগেই গুঁড়িয়ে গেছে।

এখন হয়তো অনেকেরই প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখানে কে রোগি আর কে চিকিৎসক।

পরদিন সকালে আবারো দেখা করলাম অ্যালিসিয়ার সাথে। তবে আজকে একদম অন্যরকম লাগছে তাকে। গতকালের তুলনায় অনেক বেশি গম্ভীর আর সতর্ক। হয়তো গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুর ঘটনাটা নিয়ে কথা বলবে বলেই নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

মুখোমুখি বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সচরারচর কিন্তু এমনটা করে না। একবারের জন্যেও চোখ ফেরাচ্ছে না অন্যদিকে। নিজ থেকেই ধীরে ধীরে কথা বলা শুরু করলো একটু পর। প্রতিটি শব্দ মাপা। একদম ভেবেচিন্তে বলছে যা বলার। অনেকটা ক্যানভাসে যত্নের সাথে তুলির দাগ দেয়ার মতন।

“সেদিন বিকেলে একাই ছিলাম বাসায়। প্রদর্শনীর জন্যে ছবি আঁকার কথা ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবুও সিদ্ধান্ত নেই যে একবার চেষ্টা করে দেখবো। তাই ছোট ফ্যানটা নিয়ে বাগানের ভেতরে স্টুডিওতে চলে যাই, আর তখন...”

“আর তখন?”

“ফোন বেজে ওঠে। গ্যাব্রিয়েল কল করেছিল জানাতে যে শট থেকে ফিরতে দেরি হবে।”

“এরকমটা কি প্রায়ই করতেন তিনি? আগেই ফোন করে জানিয়ে দিতেন যে দেরি হবে?”

যেন অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছি এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় অ্যালিসিয়া।
“না, কেন?”

“এমনটাও তো হতে পারে, আপনি ঠিক আছেন কি না সেটা জানার জন্যে ফোন দিয়েছিলেন গ্যাব্রিয়েল। কারণ ডায়েরিটা পড়ে আমার মনে হয়েছে, তখন আপনার মানসিক অবস্থা খুব একটা সুবিধের ছিল না।”

“ওহ, কিছুক্ষণ কথাগুলো নিয়ে ভাবলো অ্যালিসিয়া, এরপর মাথা নাড়লো ধীরভঙ্গিতে। “হ্যাঁ, হতে পারে।”

“আপনার কথার মাঝে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গ্যাব্রিয়েল ফোন করেছিলেন আপনাকে। এরপর কি হলো?”

“তাকে দেখি আমি,” দ্বিধাস্থিত স্বরে বলল অ্যালিসিয়া।

“তাকে?”

“মানে ঐ লোকটাকে। জানালায় দেখি তার প্রতিবিম্ব। স্টুডিওতে ঢুকে পড়েছিল সে। একদম আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল।”

চোখ বন্ধ করে ফেলে অ্যালিসিয়া। লম্বা একটা সময় কিছু বলে না।

“লোকটা দেখতে কেমন ছিল?” যতটা সম্ভব কোমল স্বরে বললাম। “মনে আছে

আপনার?”

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে অ্যালিসিয়া। “বেশ লম্বা...শক্তপোক্ত শরীর। কালো মুখোশ পরে থাকায় চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম। কি মনে হচ্ছিল জানেন? যেন কালো দুটো গর্তের দিকে তাকিয়ে আছি।”

“তাকে দেখার পর কি করলেন?”

“কিছুই না। আসলে এত ভয় পেয়েছিলাম যে...অনেকক্ষণ তাকিয়েই থাকি তার দিকে। হাতে একটা ছুরি ছিল লোকটার। জিজ্ঞেস করি, কি চায় সে। কোন জবাব দেয় না। তখন বলি যে রান্নাঘরের টেবিলে আমার ব্যাগে টাকা আছে। টাকার কোন দরকার নেই আমার’-হেসে বলে লোকটা। ওরকম জঘন্য কাঁচভাঙা হাসি আগে কখনো শুনিনি। ছুরিটা আমার গলায় চেপে ধরে সে, আরেকটু হলেই গলার চামড়ায় কেটে বসতো ধারালো ফলাটা। চুপচাপ কোন শব্দ না করে তার সাথে বাসার ভেতরে যেতে বলে।”

দৃশ্যটা মনে করার সময় আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললো অ্যালিসিয়া। “আমাকে স্টুডিও থেকে লনে বের করে আনে সে। এসময় গেইটের দিকে চোখ যায় আমার। ভাবি যে কোনমতে যদি একবার গেইট পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি, তাহলে হয়তো বেঁচে যাবো। সেটাই আমার বাঁচার একমাত্র পথ। তাই মনে সাহস জড়ো করে জোরে একটা লাথি কষাই লোকটার হাঁটু বরাবর, এরপর গেইটের উদ্দেশ্যে দৌড় দেই।” চোখ খুলল অ্যালিসিয়া, মুখে হাসি। “কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আসলেও মুক্তি পেয়েছিলাম।”

এর পরেই হাসিটা মিইয়ে গেল।

“তখন...তখন পেছন থেকে আমার ওপরে লাফ দেয় লোকটা। মাটিতে পড়ে যাই আমরা। শক্ত করে এক হাতে চেপে ধরে আমার মুখ। ছুরির শীতল ফলার স্পর্শ টের পাই আবারো হুমকি দেয় যে টু শব্দ করলেও মেরে ফেলবে। কয়েক সেকেন্ড ওভাবেই থাকি। তার নিশ্বাস টের পাচ্ছিলাম মুখের ওপরে। এরপর আমাকে টেনে তুলে বাসার ভেতরে নিয়ে যায়।”

“এরপর? এরপর কি হলো?”

“দরজা বন্ধ করে দেয় সে। ভেতরে আটকা পড়ে যাই।”

ভারি হয়ে আসছে অ্যালিসিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাস। দুই গালে রক্তিম আভা। বোধহয় একটু বেশিই চাপ দিয়ে ফেলছি তাকে।

“কিছুক্ষণের জন্যে বিরতি নেয়া যাক।”

মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিল অ্যালিসিয়া। “নাহ, দরকার নেই। কথাগুলো বলার জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি আমি।”

“আপনি নিশ্চিত? কিছুক্ষণ বিরতি নিলে কিন্তু কোন সমস্যা হবে না।”

“একটা সিগারেট হবে আপনার কাছে?” কিছুক্ষণ ইতস্ততার পর জিজ্ঞেস করে সে।

“সিগারেট? আপনি ধূমপান করেন এটা তো জানতাম না।”

“নাহ, করি না। মানে...আগে করতাম। আছে আপনার কাছে?”

“আপনি কী করে বুঝলেন, আমি সিগারেট খাই?”

“গন্ধ পেয়েছি।”

“ওহ,” লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে উঠে দাঁড়াই। “ঠিক আছে। বাইরে চলুন তাহলে।”

ক্লিনিকের চত্বরে রোগীদের ভিড়। অন্যান্য সময়ের মতনই দল বেঁধে আলাপ করছে অনেকে, সিগারেট খাচ্ছে। আবার অনেকে শীতের কারণে দুই হাত বকের ওপর ভাজ করে রেখেছে।

একটা সিগারেট নিয়ে মুখে দিল অ্যালিসিয়া। তার হয়ে আমি জ্বালিয়ে দিলাম ওটা। লম্বা একটা টান দিল সে, একদম লাল হয়ে উঠলো সিগারেটের মাথাটা। তার চোখজোড়া আমার দিকে, দৃষ্টিতে হালকা বিদ্রূপ।

“আপনি ধরাবেন না? নাকি রোগীদের সাথে সিগারেট খাওয়া মানা?”

আমার সাথে ঠাট্টা করছে সে, ভাবলাম। তবে এটা ঠিক যে থোভের স্টাফ আর রোগীদের একসাথে ধূমপানের ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই। তবুও স্টাফরা সাধারণত আড়ালেই ধূমপান করে। আজ অবধি রোগীদের সামনে কাউকে সিগারেট ধরাতে দেখিনি। এখন যদি আমি সিগারেট বের করে অনেকেই চোখ বাকাতে পারে। কেন যেন মনে হচ্ছে সবার দৃষ্টি আমাদের দিকে। হয়তো জানালা থেকে ক্রিস্টিয়ানও তাকিয়ে আছে। ওর বলা কথাটা মনে হল- বর্ডারলাইন রোগীদের একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে। অ্যালিসিয়ার চোখের দিকে তাকালাম। আকর্ষণের ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে, এমনকি কোন প্রকার আন্তরিকতারও ইঙ্গিত নেই। তীক্ষ্ণ

দৃষ্টির আড়ালে অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ লুকিয়ে আছে। অ্যালিসিয়া বেরেসনকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

সেজনেই বোধহয় ক্রিস্টিয়ান সবসময় তাকে ওষুধ দিয়ে প্রায় বেহুঁশ করে রাখতো। ও কি অ্যালিসিয়াকে ভয় পায়? সত্যি বলতে আমি নিজেও কিছুটা ভয় পাই। আসলে ঠিক ভয় না, বরং বলা যায় যে অতিরিক্ত সতর্ক থাকি তার আশেপাশে। যা-ই করি সাবধানে, ভেবেচিন্তে করতে হবে।

“মানা হবে কেন?” বললাম। “আমিও ধরাছি একটা আপনার সাথে।”

সিগারেট মুখে দিয়ে জ্বালোম। এরপর নীরবে কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ি আমরা, একে অন্যের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে। অ্যালিসিয়া আর আমার মাঝের দূরত্ব বিপজ্জনক রকমের কম, শেষমেশ চোখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। কেমন জানি লজ্জা লাগছিল।

“আমরা হাঁটি নাহয়?”

“ঠিক আছে,” মাথা নেড়ে বলল অ্যালিসিয়া।

চত্বরের সীমানা ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। অন্যান্য রোগিরা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তারা কি ভাবছে কে জানে, তবে অ্যালিসিয়াকে সেসব নিয়ে বিচলিত মনে হলো না। এমনকি তাদের দিকে একবারের জন্যে তাকায়ওনি সে। নীরবেই কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম।

“এরপর কি ঘটেছিল শুনবেন না?” এক সময় জিজ্ঞেস করলো অ্যালিসিয়া।

“আপনি প্রস্তুত? আমার কোন সমস্যা নেই।”

আবারো মাথা নাড়ে অ্যালিসিয়া। “হা প্রস্তুত।”

“লোকটা তাহলে আপনাকে বাসার ভেতরে নিয়ে দরজা আটকে দেয়। এরপর?”

“লোকটা ড্রিস্কসের কথা বলে। তাই তাকে গ্যাব্রিয়েলের একটা বিয়ারের ক্যান দেই আমি। আমি নিজে বিয়ার খাই না। আর বাসায় ঐ সময় অন্য কিছু ছিল না।”

“এরপর?”

“কিছু একটা নিয়ে কথা বলে লোকটা।”

“কি নিয়ে?”

“মনে নেই আমার।”

“কিছুই মনে নেই?”

“না”

আবারো চুপ হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর যখন দেখলাম মুখ খুলছে না, তাগাদা দিলাম। “ঠিক আছে। আপনারা রান্নাঘরে ছিলেন তখন। কেমন বোধ হচ্ছিল?”

“আসলে...আসলে কোন বোধজ্ঞানই ছিল না তখন আমার।”

মাথা নাড়লাম। “ওরকম পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক। বিপদে পড়লে আমাদের অনুভূতি একদম ভোতা হয়ে যায়। পালাবো নাকি পালাবো না এটা ভাবতে ভাবতে জমে যাই একদম।”

“আমি জমে যাইনি।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ,” তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে অ্যালিসিয়া। “আসলে নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। মনে মনে ছক কষছিলাম কিভাবে পাল্টা আঘাত হানা যায়। লোকটাকে খুনের ফন্দি আঁটছিলাম।”

“আচ্ছা। খুনটা কিভাবে করতেন আপনি?”

“গ্যাব্রিয়েলের বন্দুকটা দিয়ে। ওটা কিভাবে নাগালে পাওয়া যায় সেটা ভাবছিলাম।”

“বন্দুকটা তো বোধহয় আপনি রান্নাঘরে এনে রেখেছিলেন? ডায়েরিতে সেটাই লেখা।”

মাথা নাড়লো অ্যালিসিয়া। “হ্যাঁ, জানালার পাশের থালা-বাসন রাখার কাবার্ডে।” এই পর্যায়ে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোয়া ছাড়লো অ্যালিসিয়া। “লোকটাকে বলি যে পানি খাবো। গ্লাস আনতে যায় সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই কাবার্ডের দিকে। মনে হচ্ছিল ওটুকু এগোতেও খুব। বেশি সময় লাগছে। কাঁপা কাঁপা হাতে কাবার্ডের পাল্লা খুলি...”

“আর?”

“খালি ছিল ভেতরটা। বন্দুকটা কেউ সরিয়ে ফেলেছিল। এসময় পেছন থেকে লোকটা বলে-গ্লাসগুলো আপনার ডানপাশের কাবার্ডে। ঘরে তাকিয়ে দেখি বন্দুকটা তার হাতে। ওটা আমার দিকে তাক করে হাসছিল সে।”

“তখন?”

“কি তখন?”

“আপনার মাথায় কি চলছিল?”

“এটাই যে শেষ সুযোগটাও হারিয়ে ফেলেছি আমি-আমাকে মেরে ফেলবে লোকটা।”

“আপনার মনে হচ্ছিল, লোকটা আপনাকে মেরে ফেলবে?”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে দেরি করলো কেন সে? বাড়ির ভেতরে ঢোকার পরেই তো কাজটা করতে পারতো।”

জবাব দিল না অ্যালিসিয়া। তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। হাসছে সে।

“লিডিয়া ফুপির একটা বাদামি রঙের বিড়াল ছিল। অনেক আগের কথা এটা। বিড়ালটাকে একদমই পছন্দ ছিল না আমার। প্রায়ই খামচে রক্ত বের করে ফেলতো। দয়ামায়া বলে কিছু ছিল না।”

“পশুপাখিদের ক্ষেত্রে তো দয়ামায়া কথাটা ঠিক খাটেনা। তারা যা করে, আত্মরক্ষার খাতিরেই করে।”

তনুয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় অ্যালিসিয়া। “ভুল কথা। অনেক পশুপাখিই নিষ্ঠুর ধরনের। অন্তত ঐ বিড়ালটার ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য। বাইরে থেকে প্রায়ই আহত পাখি বা ছোট জীব-জন্তু নিয়ে আসতো। সবগুলোই আধ-মরা। আহত, কিন্তু মারা যায়নি। ওগুলো নিয়ে খেলতো।”

“আচ্ছা। আপনি কি বলতে চাইছেন যে লোকটাও আপনাকে নিয়ে অনেকটা ওরকমই করছিল? তার জন্যে বিকৃত একটা খেলা ছিল ব্যাপারটা?”

সিগারেটটা শেষ করে মাটিতে ফেলে দিল অ্যালিসিয়া। এরপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, “আরেকটা দিন।”

তার দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম। এবারে নিজেই সিগারেট জ্বাললো সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ ধোয়া ফোকার পর বলল, “গ্যাব্রিয়েলের আটটার দিকে বাসায় ফেরার কথা ছিল। আর তখন বাজছিল ছয়টা। বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি। কি ব্যাপার? লোকটা বলে। ‘আমার সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগছে না

আপনার বন্দুকের নলটা আমার শরীরে স্পর্শ করে সে। দৃশ্যটা কল্পনা করে কেঁপে উঠলো অ্যালিসিয়া। “আমি বলি গ্যাব্রিয়েল যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। এসে কি করবে? আপনাকে উদ্ধার করবে? লোকটা জিজ্ঞেস করে।”

“জবাবে আপনি কি বলেছিলেন?”

“কিছু না। শুধু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলাম...এসময় আমার ফোনটা বেজে ওঠে। গ্যাব্রিয়েল কল দিয়েছিল। লোকটা বলে ফোন ধরতে। বন্দুকটা আমার কপাল বরাবর তাক করে রেখেছিল।”

“এরপর? গ্যাব্রিয়েল কি বলে?”

“বলে যে...ফটো শ্যুটটায় ঝামেলা হয়েছে, বাসায় ফিরতে আরো দেরি হবে। আমি যেন খেয়ে নেই। কমসেকম দশটা বেজে যাবে তার কাজ শেষ হতে। ফোন কেটে দিয়ে বলি ‘গ্যাব্রিয়েল কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। এর আগেই আপনি চলে যান। হাসে লোকটা। কিন্তু আমি তো শুনলাম দশটার আগে ফিরবে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাহলে। দড়ি নিয়ে আসুন, টেপ হলেও চলবে। আপনাকে বেঁধে ফেলি।

“সে যা বলে তা-ই করি আমি। জানতাম যে আর কোন উপায় ছিল না। পুরোপুরি আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম।”

কথা বলা বন্ধ করে আমার দিকে তাকায় অ্যালিসিয়া। একসাথে অনেকগুলো আবেগ খেলা করছে তার দৃষ্টিতে। আসলেও বোধহয় আজকে একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে।

“আমাদের কিছুক্ষণের বিরতি নেয়া উচিত এখন।”

“না, কথা শেষ করতে হবে আমাকে। করতেই হবে।”

আগের চেয়ে দ্রুত কথা বলছে সে এখন। “বাসায় কোন দড়ি ছিল না, তাই ক্যানভাস ঝোলানোর তার দিয়ে কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় লোকটা। আমাকে লিভিং রুম নিয়ে যায়। এরপর ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসিয়ে বাঁধতে শুরু করে। টের পাচ্ছিলাম, চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে তার। ‘প্লিজ, অনুনয় করি আমি। প্লিজ’ কিন্তু শোনেনা সে। হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। আমি তখন পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম, আমাকে মেরেই ফেলবে সে। আসলে...আসলে তখন আমাকে খুন করলেই ভালো হতো।”

তীব্র আক্রোশের সাথে কথাগুলো বলে সে। হঠাৎ আবেগের এই চরম বহিঃপ্রকাশে অবাক না হয়ে পারি না।

“এটা কেন বললেন?”

“কারণ পরবর্তিতে সে যা করে, তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিল।”

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কেঁদেই ফেলবে অ্যালিসিয়া। তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়া থেকে নিজেকে থামাতে বেশ কষ্ট হলো আমার। ইচ্ছে করছিল তার কপালে চুমু খেয়ে বলি যে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করলাম নিজেকে। দেয়ালের সাথে চেপে ধরে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললাম।

“কারো উচিৎ আপনার যত্ন নেয়া, খেয়াল রাখা। আমার নিজেরই আপনার খেয়াল রাখতে ইচ্ছে করছে, অ্যালিসিয়া।”

“না,” দৃঢ়ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে। “আপনার কাছ থেকে এসব চাই না আমি।”

“তাহলে কি চান?”

জবাব দিলনা অ্যালিসিয়া। বরং উল্টোদিকে ঘরে ভেতরের যাওয়ার দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

খেরাপি রুমের বাতি জ্বলে দরজা লাগিয়ে দিলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি অ্যালিসিয়া ইতোমধ্যেই বসে পড়েছে। তবে নিজের চেয়ারে নয়, আমার চেয়ারে বসেছে সে।

অন্যসময় হলে তার এই আচরণের পেছনে নিগঢ় কোন কারণ খোঁজার চেষ্টা করতাম, কিন্তু এবারে কিছুই বললাম না। আমার চেয়ারে বসে যদি সে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে চায়...করতে পারে। আপাতত আমি গল্পের শেষটুকু শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। তাই চুপচাপ তার বিপরীত দিকে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ একদম স্থির বসে থাকার পর মুখ খুলল সে। “আমাকে চেয়ারে একদম শক্ত করে বাঁধে লোকটা। একটু নড়াচড়া করলেই তারগুলো চামড়া কেটে আরো গভীরে বসে যাচ্ছিল, এক পর্যায়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। তবে সেটা একদিক ভালোই হয়েছিল, ক্ষতস্থানগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কারণে মনের উল্টোপাল্টা ভাবনাগুলো দূরে রাখতে পারছিলাম। সেগুলো অনেক বেশি ভীতিকর ছিল। ভাবছিলাম গ্যাব্রিয়েলকে আর দেখতে পাবোনা কখনো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হবে

আমার।”

“এরপর কি হলো?”

“ওখানেই ঠাই বসে থাকি আমরা। মজার ব্যাপার কি জানেন? এর আগে আমি সবসময় ভাবতাম যে ভয় পেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু ধারণাটা ভুল ছিল। খুব বেশি গরম লাগছিল তখন, যেন পুরো শরীরে আগুন ধরে গেছে। দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল অবশ্য। তবুও, একদম ভ্যাপসা গরম ছিল ভেতরে। কপাল থেকে ঘাম চুঁইয়ে পড়ার কারনে চোখ জলছিল। লোকটার শরীর থেকে ঘাম আর মদের গন্ধ পাচ্ছিলাম। পুরোটা সময় কথা বলে যায় সে, আমি ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনিনি। একটা বড় মাছির শব্দ কানে আসে। বাইরে বের হবার চেষ্টা করছিল সেটা, বারবার তো খাচ্ছিল জানালার কাঁচে। গ্যাব্রিয়েলের ব্যাপারে আমাকে অনেক প্রশ্ন করে লোকটা। কিভাবে আমাদের দেখা হয়েছিল, কতদিন ধরে একসাথে আছি, সংসারে সুখি কি না-এসব। তখন আমার মনে হয় যে কথা বলে সময় নষ্ট করলে বুঝি আমার বাঁচার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাই তার প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়া শুরু করি। গ্যাব্রিয়েল, আমার কাজ-সবকিছু নিয়ে কথা বলি। কিছু সময়ের খুব দরকার ছিল আমার। বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। এভাবেই একসময় খেয়াল করি, দশটা বেজে গেছে...এরপর সাড়ে দশটা। কিন্তু গ্যাব্রিয়েলের বাসায় ফেরার নাম নেই।

“দেরি হয়ে গেছে, লোকটা বলে। আজকে বোধহয় আর আসবে না।”

“আসবে ও, “ আমি জবাব দেই।

“আমি থাকাতে আপনার সুবিধেই হয়েছে, কি বলেন? “

“ঠিক এগারোটার সময় বাইরে থেকে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পাই। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দেয় লোকটা। একদম ঠিক সময়েই এসেছে, বলে সে।

অ্যালিসিয়ার ভাষ্যমতে এরপরের ঘটনাগুলো অনেক দ্রুত ঘটে।

লোকটা অ্যালিসিয়ার চেয়ারটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয় যাতে দরজা থেকে তার চেহারা না দেখা যায়। বলে যে সে যদি টু শব্দটিও করে, তাহলে গ্যাব্রিয়েলের খুলি উড়িয়ে দিবে। এরপর গা ঢাকা দেয়। সবগুলো বাতি নিভে যায় কিছুক্ষণ পর। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হলওয়ে থেকে দরজা খোলা-বন্ধের শব্দ ভেসে আসে।

“অ্যালিসিয়া?” গ্যাব্রিয়েল ডাক দেয় জোরে।

কোন জবাব না পেয়ে আবারো ডেকে ওঠে সে। লিভিংরুমে ঢুকে দেখে ফায়ারপ্লেসের কাছে চেয়ার নিয়ে উল্টো ঘুরে বসে আছে অ্যালিসিয়া।

“এভাবে অন্ধকারে বসে আছো কেন?” জানতে চায় গ্যাব্রিয়েল। কিন্তু কোন জবাব পায় না। “অ্যালিসিয়া?”

খুব কষ্ট করে চুপ থাকে অ্যালিসিয়া-গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার- কিন্তু ততক্ষণে চোখে আঁধার সয়ে এসেছিল। দেখতে পাচ্ছিল, অচেনা লোকটা বন্দুক হাতে এক কোণায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকের নলটা গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাক করা। তার স্বার্থেই মুখ বন্ধ রাখে। অ্যালিসিয়া।

“অ্যালিসিয়া?” গ্যাব্রিয়েল এইয়ে যায় তার দিকে। “কোন সমস্যা?”

গ্যাব্রিয়েল হাত বাড়িয়ে অ্যালিসিয়াকে ধরতে যাবে, ঠিক এসময় অন্ধকার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটা। চিৎকার করে ওঠে অ্যালিসিয়া, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গ্যাব্রিয়েল, লোকটা তার ওপর চেপে বসে। বন্দুকটা হাতুড়ির মত করে ধরে গ্যাব্রিয়েলের মাথায় পরপর কয়েকবার আঘাত করে। রক্ত ঝরতে শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারায় সে।

এরপর তার অচেতন দেহটা একটা চেয়ারে বসিয়ে তাকেও তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধে আততায়ী। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে গ্যাব্রিয়েলের।

“কি হচ্ছে এসব? কি-”

বন্দুকটা গ্যাব্রিয়েলের দিকে তাক করে লোকটা। ট্রিগার টেনে দেয়। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয় চারপাশ। একবার, দু’বার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার, ছয়বার। গোটা সময় চিৎকার করতেই থাকে অ্যালিসিয়া।

গ্যাব্রিয়েলকে ছয়বার গুলি করা শেষে বন্দুকটা মেঝেতে ফেলে দেয় লোকটা। এরপর কোন কথা না বলে বেরিয়ে যায় বাসা থেকে।

এই হচ্ছে পুরো গল্প। অ্যালিসিয়া বেরেনসন তার স্বামীকে হত্যা করেনি। এক অচেনা আততায়ী তাদের বাসায় ঢুকে পড়ে এবং কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই নৃশংসভাবে খুন করে গ্যাব্রিয়েল বেরেসকে। এরপর রাতের আঁধারেই মিলিয়ে যায়। অ্যালিসিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অন্তত অ্যালিসিয়ার কথা বিশ্বাস করলে এমনটাই ঘটেছিল বলে মেনে নিতে হবে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। একটা শব্দও না।

কিছু বড়সড় অসঙ্গতির কথা তো আমি এখনই বলে দিতে পারবো, যেমন-গ্যাব্রিয়েলকে ছয়বার না, পাঁচবার গুলি করা হয়েছিল। একটা গুলি চালানো হয়েছিল বাড়ির ছাদ বরাবর। তাছাড়া পুলিশের লোকেরা অ্যালিসিয়াকে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় নয় বরং রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল। দুই হাত দিয়ে দরদ করে রক্ত ঝরছিল তার। অ্যালিসিয়া আমাকে বলেনি যে লোকটা তার বাঁধন খুলে দিয়েছিল কি না। তাছাড়া পুলিশের লোকদের কেন এই কথাগুলো বলেনি এটারও যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা দেয়নি।

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, সে মিথ্যে বলেছে। মুখের ওপরে এভাবে অকপটে মিথ্যে বলার কারণে প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে। এক মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো যে সে বোধহয় পরীক্ষা করে দেখছে আমি তাকে বিশ্বাস করি কি না। যদি তা-ই হয়, তাহলে আমার মাথায় কি চলছে তা তাকে বুঝতে দেব না একদমই।

চুপচাপ বসে রইলাম ওখানে।

এই প্রথম আগে কথা বলল অ্যালিসিয়া। “আমার খুব ক্লান্ত লাগছে। আজকে আর কথা বলতে পারবো না।”

মাথা নাড়লাম। একটানা এ রকম বিষয়ে কথা বলার পর যে কারো ক্লান্ত লাগবে।

“কালকে আবার দেখা করি আমরা,” বলল সে।

“আরো কিছু বলার আছে?”

“হ্যাঁ। তবে সেটাই শেষ।”

“ঠিক আছে। কালকে দেখা হবে তাহলে।”

করিডোরে অপেক্ষা করছিল ইউরি। অ্যালিসিয়াকে তার রুমে নিয়ে গেল সে। আমি আমার অফিসে চলে আসলাম।

আগেও বলেছি, সেশন শেষে সবকিছু লিখে ফেলা আমার পুরনো অভ্যাস। থেরাপি সেশনের পঞ্চাশ মিনিটে কি কি কথা হয়েছে তা যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে লিখে ফেলা একজন থেরাপিস্টের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা ছোটবড় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাবে চিরতরে। এমনকি সেশন চলাকালীন সময়ে রোগির মুখভঙ্গি বা অভিব্যক্তি কেমন ছিল-এসবও লিখে রাখা ভালো।

তাই ডেস্কে বসে যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু লিখে ফেললাম। লেখা শেষ হতেই কাগজগুলো হাতে নিয়ে ছুটে গেলাম ডায়োমেডেসের অফিসের ফিকে। তার দরজায় ঠকঠক করলাম, কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া এলো না। আবারো ঠকঠক করার পরেও যখন ডায়োমেডেস কিছু বললেন না, দরজাটা একটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিলাম। দেখি যে প্রফেসর কাউচে বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

“প্রফেসর?” লাভ হলো না। “প্রফেসর ডায়োমেডেস?” গলা চড়ালাম।

চমকে জেগে উঠলেন তিনি। ঘুম জড়ানো দৃষ্টি তাকালেন আমার দিকে।

“কি হয়েছে? কোন সমস্যা?”

“আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। পরে আসবো?”

জ্রা কুঁচকে মাথা ঝাঁকালেন ডায়োমেডেস। লাঞ্চার পর খানিকক্ষণ ভাতঘুমের অভ্যাস আছে আমার। তাহলে আর বিকালে ঝিমাতে হয় না। বয়স হলে তুমিও বুঝবে।” হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। “ভেতরে এসো, থিও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে জরুরি কিছু বলবে। বসো।”

“জি, আসলেই জরুরি।”

“অ্যালিসিয়াকে নিয়ে কিছু বলবে?”

মাথা নেড়ে সাই দিয়ে তার ডেস্কের উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসে পড়লাম। এক সেকেন্ড পর প্রফেসরও তার চেয়ারটায় এসে বসলেন, চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে একদিকে। চোখে এখনও রাজ্যের ঘুম।

“আমি কিছুক্ষণ পরে আসি বরং?”

মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলেন ডায়োমেডেস। জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে রাখলেন টেবিলের ওপরে। “আর ঘুম আসবে না আমার। বলো। তাহলে কি হয়েছে?”

“অ্যালিসিয়ার সাথে কথা বলছিলাম আমি...আপনার পরামর্শ প্রয়োজন।”

মাথা নাড়লেন ডায়োমেডেস। আসলে তা কেটে যাচ্ছে তার। এখন চোখে ভর করেছে আগ্রহ। “কী রকম পরামর্শ?”

হাতের কাগজগুলো থেকে সবকিছু তাকে পড়ে শোনালাম। অ্যালিসিয়া আমাকে যেভাবে কথাগুলো বলেছে, আমিও ঠিক সেভাবেই বলার চেষ্টা করেছি। প্রফেসর শুনলেন, কী করে একজন আততায়ী অ্যালিসিয়াদের বাসায় ঢুকে গ্যাব্রিয়েলকে খুন

করে তার চোখের সামনে।

আমার কথা বলা শেষ হলে লম্বা একটা সময় চুপ করে থাকলেন। ডায়োমেডেস। তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না মগজে কী চলছে। ডেস্ক থেকে একটা চুরুট বের করে ছোট রূপালী গিলোটিনের সাহায্যে সেটার মাথা কেটে নিলেন সাবধানে।

“কাউন্টারট্রান্সফিয়ারেন্স থেকেই শুরু করি তাহলে। তোমার নিজের অনুভূতি সম্পর্কে বলল, একদম প্রথম থেকে। অ্যালিসিয়া যখন গল্পটা বলছিল, কেমন লাগছিল তোমার?”

কিছুক্ষণ ভাবলাম। প্রথম দিকে বেশ উত্তেজিত ছিলাম....আর কিছুটা উদ্বিগ্ন। ভীত।”

“ভীত? ভয়টা কি তোমার নিজের, নাকি অ্যালিসিয়ার?”

“দু’জনেরই বোধহয়।”

“কেন ভয় পাচ্ছিলে?”

“সেব্যাপারে নিশ্চিত নই। হয়তো ব্যর্থ হবো, এই ভয় কাজ করছিল। অনেক কিছুই নির্ভর করে আছে এর ওপরে।”

মাথা নাড়লেন ডায়োমেডেস। “আর কিছু?”

“খুব হতাশাও লাগছিল। আসলে অ্যালিসিয়ার সাথে সেশনগুলোয় প্রায়ই এই অনুভূতিটা হয়েছে।”

“রাগ হয়নি কখনো?”

“হ্যাঁ, হয়েছে।”

“অবাধ্য সন্তানকে কথা শোনাতে না পারলে বাবাদের যেরকম লাগে, তোমারও ওরকমই লাগছিল?”

“হ্যাঁ, অ্যালিসিয়াকে সাহায্য করতে চাইছিলাম আমি। কিন্তু সে সাহায্য পেতে ইচ্ছুক কি না তা বলতে পারবো না।”

আবারো মাথা নাড়লেন ডায়োমেডেস। “আপাতত তাহলে আমরা রাগ নিয়ে কথা বলি। এই রাগটা ফুটে ওঠে কি করে?”

দ্বিধা ভর করলো আমার চিত্তে। “বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেশন চলাকালীন সময়ে প্রচণ্ড মাথাব্যথা থাকে আমার।”

“এইতো! এক না এক উপায়ে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই। গ্রুপ থেরাপি বিষয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে, জানো? সাধারণত ট্রেইনিরা গ্রুপ থেরাপি সেশন পরিচালনা করে। যাইহোক, এম মিল্টন তার গ্রুপ থেরাপি বিষয়ক গবেষণাপত্রের শুরুতে লিখেছিলেন যে ট্রেইনি থেরাপি সেশনের সময় উদ্ভিগ্ন হবে না, সে অসুস্থ হয়ে পড়বে।”

“এরকম কিছু শুনিনি,” কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম। “আমি একইসাথে অসুস্থ এবং উদ্ভিগ্ন হতাম।”

হাসলেন ডায়োমেডেস। “তুমি তো আর ট্রেইনিও। যদিও প্রশিক্ষণের সময়কার অনুভূতিগুলো কখনোই ভোলা যায় না।” চুরুটটা তুলে নিলেন তিনি। “চলো বাইরে যাই।”

জরুরি বহির্গমন সিঁড়ির কাছে চলে আসি আমরা। চুরুটে টান দেয়ার পাশাপাশি আমার বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবছেন ডায়োমেডেস। কিছুক্ষণ পর একটা উপসংহারে পৌঁছে গেলেন।

“ও মিথ্যে বলছে, তা বোধহয় বুঝতেই পারছো তুমি।”

“মানে গ্যাব্রিয়েলের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সে যা বলেছে? হ্যাঁ, আমরা সেটাই মনে হচ্ছে।”

“না, শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেই নয়।”

“তাহলে?”

“পুরোটাই একটা গাঁজাখুরি গল্প। একটা শব্দও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।”

আমি যে প্রচণ্ড অবাক হয়েছি, তা নিশ্চয়ই আমার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল। ভেবেছিলাম অ্যালিসিয়ার গল্পের কিছু বিষয়ে হয়তো সন্দেহ পোষণ করবেন প্রফেসর। কিন্তু পুরাটাকেই যে বাতিল করে দেবেন, এটা ভাবিনি।

“লোকটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না আপনি?”

“না, করি না। আমার ধারণা এই ‘মুখোশধারী আততায়ী’-র ব্যাপারটা অ্যালিসিয়ার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বৈ কিছু নয়।”

“এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?”

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটলো ডায়োমেডেসের চেহারা। “এটা আমার আন্দাজ বলতে পারে, আবার এত বছরের পেশাদারী অভিজ্ঞতাও বলতে পারো।” আমি দ্বিমত

পোষণ করে কিছু বলার আগেই হাত উঁচিয়ে আমাকে থামালেন তিনি। “আমি কিন্তু এমনটা আশা করছি না যে তুমি আমার সাথে একমত হবে, থিও। অ্যালিসিয়াকে নিয়ে যে কারো চেয়ে অনেক বেশি ভেবেছো তুমি। তাই তার অনুভূতিগুলোর সাথে তোমার অনুভূতিগুলোও জট পাকিয়ে গেছে। সুপারভাইজার হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে সেগুলো আলাদা করতে তোমাকে সাহায্য করা। আর একবার যদি অ্যালিসিয়া সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে পারো, তাহলে দেখবে তার সম্পর্কে তোমার ধারণাই বদলে গেছে।”

“আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।”

“সোজাসুজি বললে, আমার ধারণা শুরু থেকেই তোমার সামনে অভিনয় করছে সে। তোমাকে দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করছে। অন্যকে সাহায্য করার তোমার যে স্বভাবজাত গুণ, সেটার ফায়দা লুটতে চেয়েছে আর কি। আমি শুরু থেকেই বুঝেছিলাম যে ওকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করাই তোমার লক্ষ্য। অ্যালিসিয়ারও নজর এড়ায়নি সেটা। সেজন্যে তোমার জন্যে ফাঁদ পেতেছে। প্রেমের ফাঁদও বলা যায়।”

“ক্রিস্টিয়ানের মত শোনাচ্ছে আপনার কথাগুলো। আমাকে কোন প্রেমের ফাঁদে ফেলেনি অ্যালিসিয়া। তাছাড়া রোগীদের কারো ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে আছে কি না, তা বোঝার মত বুদ্ধিমত্তা রাখি আমি। দয়া করে আমাকে খাটো করে দেখবেন না, প্রফেসর।”

“তুমি অ্যালিসিয়াকে খাটো করে দেখো না। পুরোটাই তার ভয়ানক একটা চাল।” মাথা ঝাঁকিয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকালেন ডায়োমেডেস। “অ্যালিসিয়াকে দেখে মনে হতে পারে যে পরিস্থিতির শিকার, অসহায় এক নারী। কারো উচিত তার খেয়াল রাখা বা তাকে রক্ষা করা। নিজেকে ভিক্টিম আর ঐ মুখোশধারী আততায়ীকে ভিলেন সাজিয়েছে সে। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে অ্যালিসিয়া আর ঐ ব্যক্তি একই সত্ত্বা। সেই মেয়েছে গ্যাব্রিয়েলকে। কিন্তু নিজের কাছে দোষ স্বীকার করতে চাইছে না। তাই এই গল্পটা ফেঁদেছে। এখানে অ্যালিসিয়া নিরপরাধ ভিক্টিম আর তুমি তার ত্রাণকর্তা। আর তুমিও যেহেতু ব্যাপারটার সাথে জড়িয়ে গেছে, ওর প্রভাবে সব দায়িত্বও ভুলতে বসেছে।”

“মাফ করবেন, আমি আপনার সাথে একমত নই। তাছাড়া সে মিথ্যে বলছে

বলেও আমার মনে হচ্ছে না। অন্তত সচেতনভাবে তো নয়ই। গল্পটা আর কেউ না হলেও সে নিজে পুরোপুরি বিশ্বাস করে।”

“হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছ। তবে অ্যালিসিয়ার বিপদের কারণ সে নিজেই-বাইরের কেউ নয়।”

আমি জানি যে ভুল বলছেন প্রফেসর, কিন্তু এ বিষয়ে তর্ক করে আর লাভ নেই। হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললাম।

“এখন কি করা উচিত আমার?”

“অ্যালিসিয়াকে সত্যের মুখোমুখি হতে বাধ্য করো। তাহলেই কেবল তার সুস্থ হবার একটা সম্ভাবনা থাকবে। গল্পটা যে বিশ্বাস করোনি, এটা একদম পরিস্কার করে বলবে তাকে। অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরে, সত্যটা দাবি করো।”

“আপনার কি মনে হয়? বলবে সে?”

“সেটা-” কাঁধ নাচালেন প্রফেসর। লম্বা একটা টান দিলেন চুরুটে। “এ মুহূর্তে কেউ বলতে পারবে না।”

“ঠিক আছে। কালকে তার সাথে আবারো কথা বলবো আমি। সত্যটা বের করার চেষ্টা করবো।”

ক্ষণিকের জন্যে অস্বস্তি ভর করলো ডায়োমেডেসের চেহারায়। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলালেন। চুরুটটা দেয়ালে পিষে মাটিতে ফেলে দিলেন আলাপের ইতি টানার ভঙ্গিতে। “কালকেই কিন্তু।”

কাজ শেষে বাসায় ফিরে আবারো ক্যাথির পিছু নেই। ঠিক আগের দিনের মতোই পার্কে একই জায়গায় অপেক্ষা করছিল তার প্রেমিক। সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণীদের মত একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দুজনে।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকটায় তাকালো ক্যাথি। এক মুহূর্তের জন্যে ভেবেছিলাম ধরা পড়ে গেছি বুঝি। কিন্তু না, অন্য কোনদিকে মনোযোগ দেয়ার সময়ই নেই তার। এবারে লোকটার চেহারা ভালো করে দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু লাভ হয় না। তবে তার শারীরিক গঠন কেন যেন পরিচিত ঠেকছিল। কোথাও হয়তো দেখেছি আগে।

ক্যামডেনের দিকে এগিয়ে কিছুক্ষণ পর একটা পাবে ঢুকে পড়লো ওরা। দ্য রোজ ট্রাউন। পরকীরার জন্যে একদম আদর্শ একটা জায়গা। আমি বিপরীত দিকে

ক্যাফেটায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একঘন্টা পর বেরিয়ে এলো দুজনে। ক্যাথি পারলে লোকটার কোলে উঠে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়েই দীর্ঘ চুম্বনে আবদ্ধ হলো দুজনে। দৃশ্যটা দেখে পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো। ঘৃণা এতটা তীব্র হতে পারে জানা ছিল না।

একসময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকটা বিদায় জানায় ক্যাথি। বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করে। লোকটা রওনা দেয় বিপরীত দিকে। তবে আজকে আর ক্যাথির পিছু নিলাম না।

আজ লোকটাকে অনুসরণ করবে বলে ঠিক করেছি।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। আমি তার ঠিক পেছনেই আছি। ইচ্ছে করছে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত বাসের সামনে ফেলে দেই। কিন্তু সেরকম কিছু করলাম না। সে বাসে উঠে পড়লে আমিও তা-ই করলাম।

ভেবেছিলাম এই বাসেই সরাসরি বাড়ি ফিরবে সে হয়তো। কিন্তু না, কয়েকবার বাস পাল্টালো লোকটা। কিছুটা দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে চলেছি আমি। কিছুক্ষণ পর ইস্ট এন্ডে চলে আসে সে। একটা ওয়্যারহাউজে ঢুকে প্রায় আধাঘন্টা কাটিয়ে দেয়। এরপর আবারো বাসস্টপে গিয়ে একটা বাসে উঠে পড়ে। এসময় কয়েকটা ফোন করে সে। নিচু গলায় কথা বলছিল গোটা সময়, তবে হাসির শব্দটা ঠিকই শুনতে পাই। কে জানে, হয়তো ক্যাথির সাথে কথা বলছে। ভেতরে ভেতরে হতাশা আর ক্রোধ দলা পাকিয়ে উঠছে। তবুও হাল ছাড়তে রাজি নই, এতটাই গোঁয়ার আমি।

এক পর্যায়ে বাসার পথ ধরলো সে। বাস থেকে নেমে নির্জন একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো। এখনও কানে ফোন চেপে রেখেছে। আশপাশে কোথাও কেউ নেই। যদি এ মুহূর্তে পিছে ফেরে সে, তাহলে আমাকে দেখে ফেলবে। কিন্তু ওরকম কিছু করলো না। এখন যে বাড়িটার সামনে দিয়ে এগোচ্ছি তার উঠোনে বিশাল বাগান, সেখানে শোভা পাচ্ছে বেশ কয়েক জাতের জেইড প্ল্যান্ট।

আমার নিজের শরীরের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এ মুহূর্তে, মনে হচ্ছে যে আপনা আপনিই চলছে। হাত বাড়িয়ে বাগান থেকে একটা পাথর তুলে নিলাম। বেশ ভারি। আমার হাতগুলো ঠিকই জানে, কী করতে হবে। পাথরটা দিয়ে মাথায় জোরে একবার আঘাত করলেই হারামজাদার যাবতীয় নষ্টামি ছুটে যাবে। আরো কাছে

এগিয়ে গেলাম সন্তর্পণে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আজকেই ফয়সালা হয়ে যাবে। সে যদি ফোনে কথা না বলতে তাহলে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যেত এতক্ষণে। আর দেরি করা যাবে না।

সর্বশক্তিতে পাথরটা দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করতে উদ্যত হয়েছি, ঠিক এমন সময় বাম দিকের বাসাটার দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। বেশ কয়েকবার ‘ধন্যবাদ’, ‘বাসায় আসবেন’-কথাগুলো শুনতে পেলাম। দ্রুত পাশে সরে এসে আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। এক মুহূর্তের জন্যে জমে গিয়েছিলাম ওখানেই। ক্যাথির প্রেমিক বাড়িটার দিকে তাকালো, তবে আমাকে দেখেনি।

আবারো হাঁটতে শুরু করলো সে, তবে এবারে আর পিছু নিলাম না আমি। ঘোর কেটে গেছে। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল পাথরটা। গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখছি লোকটার ওপরে। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো সে। এরপর পকেট থেকে চাবি বের করে নিজেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পর আলো জ্বলে উঠলো রান্নাঘরে। জানালার সামনেই এখন দাঁড়িয়ে আছে সে। তবে রাস্তা থেকে ভেতরের পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। কারো সাথে কথা বলছে লোকটা, হাতে ওয়াইনের বোতল। এসময় তার সঙ্গিকে দেখলাম এক ঝলক। আমার বয়সী এক নারী। ইনিই কি লোকটার স্ত্রী? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো হারামজাদা।

বাহ, বাইরে একজন, ভেতরে আরেকজন।

তার মানে আমি একাই যে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, এমনটা নয়। আমার স্ত্রীর সাথে ফণ্টিনস্টি করে এসে এই মহিলার বানিয়ে রাখা খাবার খাচ্ছে সে, যেন কিছুই হয়নি। এভাবে চুপচাপ সব সহ্য করে যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে। কিন্তু করবোটা কি? মনে মনে যতই খুন করার কথা ভাবি, আদতে তো আমি খুনি নই। তাকে হত্যা করা সম্ভব না আমার পক্ষে।

অন্য কোন ফন্দি আঁটতে হবে।

ভেবে রেখেছিলাম, সকালে অফিসে গিয়েই অ্যালিসিয়ার সাথে আগে কথা বলবো। তাকে দিয়ে স্বীকার করাবো যে গ্যাব্রিয়েলের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার সাথে মিথ্যে বলেছে। যেমনটা প্রফেসর ডায়োমেডেস বলেছিলেন, সত্যের মুখোমুখি হতে বাধ্য করবো তাকে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেই সুযোগটা আর হলো না।

রিসিপশনের আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ইউরি। “খিও, তোমার সাথে কথা আছে আমার।”

“কি হয়েছে?”

তার দিকে ভালো করে তাকাতেই চমকে যাই। রাতারাতি যেন বয়স বেড়ে গেছে লাটভিয়ান লোকটার! চেহারা একদম ফ্যাকাসে। খারাপ কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

“একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অ্যালিসিয়া...মানে ড্রাগ ওভারডোজ-”

“কি? ও ঠিক আছে তো?”

মাথা ঝাঁকালে ইউরি। “এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু-”

“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

“কিন্তু কোমায়। পরিস্থিতি একদমই ভালো না।”

“কোথায় এখন?”

গোলকধাঁধার মত করিডোরগুলো পেরিয়ে আমাকে আইসিইউতে নিয়ে এলো ইউরি। একটা প্রাইভেট রুমে রাখা হয়েছে অ্যালিসিয়াকে। ইসিজি মেশিন আর ভেন্টিলেটরের মৃদু গুঞ্জন কানে আসছে। চোখ দুটো বন্ধ, দেখে মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে।

আরেকজন ডাক্তারের সাথে সেখানে আগে থেকেই ছিল ক্রিস্টিয়ান। রুমে উপস্থিত জরুরি বিভাগের ডাক্তারটার চাইতে অনেক বেশি ফ্যাকাসে লাগছে তাকে। অবশ্য ডাক্তার নিশ্চয়ই গ্রীষ্মমন্ডলীয় কোথাও ছুটি কাটিয়ে এসেছে, সেকারণেই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তামাটে দেখাচ্ছে তার ত্বক। তবে মহিলার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ একদম স্পষ্ট।

“অ্যালিসিয়া কেমন আছে?” জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকালো ডাক্তার। “খুব একটা ভালো না। রোগির শারীরিক অবস্থা বেশি খারাপ হলে আমরা বার্বিটুরেট ড্রাগ দিয়ে ইচ্ছেকৃতভাবে কোমায় নিয়ে যাই। ওর বেলায় সেটা করতেই অনেক বেগ পেতে হয়েছে। নিজে থেকে শ্বাস নিতে পারছে না একদমই।”

“কী খেয়েছিল?”

“ওপিওয়েড জাতীয় কোন পেইনকিলার। খুব সম্ভবত হাইড্রোকোডন।”

মাথা নাড়লো ইউরি। “ওর ঘরে ওষুধের খালি শিশি পাওয়া গেছে।”

“কে খুঁজে পায় ওকে?”

“আমি,” ইউরি বলল। “বিছানার পাশে মেঝেতে পড়ে ছিল। শ্বাস নিচ্ছিল না। প্রথমে তো ভেবেছিলাম মারাই গিয়েছে।”

“ওষুধগুলো কিভাবে পেলো জানো কিছু?”

ইউরি ক্রিস্টিয়ানের দিকে তাকালে জবাবে কাঁধ ঝাঁকায় সে। “ওয়ার্ডে অনেকেই টাকার বিনিময়ে এসব পিল এনে দেয়।”

“যেমন এলিফ,” আমি বললাম।

মাথা নেড়ে সায় দিল ক্রিস্টিয়ান। “আমারো ওকেই সন্দেহ হয়।”

এসময় ইন্দিরা উপস্থিত হলো আইসিইউতে। দেখে মনে হচ্ছে যেকোন সময় কান্না জুড়ে দিবে। “অন্যান্য রোগিরাও খুব বাজেভাবে প্রভাবিত হবে এই ঘটনার দ্বারা,” বলে একটা চেয়ারে বসে অ্যালিসিয়ার হাতে হাত রাখলেন তিনি। ভেন্টিলেটরের ওঠানামার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। বড় ঘরটা জুড়ে থকথক করছে নীরবতা।

“সব দোষ আমার,” কিছুক্ষণ পর বললাম।

মাথা ঝাঁকালেন ইন্দিরা। “তোমার কোন দোষ নেই থিও।”

“আমার উচিৎ ছিল ঠিকভাবে ওর খেয়াল রাখা।”

“তুমি তোমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছে। আমাদের চেয়ে অন্তত অনেক বেশি।”

“ডায়োমেডেসকে কেউ জানিয়েছে?”

মাথা ঝাঁকানো ক্রিস্টিয়ান। “তার সাথে এখনও কথা হয়নি।”

“মোবাইলে ফোন করেছিলে?”

“হ্যাঁ, বাসার নম্বরেও যোগাযোগ করেছিলাম। লাভ হয়নি।”

দ্রুত কুঁচকে ফেললো ইউরি। কিন্তু আমি তো প্রফেসর ডায়োমেডেসকে দেখেছি। গ্রোভেই ছিলেন তিনি।”

“তাই?”

“হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ আগে অবশ্য। করিডোরের অন্য পাশে ছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল তাড়াহুড়োর মধ্যে আছেন।”

“অদ্ভুত তো। যাইহোক, হয়তো বাসায় গিয়েছেন। আবার ফোন দিও।”

মাথা নাড়লো ইউরি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য কোন ভাবনায় ডুবে আছে। অ্যালিসিয়ার এই কীর্তিতে সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছে সে-ই। খারাপই লাগলো বেচারার জন্যে।

ঠিক এই সময় ক্রিস্টিয়ানের পেজার বেজে উঠলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যায় সে। ইউরি আর ডাক্তারও চলে গেল রুম থেকে।

“অ্যালিসিয়ার সাথে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাও?” দ্বিধাশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ইন্দিরা।

জবাবে মাথা নেড়ে সায় দিলাম কেবল। উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে আলতো করে একবার চাপ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইন্দিরা।

এখন আমি আর অ্যালিসিয়া সম্পূর্ণ একা।

তার বিছানার বসে হাতে হাত রাখলাম। অন্য হাতটার উল্টোপিঠে একটা ক্যাথেটার লাগানো। খুব সাবধানে ওর হাতের তালুতে আঙুল বুলালাম। শুনকনো হাতটার শিরা-ধমনীগুলো অনুভব করতে পারছি। কজির এখানটাতেই ছুরি দিয়ে পোছ দিয়েছিল আত্মহত্যা করার জন্যে।

এভাবেই তাহলে অ্যালিসিয়ার গল্পের ইতি ঘটার কথা ছিল? আবারো নীরবতা নেমে আসলো তার জীবনে। চিরদিনের জন্যে।

ডায়োমেডেস কী বলবেন কে জানে। ক্রিস্টিয়ান নিশ্চয়ই আমাকে দোষারোপ করার কোন না কোন পদ্ধতি খুঁজে বের করবে। আমি তাকে বেশি চাপ দিয়েছি দেখেই হাইড্রোকোডোন জাতীয় কিছু খেয়েছে সে। দুর্ঘটনাবশত ওভারডোজ হয়ে গেছে, ডায়োমেডেস হয়তো পাল্টা যুক্তি দেখাবেন। কিন্তু আত্মহত্যার প্রবণতা তো অ্যালিসিয়ার আগে থেকেই ছিল। এভাবেই এই নাটকের পর্দা নামবে।

আসলেই কি?

একটা বিষয় কারোই নজরে আসেনি। এমনকি অ্যালিসিয়াকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করার সময় ইউরিও ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। ওর ডেস্কে ওষুধের একটা খালি শিশি ছিল, সেখান থেকে কয়েকটা পিল নিচেও পড়ে যায়। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে এটা ভাবটাই স্বাভাবিক যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে অ্যালিসিয়া।

কিন্তু আমার আঙুলের নিচে ওর কজির কাছে ছোট্ট এই ক্ষতটা তো অন্য কিছুর

সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হাইপোডার্মিক নিডলের ছাপটা আমার নজর এড়ালো না। সিরিঞ্জের সুই বিধলে এরকমটা হয়। সত্যটা বুঝতে কোন কষ্ট হলো না আমার। আত্মহত্যা করার জন্যে এক শিশি ওষুধ সাবাড় করেনি অ্যালিসিয়া। তাকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ মরফিনের একটা ভোজ দেয়া হয়েছে।

এটা আত্মহত্যার চেষ্টা বা ড্রাগ ওভারডোজ নয়।

কেউ খুন করতে চেয়েছে অ্যালিসিয়াকে।

আধা ঘন্টা পর থোভে উপস্থিত হলেন ডায়োমেডেস। ট্রাস্টের সাথে নাকি একটা জরুরি মিটিংয়ে ছিল তার। এরপর হাসপাতালে আসার পথে পাতাল ট্রেনে আধাঘন্টার মত আটকে থাকেন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে। ইউরিকে পাঠান আমাকে নিয়ে নিতে।

“প্রফেসর এসেছেন। স্টেফানির সাথে কথা বলছেন এখন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই,” আমার অফিসে এসে বলে ইউরি।

“ধন্যবাদ। আসছি আমি এখনই।”

কথা শোনার জন্যে তৈরি হয়েই ডায়োমেডেসের অফিসের দিকে রওনা দিলাম। পুরো ঘটনার জন্যে ট্রাস্টের সামনে বলির পাঠা হিসেবে হাজির করানো হবে কাউকে না কাউকে। এর আগে ব্রডমুরেও এমনটা হতে দেখেছি। সাধারণত রোগির ঘনিষ্ঠ কোন স্টাফকে দোষি সাব্যস্ত করা হয়ে; সেটা ডাক্তার, নার্স কিংবা থেরাপিস্ট যে-ই হোক না কেন। স্টেফানি যে আমার পেছনে লাগবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দরজায় একবার নক করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। স্টেফানি আর ডায়োমেডেস ডেস্কের দু’পাশে ব্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন। কোন বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল দু’জনের।

প্রথমে ডায়োমেডেস কথা বললেন। গতানুগতিকের চাইতে অনেক বেশি বিচলিত মনে হচ্ছে তাকে। কথা বলার সময় দুই হাত জোরে জোরে নাড়ছেন। “খুব খারাপ হলো ব্যাপারটা। খুবই খারাপ। তা-ও এরকম একটা সময়ে। এই ঘটনার অজুহাত দেখিয়ে ট্রাস্টের তরফ থেকে থোভ বন্ধ করে দেয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।”

“এ মুহূর্তে ট্রাস্টের চাইতেও অন্যান্য জরুরি বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত আমাদের,”

স্টেফানি বলল ক্রোধান্বিত কণ্ঠে। “রোগীদের নিরাপত্তার সবকিছুর উর্ধ্বে। ঠিক কি ঘটেছিল তা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,” আমার দিকে ঘুরলো সে। “ইন্দিরা বলছিল আপনি নাকি এলিফকে সন্দেহ করছেন? তার মাধ্যমেই হাইড্রোকোডোনের ব্যবস্থা করেছে অ্যালিসিয়া?”

তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিলাম না। কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, “আসলে আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু কয়েকজন নার্সকে এ বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম। তাছাড়া একটা বিষয় আপনাদের বিবেচনা করা উচিত-”

মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে থামিয়ে দেয় স্টেফানি। “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, তা বুঝতে পারছি। এলিফের কোন দোষ নেই এখানে।”

“আসলেই?”

“নার্স স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রিস্টিয়ান দেখে যে ড্রাগ কেবিনেট হাট করে খোলা। সে মুহূর্তে স্টেশনে কেউ ছিল না। ইউরি দরজায় তালা না দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে যে কেউ সেখানে ঢুকে ওষুধ হাতিয়ে নিতে পারতো। তখন অ্যালিসিয়াকেও আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছে ক্রিস্টিয়ান। সন্দেহ হলেও কিছু বলেনি। কিন্তু এখন ঘটনা পরিষ্কার।”

“হাসপাতালে এত স্টাফ থাকতে ক্রিস্টিয়ানের নজরেই পড়লো ব্যাপারটা।”

আমার কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস থাকলেও স্টেফানি সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করলো না। “ইউরির বেখেয়ালিপনা আমিও লক্ষ্য করেছি অনেকবার। নিরাপত্তার বিষয়ে কখনোই অতটা পাত্রা দেয়নি সে। রোগীদের সাথে বন্ধুদের মতন মেশে। মিশুক, সেটায় কোন সমস্যা নেই। কিন্তু অতিরিক্ত বন্ধুসুলভ ব্যবহার করলে তো বিপদ। আরো আগেই এরকম কিছু ঘটতে পারতো।”

“বুঝতে পারছি আপনার কথা,” আসলেও বুঝতে পারছি। স্টেফানি কেন আমার সাথে নরম সুরে কথা বলছে সেটা পরিষ্কার। ইউরিকে বলির পাঠা বানানো হবে, আমাকে নয়।

“ইউরি কিন্তু রোগীদের জন্যে কমও করেনি, এটা ভুলে গেলে চলবে না,” বলে ডায়োমেডেসের দিকে তাকালাম। আশা করছিলাম, তিনিও হয়তো কিছু বলবেন। “আমার আসলেও মনে হয় না।”

আমার কথা শেষ হবার আগেই কাঁধ ঝাঁকালেন ডায়োমেডেস। “যদি আমাকে

জিঞ্জেন্স করো, তাহলে বলবো যে অ্যালিসিয়া আগে থেকেই আত্মঘাতী কাজকর্ম করে অভ্যস্ত। আর কেউ যখন নিজের প্রাণ বিনাশের জন্যে উঠে পড়ে লাগে, তখন তাকে বাঁচানো কার সাধ্য?”

“কিন্তু এটাই তো আমাদের কাজ, তাই না?” শ্লেষমাথা কঠে বলল স্টেফানি।
“তাদের এমন কিছু করা থেকে বিরত রাখা।”

“না।” মাথা ঝাঁকালেন ডায়োমেডেস। “আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করা। আমরা কিন্তু ঈশ্বর নই। জীবন মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের কোন হাত নেই। অ্যালিসিয়া বেরেনসন বারবার নিজের জীবনকে শেষ করে দিতে চেয়েছে। একটা পর্যায়ে গিয়ে তার সফল হবারই কথা ছিল। তবে এবারে অন্তত পুরোপুরি সফল হয়নি।”

কথাটা বলবো কি না বুঝতে পারছি না। বললে এখনই মোক্ষম সময়।

“আপনার যুক্তিতে কোন ভুল নেই প্রফেসর,” দ্বিধা ঝেঁরে ফেলে বললাম।
“কিন্তু আমার মনে হয় না অ্যালিসিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।”

“তোমার ধারণা এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা?”

“নাহ। দুর্ঘটনাও না।”

কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ডায়োমেডেস। “কি বলতে চাইছো থিও? আত্মহত্যার চেষ্টা বা দুর্ঘটনা না হলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে এসব?”

“প্রথমেই বলে রাখি, ইউরি অ্যালিসিয়াকে ওষুধগুলো দিয়েছে, এটা বিশ্বাস করি না আমি।”

“তাহলে, ক্রিস্টিয়ান ভুল দেখেছে?”

“না,” বললাম। “ক্রিস্টিয়ান মিথ্যে বলছে।”

স্টেফানি আর ডায়োমেডেস-দু’জনের দৃষ্টিতেই বিস্ময় ফুটলো। তাদের কেউ কিছু বলার আগেই আবারো মুখ খুললাম আমি। অ্যালিসিয়ার ডায়েরিতে ক্রিস্টিয়ানের ব্যাপারে কী পড়েছি সব বললাম তাদের। অ্যালিসিয়ার মানসিক সমস্যার বিষয়ে আগেও গোপনে পরামর্শ দিয়েছে সে, অনেক কিছু জানার পরেও বিচার চলাকালীন সময়ে কিছু বলেনি, গ্রোভে যোগ দেয়ার পর অ্যালিসিয়াকে না চেনার ভান করেছে-এসব শুনে দু’জনেই ভীষণ অবাক হলো। এমনটাই আশা করছিলাম। “অ্যালিসিয়া মুখ না খুললেই তার জন্যে ভালো,” বললাম। “নতুবা তার

কুকীর্তি সবার জেনে যাবার ঝুঁকি ছিল।”

স্টেফানির মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। “কিন্তু থিও, আপনি নিশ্চয়ই এটা বোঝাচ্ছেন না যে সে-”।

“ঠিকই আন্দাজ করেছেন। এটা কোন আত্মহত্যার চেষ্টা বা ওভারডোজ নয়। অ্যালিসিয়াকে খুন করতে চেয়েছে কেউ।”

“অ্যালিসিয়ার ডায়েরি কোথায়?” ডায়োমেডেস জিজ্ঞেস করলো। “তোমার কাছে আছে?”

মাথা কঁকালাম। “না, ওকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই ওর ঘরে আছে।”

“এখনই ওটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, স্টেফানির দিকে ঘুরে বললেন ডায়োমেডেস। “কিন্তু এর আগে বোধহয় আমাদের পুলিশে খবর দেয়া উচিত, তাই না?”

এরপরের ঘটনাগুলো বেশ তাড়াতাড়িই ঘটলো।

খবর পেয়ে পুলিশ অফিসারদের একটা দল চলে আসে গ্রোভে। প্রথমেই অ্যালিসিয়ার ঘর আর আর্ট রুম সিল করে দেয়। প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা চিফ ইন্সপেক্টর স্টিভেন অ্যালেন বেশ রাশভারি স্বভাবের। চোখে বিশাল ফ্রেমের একটা রিডিং গ্লাস পরায় মণিগুলো স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বড় দেখাচ্ছিল। সব বিষয়েই ভীষণ কৌতূহল তার। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো অ্যালেন; ডায়োমেডেসকে যা বলেছি, তার সবকিছুই তাকে বললাম। এমনকি আমার ব্যক্তিগত নোটগুলো দেখালাম ড্রয়ার থেকে বের করে।

“আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, মি. ফেবার।”

“থিও বলে ডাকবেন, প্লিজ।”

“আপনাকে একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিতে হতে পারে একটু পর। সামনে আরো কয়েকবার কাজের খাতিরে আমাদের আলাপ হবে।”

“নিশ্চয়ই।”

ডায়োমেডেসের অফিসে বসেই সবার সাথে কথা বলছে ইন্সপেক্টর অ্যালেন। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সে। এক জুনিয়র অফিসারের কাছে বিবৃতি দেয়ার পর বাইরের করিডোরে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ক্রিস্টিয়ানকে

ডেকে পাঠানো হলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ভয় পেয়েছে বেচারি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে ভেবে মনে মনে খুশি হলাম। অপেক্ষা ছাড়া করার মত কিছু নেই এখন আমার। থোভ থেকে বের হবো, এমন সময় কি মনে করে একবার নার্স স্টেশনে উঁকি দিয়েই থমকে গেলাম।

এলিফকে এক হাতে একটা ওষুধের বোতল এগিয়ে দিচ্ছে ইউরি, আরেক হাতে নগদ কিছু টাকা। বাইরে বেরিয়ে আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকায় এলিফ।

“এলিফ,” বলি আমি।

“জাহান্নামে যাও,” বলেই হনহন করে হেঁটে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল সে।

ইউরি নার্স স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখেই জমে গেল। “তু তুমি এখানে কি করছো? খেয়াল করিনি,” রীতিমত তোতলাচ্ছে সে এখন।

“সেটা তো বুঝতেই পারছি।”

“এলিফ ওর ওষুধগুলো নিতে ভুলে গিয়েছিল। ওগুলোই দিচ্ছিলাম ওকে।”

“আচ্ছা।”

তাহলে থোভের ভেতরে অবৈধভাবে রোগীদের ওষুধ সরবরাহের হোতা ইউরি। কিছুক্ষণ আগে ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলে বোধহয় ভুলই করেছি। কড়া নজর রাখতে হবে এখন থেকে।

“তোমাকে একটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম,” আমাকে নার্স স্টেশন থেকে দূরে এনে বলল সে। “মি. মার্টিনের ব্যাপারে কি করবো?”

“মানে?” অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম ইউরির দিকে। “জিন-ফিলিক্স মার্টিনের কথা বলছো?”

“হ্যাঁ। গত কয়েক ঘন্টা ধরে তো এখানেই আছে সে। সকালে অ্যালিসিয়ার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তখন থেকে অপেক্ষা করছে।”

“কি? আগে কেন বলোনি? পুরো সময় থোভেই ছিল সে?”

“দুঃখিত, আসলে আজকে এত ধকল গেছে...যাইহোক, ওয়েটিং রুমে আছে সে।”

“ঠিক আছে। আমি তাহলে তার সাথে গিয়ে কথা বলি।”

ইউরির বলা কথাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে রিসিপশনের দিকে ছুটলাম। জিন-

ফিলিক্স এখানে কি করছে? কী চায় সে? কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছে?

ওয়েটিং রুমে ঢুকে আশপাশে তাকালাম।

খাঁখা করছে জায়গাটা।

থোভ থেকে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরলাম। কিছুক্ষণ পর একটা কণ্ঠস্বর কানে এলো। কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। ভেবেছিলাম জিন-ফিলিক্স। কিন্তু মুখ তুলে দেখি অন্য কেউ।

ম্যাক্স বেরেনসন। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে সে।

“এসব কি হচ্ছে?” চিল্লিয়ে উঠলো গ্যাব্রিয়েলের ভাই। চেহারা রাগে বিকৃত। দেখে মনে হচ্ছে পুরো শরীরের রক্ত এসে জমা হয়েছে মুখমন্ডলে। “আমাকে কিছুক্ষণ আগে ফোন দিয়ে বলল অ্যালিসিয়ার কথা। কি হয়েছে ওর?”

এক পা পিছিয়ে এলাম। “শান্ত হোন, মি. বেরেনসন।”

“শান্ত হবো মানে? আপনাদের খামখেয়ালিপনার জন্যে গ্যাব্রিয়েলের স্ত্রী এখন কোমায়

মুষ্টিবদ্ধ হাতটা উঁচু করলো সে। ভাবলাম যে ঘুষি বসিয়েই দিবে। কিন্তু দৌড়ে এসে তাকে থামালো তানিয়া। তার চেহারাতেও খেলা করছে রাগ। তবে সেই রাগটা ম্যাক্সের উদ্দেশ্যে।

“থামো! কি করছো! পরিস্থিতি এমনিতেও যথেষ্ট খারাপ। থিওর কোন দোষ নেই!”

তাকে পাত্তাই দিল না ম্যাক্স। আমার দিকে ঘুরলো আবারো। চোখে বুনো ক্রোধ। “অ্যালিসিয়া আপনার তত্ত্বাবধায়নে ছিল,” গলার স্বর এখনও চড়িয়েই রেখেছে। “এ রকমটা কিভাবে হতে দিলেন? কিভাবে?”

রাগের চোটে তার চোখে পানি এসে গেছে। নিজের আবেগ লুকোনোর কোন চেষ্টাই এখন আর করছে না। ওখানে দাঁড়িয়েই কাঁদতে শুরু করলো। তানিয়ার দিকে তাকালাম; অ্যালিসিয়াকে যে ম্যাক্স পছন্দ করে, এটা অবশ্যই জানে সে। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে এখন। কোন কথা না বলে উল্টোদিকে ঘুরে গাড়িতে ফিরে গেল তানিয়া।

ম্যাক্সের ধারে কাছেও থাকতে চাই না এখন। হাঁটতে শুরু করলাম।

পেছন থেকে এখনও চেষ্টাচ্ছে সে। ভেবেছিলাম পিছু নিবে, কিন্তু ওরকম কিছু

করলো না। আগের জায়গা থেকেই আমার উদ্দেশ্যে নানারকম কথা বলছে। কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে একজন পরাজিত মানুষের বেদনার বহিঃপ্রকাশ এসব :

“এসবের জন্যে আপনি দায়ি! আমার অ্যালিসিয়া...অ্যালিসিয়া। আপনাকে এর মূল্য চুকাতে হবে! শুনতে পাচ্ছেন?”

ম্যাক্সের চিৎকার থামার কোন লক্ষণ নেই, কিন্তু আমি আর তার একটা কথাও শুনছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি মিলিয়ে গেল।

হাঁটা থামলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে ক্যাথির প্রেমিকের বাড়ির কাছাকাছি চলে এলাম। প্রায় এক ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর দেখা পেলাম ‘ভদ্রলোকের’। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এসেছে সে। কোথায় যাচ্ছে? ক্যাথির সাথে দেখা করতে? কি করবো সেটা নিয়ে দোটানায় ভুগলাম কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ না করারই সিদ্ধান্ত নিলাম। বরং বাড়িটার দিকেই আজকে নজর রাখবো।

জানালা দিয়ে তার স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে এখন। ভেতরে ভেতরে একটা তাগিদ অনুভব করছি। সাহায্যের তাগিদ। এই মহিলার তো কোন দোষ নেই, আমার মতনই পরিস্থিতির শিকার সে। তাকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করতেই হবে। আমরা যাদের ভালোবেসেছি, তারাই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

নাকি ভুল ভাবছি? মহিলা লোকটার পরকীয়ার ব্যাপারে সব জানে? এরকম খোলামেলা সম্পর্কেও অনেকে মজা পায়। হয়তো সে-ও বহুগামী? কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একসময়কার আমার মতনই নির্ভর, সঙ্গিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। যে লোকটার সাথে প্রতি রাতে একই বিছানায় ঘুমোতে যায় সে, তার ব্যাপারে কড়া কিছু সত্য বলতে চাই আমি। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

পরবর্তী দিনগুলোতেও বারবার ফিরে গেলাম সেখানে। এর মাঝে একদিন সে বাসা থেকে হাঁটতে বের হয়েছিল। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে অনুসরণ করি আমি। একটা পর্যায়ে সে হয়তো আমাকে দেখেও ফেলে। কিন্তু দেখলেও সমস্যা নেই। আমি তার কাছে নেহায়েতই অপরিচিত একজন। আপাতত।

কয়েকটা জিনিস কিনে আবারো ফিরে এলাম আগের জায়গায়। রাস্তার অন্য পাশ থেকে বাড়িটার ওপরে নজর রাখছি। কিছুক্ষণ পর জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো সে।

কী করবো সে বিষয়ে আমার আসলে ওরকম নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই। শুধু অস্পষ্ট একটা ধারণা আছে বলা যায়। অনভিজ্ঞ চিত্রশিল্পীদের মতন ব্যাপারটা। ছবিটা কি রকম হবে সেটা জানি, কিন্তু কিভাবে সেটা আঁকতে হবে সে ব্যাপারে ধারণা খুব অল্প। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। মূল ফটকে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। বাগানে এখন আমি। শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব টের পাচ্ছি। বিনা অনুমতিতে অন্য কারো বাড়িতে ঢোকার মধ্যে আলাদা এক ধরনের রোমাঞ্চ আছে।

ঠিক এসময় পেছনের দরজাটা খুলে গেল। লুকোনোর আশায় চারপাশে তাকালাম। বাগানের ভেতরেই একটা ছোট ঘর ছাড়া গা ঢাকা দেয়ার মত আর কিছু চোখে পড়লো না। অগত্যা সেখানেই আশ্রয় নিলাম। বুক হাঁপরের মত উঠছে নামছে। আমাকে কি দেখে ফেলেছে সে? তার পদশব্দ কানে এলো কিছুক্ষণ পর। এখানেই আসছে। আর পিছু হটার কোন সুযোগ নেই। পেছনের পকেট থেকে একটু আগে কেনা স্কি মাস্কটা বের করে মাথায় গলিয়ে নিলাম। বাইরে থেকে শুধু আমার চোখ দেখা যাচ্ছে এখন। হাতে গ্লোভস পরলাম।

ভেতরে ঢুকলো মহিলা। ফোনে কারো সাথে কথা বলছে : “ঠিক আছে, ডার্লিং। আটটার সময় দেখা হবে! হ্যাঁ...আই লাভ ইউ।”

ফোন কেটে দিয়ে হাতের ফ্যানটা চালিয়ে দেয় সে। কিছুক্ষণ ফ্যানের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাসে চুলগুলো উড়ছে। এরপর একটা তুলি হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় জানালার ধারে দাঁড় করানো ইজেলের দিকে। এখনও আমার দিকে পিঠ দিয়ে আছে। হঠাৎই থমকে যায় সে, জানালায় আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। প্রথমে বোধহয় আমার ছুরিটার চকচকে ফলাই নজরে এসেছে তার। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধীরপায়ে ঘুরে দাঁড়ালো এরপর। একে অন্যের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকলাম আমরা।

সেবারই প্রথম অ্যালিসিয়া বেরেনসনের সাথে প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার।

বাকিটা ইতিহাস।

পঞ্চম পর্ব

আমি নিরপরাধ, কিন্তু আমার নিজের কথাই আমাকে অপরাধী করে তোলে।

-ইয়োব ৯:২০

অ্যালিসিয়া বেরেনসনের ডায়েরি

ফেব্রুয়ারি ২৩

মাত্র চলে গেল খিও। এখন একা আমি। যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু লিখে ফেলতে হবে আমাকে। খুব বেশি সময় নেই হাতে। কতক্ষণ শরীরে কুলাবে, জানি না।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে আমার মাথায় সমস্যা আছে। সত্যটা মেনে নেয়ার চাইতে এরকম ভাবটাই সহজ ছিল। কিন্তু আসলে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

প্রথমবার যখন তাকে থেরাপি রুমে দেখি, কিছু একটা পরিচিত মনে হয়। কিছুক্ষণ ভাবার পর বুঝতে পারি চোখদুটো আগেও দেখেছি। তাছাড়া সিগারেট আর আফটারশেভের গন্ধটাও পরিচিত। কথা বলার ছন্দ, কথার মাঝে বিরতি-এসবও মিলে যায়, শুধু কণ্ঠস্বরটা কোন এক কারণে অন্যরকম ঠেকেছিল। কিন্তু পরের বার দেখা হওয়ার সময় নিজেকে আর লুকোতে পারিনি। আমার বাসায় ঢুকে যে কথাটা বলেছিল, ঠিক সেই একই কথা আবারো আমাকে এখানে বলে সে। কথাগুলো কখনোই ভোলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে:

“আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমি। বিশ্বাস করুন কথাটা। সত্যিটা হচ্ছে, আমি চাই আপনি যাতে ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারেন।”

এই কথাগুলো শোনা মাত্র সব পরিস্কার হয়ে যায় আমার কাছে। ধাঁধার সূত্রগুলো একদম খাপে খাপে বসে গেছে।

এই লোকটাই সেই আততায়ী।

হঠাৎই কি যেন একটা হয়ে যায় আমার। ঝাঁপিয়ে পড়ি তার ওপরে। ওখানেই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম তাকে। মারবো নাহয় মরবো। গলা চেপে ধরি, চোখ ওপড়ানোর চেষ্টা করি, বারবার মেঝেতে মাথা ঠুকে ঘি বের করে ফেলার চেষ্টা করি কিন্তু লাভ হয় না। মারতে পারিনি তাকে। আমাকে আটকে ফেলে কয়েকজন মিলে।

ঘুম পাড়িয়ে বন্দী করে রাখে। এরপর আবারো সাহস হারিয়ে ফেলি। সংশয়ে ভুগতে থাকি যে আমার বোধহয় ভুল হচ্ছে। পুরোটাই কল্পনা বৈ কিছু নয়।

থিও আর সেই লোকটা একই ব্যক্তি হয় কি করে? থোভে এসে আমাকে এভাবে উসকে দেয়ার পেছনে তার কি উদ্দেশ্যে থাকতে পারে? তখনই সত্যটা বুঝতে পারি। আমাকে সাহায্য করার বিষয়টা একদমই গাঁজাখুরি। আসলে এসব থেকে বিকৃত এক ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছে সে। সেজন্যেই ফিরে এসেছে নিজেকে জাহির করার জন্যে।

“আপনাকে সাহায্য করতে চাই আমি। বিশ্বাস করুন কথাটা। সত্যিটা হচ্ছে, আমি চাই আপনি যাতে ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারেন।”

হ্যাঁ, এখন ঠিকঠাকই চিন্তা করতে পারছি। আমি যে সত্যটা জানি সে বিষয়ে কোন রাখঢাকও করিনি। সেজন্যে ইচ্ছে করে গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যুর ব্যাপারে মিথ্যে গল্প ফেঁদেছি। থিও’র চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে সে বুঝতে পারছে আমি মিথ্যে বলছি। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা। আমি তাকে চিনে ফেলেছি, এটা টের পায় সে। তার চোখে এমন একটা অনুভূতি দেখতে পাই, যেটা আগে কখনো দেখিনি। ভয়। আমাকে ভয় পাচ্ছিল সে। কাকে কী বলে ফেলি সেটা নিয়ে আতঙ্কে ছিল নিশ্চয়ই। আমার কণ্ঠস্বর ওর ভেতরের সুপ্ত ভয়টা আবারো জাগিয়ে তোলে।

সেজন্যেই কয়েক মিনিট আগে ফিরে এসেছিল। তবে এবারে আর কিছু বলেনি। সোজা এগিয়ে এসে আমার কজিতে একটা সুই বিধিয়ে দেয়। আমি তাকে আটকানোর চেষ্টা করিনি, কোন প্রকার ধস্তাধস্তিও করিনি। এই শাস্তিটা আমার প্রাপ্য। হ্যাঁ, আমি আসলেও অপরাধী। কিন্তু থিও’র ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। সেজন্যেই ডায়েরিতে সব লিখে রাখছি, যাতে এবারে আর পার না পায় সে। শাস্তি পেতেই হবে তাকে।

তাড়াতাড়ি লিখতে হবে। আমার শরীরে কি ইনজেক্ট করেছে জানি না, কিন্তু সেটার প্রভাব টের পাচ্ছি। চোখ ভেঙে ঘুম আসছে। বালিশটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে অনেকক্ষণ ধরেই। ঘুমাবো আমি...না, এখন ঘুমোলে চলবে না। জেগে থাকতেই হবে। আগে পুরো গল্পটা শেষ করতে হবে। আর এবারে, একদম সত্যটাই বলবো।

সেই রাতে বাসায় ঢুকে লিভিংরুমে একটা চেয়ারের সাথে আমাকে বেঁধে ফেলে থিও। এরপর গ্যাব্রিয়েল বাড়ি ফিরলে তাকেও বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত দিয়ে অজ্ঞান করে। প্রথমে ভেবেছিলাম মেরেই ফেলেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর টের পাই যে গ্যাব্রিয়েল শ্বাস নিচ্ছে। তাকেও একটা চেয়ারে বসিয়ে বাধে থিও। আমাদের চেয়ার দুটো এমন অবস্থানে রাখে যাতে একে অপরের চেহারা দেখতে না পারি।

“প্লিজ,” আকুতি জানাই আমি। “প্লিজ, ওকে কষ্ট দেবেন না। আপনি যা চান, তা-ই করবো আমি।”

আমার কথা শুনে হেসে ওঠে থিও। শুকনো এই হাসিটাকে যে কতটা ঘৃণা করি আমি তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। “কষ্ট দেব?” বলে মাথা ঝকায় সে। “ওকে খুন করবো আমি।”

বুঝতে পারি, ফাঁকা বুলি আউড়াচ্ছে না থিও। আর সামলাতে পারি না নিজেকে, দু’চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে শুরু করে। আপনি যা চান, সেটাই করবো আমি। ওকে ছেড়ে দিন, প্লিজ। ওর মত মানুষ হয় না। ওকে ভালোবাসি আমি। অনেক বেশি-”

“একটা কথা বলুন, অ্যালিসিয়া। আপনার কি মনে হয়? সে ভালোবাসে আপনাকে?”

“হ্যাঁ, সবার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসে।”

ঘড়ির কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। অনন্তকাল পর কথা বলল থিও। “সেটা দেখা যাবে।” শীতল দৃষ্টিটার দিকে খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। থিওর মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কিছু ছিল না সেই মুহূর্তে। যেন নরক থেকে সাক্ষাৎ শয়তান উঠে এসেছে।

আমার চেয়ারের সামনে থেকে সরে গ্যাব্রিয়েলের উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করেও লাভ হলো না, দেখতে পাচ্ছি না কিছু। এরপরেই ভোতা একটা শব্দ কানে আসে। গ্যাব্রিয়েলকে সর্বশক্তিকে থাপ্পড় দিয়েছে সে। যতক্ষণ অবধি জ্ঞান না ফেরে ততক্ষণ মারতেই থাকলো থিও। কিছুক্ষণ পর মুখে বুলি ফোটে গ্যাব্রিয়েলের।

“কি-কি-”

“হ্যালো, গ্যাব্রিয়েল।”

“কে-কে আপনি?”

“খুবই সাধারণ একজন মানুষ। বিবাহিত। তাই জানি ভালোবাসার মূল্য কি। আর এটাও জানি যে ভালোবাসার মানুষটা বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেমন লাগে।”

“কি আবোল তাবোল বলছেন।”

“কাপুরুষেরাই তাদের ভালোবাসার মানুষকে ধোঁকা দেয়। তুই কি কাপুরুষ, গ্যাব্রিয়েল?”

“জাহান্নামে যা।”

“তোকে মেরেই ফেলতাম। কিন্তু অ্যালিসিয়া তোর প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। তাই তোকে এখন একটা সুযোগ দিব। হয় তুই মরবি, নাহলে তোর জায়গায় অ্যালিসিয়া মরবে। সিদ্ধান্ত তোর।”

একদম ঠাণ্ডা স্বরে কথাগুলো বলে থিও। শুনে মনে হবে যেন এই কথাগুলো নিজের সাথেই হাজারবার বলেছে। কোন অনুভূতি নেই কণ্ঠে। একদম শান্ত। কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলল না গ্যাব্রিয়েল। হাঁপানোর শব্দ শুনে মনে হচ্ছে তার পেটে সজোরে ঘুষি বসিয়েছে কেউ।

“না”

“হ্যাঁ। হয় অ্যালিসিয়া মরবে, নাহলে তুই মরবি। সিদ্ধান্ত তোর, গ্যাব্রিয়েল। দেখা যাক কত ভালোবাসিস ওকে। ওর জন্যে নিজের জ্ঞান দিতে পারবি? দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি তোকে। দশ...নয়-”

“ওর কথা বিশ্বাস কোরো না,” বলি আমি। “আমাদের দু’জনকেই মেরে ফেলবে। আই লাভ ইউ”

-আট, সাত-

“আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো, গ্যাব্রিয়েল-”

“-ছয়...পাঁচ-”

“আমাকে ভালোবাসো তুমি-”

“-চার...তিন-”

“গ্যাব্রিয়েল, একবার বলো যে আমাকে ভালোবাসো তুমি-”

“দুই”

আর তখনই কথা বলে ওঠে গ্যাব্রিয়েল। প্রথমে ওর কণ্ঠস্বর চিনতেই পারিনি।

মনে হচ্ছিল অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। বাচ্চারা কোন অপরাধ করলে এই সুরে কথা বলে। কিন্তু আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছিল গ্যাব্রিয়েলের কথাগুলোর ওপরে।

“মরতে চাই না আমি,” বলে সে।

এরপর সব থেমে যায়। অসহ্য একটা নীরবতা নেমে আসে চারপাশে { মনে হচ্ছিলো আমার শরীরের প্রতিটা কোষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে; জুই গাছ থেকে যেভাবে ফুলগুলো ঝরে পড়ে, ঠিক সেভাবে মৃত কোষগুলো ঝরে পড়ছে। জুইয়ের ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম? হ্যাঁ, মিষ্টি একটা ঘ্রাণ...

গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে সরে এসে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করে থিও। তবে তার কথা ঠিকমতো আমার কানে ঢুকছিল না। “শুনলেন তো, অ্যালিসিয়া? আমি জানতাম গ্যাব্রিয়েল একটা আস্ত কাপুরুষ। নাহলে নিজের স্ত্রীকে রেখে আমার স্ত্রীর সাথে শোয় কি করে? আমার জীবনের একমাত্র সুখটা কেড়ে নিয়েছে। সামনে এগিয়ে আসে থিও, আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে, “কাজটা করতে খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু সত্যটা জানার পর আপনারও নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা চলে গেছে?”

আমার মাথা বরাবর বন্দুক তাক করলো সে। চোখ বন্ধ করে ফেলি। গ্যাব্রিয়েলের চিৎকার কানে আসছে-“গুলি করবেন না! গুলি করবেন না!”

একটা ক্লিক শব্দ। এরপর কানফাটানো গুলির আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সব নীরব হয়ে যায়। ভেবেছিলাম মরেই গেছি বুঝি।

কিন্তু আমার ভাগ্য কখনোই অতটা ভালো ছিল না।

চোখ খুলে দেখি সিলিংয়ের দিকে বন্দুক তাক করে আছে থিও। মুখে হাসি। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আমাকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয় সে।

“অ্যালিসিয়া?” গ্যাব্রিয়েল ডাকে আমার নাম ধরে। “অ্যালিসিয়া?”

টের পাচ্ছি যে গ্যাব্রিয়েল ওর চেয়ারে বসেই মোচড়া-মুচড়ি করছে। ঘরে দেখার চেষ্টা করছে কি হয়েছে।

“কি করেছিস তুই? বেজন্মা কোথাকার! ঈশ্বর-”

আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয় থিও। এরপর বন্দুকটা মেঝেতে নামিয়ে রাখে। আলতো করে আমার গালে একবার চুমু খেয়ে বেরিয়ে যায়। সামনের দরজা দিয়ে।

গ্যাব্রিয়েল আর আমি বাড়িতে তখন একা। শব্দ করে কাঁদছিল ও, কোন কথাই বলতে পারছিল না। শুধু চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকতে থাকে। “অ্যালিসিয়া, অ্যালিসিয়া-”

আমি নীরবই থাকি। কেন যেন অ্যালসেস্টিসের কথা মনে হচ্ছিল বারবার। কিন্তু তার স্বামী তো তাকে একটু হলেও ভালোবাসে।

“অ্যালিসিয়া...কি হলো-”

মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোয় না আমার। কি করে কথা বলতাম? ও তো নিজের মুখেই আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

আর মৃত মানষ কথা বলে না।

পায়ের বাঁধন খুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। নিচু হয়ে মেঝেতে হাত দিতেই বন্দুকটা হাতে ঠেকে। স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি গরম মনে হচ্ছিল জিনিসটা। হেঁটে গিয়ে গ্যাব্রিয়েলের মুখোমুখি হই। ওর চোখ বড় বড় হয়ে যায় আমাকে দেখে।

“অ্যালিসিয়া? তুমি বেঁচে আছো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তুমি-”

যদি বলতে পারতাম, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, পরাজিত সব মানুষের পক্ষ থেকে গ্যাব্রিয়েলের ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম কিংবা গ্যাব্রিয়েলের মধ্যে আমার বাবার ছায়া খুঁজে পেয়েছিলাম সেদিন-তাহলে কিছুটা হলেও শান্তি লাগতো। কিন্তু এখানে মিথ্যে কিছু লিখবো না। সত্যটা হচ্ছে, আমার আর গ্যাব্রিয়েলের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ একে অপরের সাথে পাঁটে যায়। নিজেকে ওর জায়গায় আবিষ্কার করি আমি।

এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি সবকিছু। শান্তি বলে জীবনে কখনো কিছু বরাদ্দ ছিল না আমার জন্যে। কেউ ভালোবাসতো না। আমার সব স্বপ্ন, আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে হয়ে গিয়েছিল। মা মারা যাবার পরদিন বাবা আসলে ঠিক কথাটাই বলে-মায়ের জায়গায় আমি মরলেই ভালো হতো। বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই আমার। আমার জীবনের কোন মূল্য নেই। শেষ হয়ে গেছে সবকিছু। আর গ্যাব্রিয়েলই করেছে কাজটা।

এটাই সত্য।

আমি গ্যাব্রিয়েলকে হত্যা করিনি।

বরং ও আমাকে খুন করেছে।

আমি শুধু বন্দুকের ট্রিগারটা টেনেছিলাম।

“এই দৃশ্যটা দেখলে সবসময়ই খুব খারাপ লাগে আমার,” ইন্দিরা বলল।
“কার্ডবোর্ডের বাক্সে বন্দী করে ফেলা হচ্ছে একজনের জীবনের সবকিছু।”

মাথা নেড়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ঘরটার চারপাশে তাকালাম।

“কিন্তু একটা বিষয় অবাক করেছে আমাকে,” আজকে কথা বলার রোগে পেয়েছে ইন্দিরাকে। “অ্যালিসিয়ার জিনিসপত্র অনেক কম। অন্য রোগীদের তো হাবিজাবি কত কিছু থাকে। কিন্তু এখানে কয়েকটা বই, কিছু ছবি আর ওর কাপড়-চোপড় ছাড়া কিছুই নেই।”

স্টেফানির কথামতো অ্যালিসিয়ার ঘর খালি করতে এসেছি আমি আর ইন্দিরা।
“সে আর কখনো জেগে উঠবে বলে মনে হয় না, স্টেফানি বলেছিল আমাদের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া একটা ঘর ফেলে রাখা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।”

চুপচাপ কাজ করে গেলাম আমরা। কোন জিনিসগুলো সংরক্ষণ করা হবে আর কোনগুলো ফেলে দেয়া হবে এগুলো নিয়ে কয়েকবার কথা বললাম শুধু। মনোযোগ দিয়ে অ্যালিসিয়ার সব জিনিস লক্ষ্য করলাম আমি। তবে আমাকে বিপদে ফেলার মত কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে।

অ্যালিসিয়া ডায়েরিটা এতদিন কিভাবে লুকিয়ে রেখেছে সেটাই ভাবছিলাম।
ভর্তির সময় সঙ্গে করে সব রোগি অল্প কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসে। অ্যালিসিয়া এনেছিল খামভর্ষিত স্কেচ। ওগুলোরই কোন একটায় ডায়েরিটা ছিল নিশ্চয়ই।
খামগুলো খুলে ভেতরে উঁকি দিলাম। বেশিরভাগই অসমাপ্ত স্কেচ আর খসড়া।
এখানে সেখানে কয়েকটা সুন্দর ছবিও আছে, অ্যালিসিয়ার প্রতিভার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করা চলবে না।

একটা স্কেচ ইন্দিরাকে দেখিয়ে বললাম, “এটা আপনি।”

“কি? নাহ।”

“হা, দেখুন খেয়াল করে।”

“আসলেই?” বলে খুশিমনে স্কেচটা হাতে নিল ইন্দিরা। “আসলেই এটা আমি?
কবে আঁকলো! আমি তো কিছু জানিই না। সুন্দর না?”

“হ্যাঁ। আপনি রেখে দিন এটা।”

মুখ বাঁকিয়ে স্কেচটা আমাকে ফিরিয়ে দিল ইন্দিরা। “সেটা তো সম্ভব না।”

“অবশ্যই সম্ভব। অ্যালিসিয়া নিশ্চয়ই কিছু মনে করতো না আপনি ছবিটা নিলে,” হেসে বললাম। “তাছাড়া কেউ কিছু জানবেও না।”

“বলা যায় না।” দেয়ালে ঠেস দেয়া বড় পেইন্টিংটার দিয়ে চোখ গেল তার। আমাকে আর অ্যালিসিয়াকে দেখা যাচ্ছে সেখানে। এলিফ এই ছবিটাই নষ্ট করেছিল।

“এটা কি তুমি নিয়ে যাবে?” ইন্দিরা জিজ্ঞেস করলো।

“না,” মাথা বাঁকিয়ে বললাম। “জিন-ফিলিক্সকে ফোন দিয়েছি। সে-ই এসবের একটা বন্দোবস্ত করবে।”

“তুমি রাখতে পারলেই ভালো হতো,” মাথা নাড়লো ইন্দিরা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম পেইন্টিংটার দিকে। আসলে এটা খুব একটা পছন্দ নয় আমার। কিন্তু অ্যালিসিয়ার অন্য ছবিগুলো ঠিকই ভালো লাগে। একটু অদ্ভুতই ব্যাপারটা, কারণ ছবিটাতে আমি নিজেও আছি।

একটা কথা পরিস্কার করে বলে দিতে চাই-আমি কিন্তু ঘুণাঙ্করেও সন্দেহ করিনি যে অ্যালিসিয়া সেদিন গ্যাব্রিয়েলকে গুলি করবে। আর আমাদের কাউকে খুন করার কোন ইচ্ছে ছিল না। আমি শুধু অ্যালিসিয়া সত্যিটা জানাতে চেয়েছিলাম। যেমন আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে জেনেছি। বোঝাতে চাইছিলাম, গ্যাব্রিয়েল তাকে ভালোবাসেনা। ভুলের স্বর্গে বাস করছে সে। তাদের বিয়ে একটা নাটক বৈ কিছু নয়। কেবলমাত্র এসব জানলেই জীবনকে নতুন করে সাজাতে পারবে সে। মিথ্যে নয়, সত্যের ভিত্তিতে গড়া একটা জীবন।

অ্যালিসিয়ার মানসিক সমস্যার ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই জানা ছিল না আমার। যদি জানতাম তাহলে ওরকমটা কখনোই করতাম না।

মিডিয়ায় যখন খুনের ঘটনাটা নিয়ে তোলপাড় শুরু হলো, মনে মনে একটা দায়বদ্ধতা অনুভব করি আমি। বারবার মনে হচ্ছিল প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সবাইকে বোঝাই যে এসবের জন্যে আমি কোনভাবেই দায়ি নই। সেজন্যেই থোভের চাকরিটার জন্যে আবেদন করেছিলাম।

অ্যালিসিয়াকে খুনের পরবর্তী জীবনের সাথে মানিয়ে নেয়াটাই উদ্দেশ্যে ছিল আমার। তাকে যদি ঠিকভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারি, তাহলে সত্যটা

বুঝবে সে-এমনটাই আশা করেছিলাম।

হ্যাঁ, অনেকে বলতে পারে, সব সূত্র চিরতরে গোপন করার জন্যে অ্যালিসিয়ার জীবনে ফিরে এসেছি। কিন্তু এটা সত্য নয়। এই কাজটা যে আমার জন্যে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ তা শুরু থেকেই জানা ছিল আমার। ধরা পড়ে যেতে পারি, গোটা পরিকল্পনা যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে-এতসব ঝুঁকি সত্ত্বেও কাজটা করি কারণ...কি বলবো? আমি এমনই।

ভুলবেন না, আমি একজন সাইকোথেরাপিস্ট। অ্যালিসিয়ার সাহায্যের দরকার ছিল, আর একমাত্র আমিই জানতাম, কী করে তাকে সাহায্য করতে হবে।

প্রথমদিকে এই ভেবে কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম, সে চিনে ফেলবে আমাকে। যদিও সেদিন মাস্ক পরে গিয়েছিলাম তার বাসায়, তবুও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কণ্ঠস্বর ইচ্ছে করে পাল্টে ফেলি। কিন্তু অ্যালিসিয়া চিনতে পারে না আমাকে, তাই তার জীবনের নতুন একটা ভূমিকা পালনের সুযোগ পাই। এরপর পলের সাথে তাদের ক্যামব্রিজের বাসার ছাদে কথা বলার বুঝতে পারি আসলে ঐ দিনটাতে কি করেছিলাম আমি।

অ্যালিসিয়ার বাবার মত গ্যাব্রিয়েলও অ্যালিসিয়াকে হত্যা করেছিল সেদিন, কথার মাধ্যমে। সেজন্যেই প্রতিশোধের নেশা চেপে বসে তার মধ্যে। কিন্তু ভার্নন রোজ নয়, তার প্রতিশোধের অনলে ছাই হয় গ্যাব্রিয়েল বেরেনসন। যেরকমটা আমি সন্দেহ করেছিলাম, খুনের ঘটনাটা আসলে অ্যালিসিয়ার বহুদিনের চেপে রাখা ক্ষোভ আর হতাশার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কিন্তু অ্যালিসিয়া যখন সেদিন থেরাপি রুমে গ্যাব্রিয়েলের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মিথ্যে বলল, বুঝে যাই যে আমাকে চিনে ফেলেছে সে। আর তাই বাধ্য হয়েই সারাজীবনের জন্যে তার মুখটা বন্ধ করে দিতে হলো।

সব দোষ ক্রিস্টিয়ানের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছি-একেই বোধহয় বলে পোয়েটিক জাস্টিস। তবে ওকে ফাঁসানোর জন্যে কোন প্রকার অনুশোচনাবোধ নেই আমার। অ্যালিসিয়ার যখন তাকে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল, সেই মুহূর্তে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে সে। শাস্তি তার প্রাপ্য।

অ্যালিসিয়ার মুখ বন্ধ করা অতটা সহজ ছিল না। ওর শরীরে মাত্রাতিরিক্ত মরফিন ইনজেক্ট করা আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। সে যে মারা যায়নি,

এতে ভালোই হয়েছে। এখন ইচ্ছে করলে প্রতিদিন তার পাশে গিয়ে হাত ধরে বসে থাকতে পারবে। তাকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলিনি অন্তত।

“আমাদের কাজ তো শেষ?” ইন্দিরার কথায় চিন্তার বাঁধন ছিঁড়ে গেল আমার।

“হ্যাঁ।”

“বেশ। আমার যেতে হবে, বারোটোর সময় একজন রোগির সাথে দেখা করার কথা।”

“আপনি চলে যান বরং,” বললাম।

“লাঞ্চে দেখা হচ্ছে তাহলে?”

“হ্যাঁ।”

আমার হাতে আলতো করে একবার চাপ দিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দিরা।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। আজকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার ইচ্ছা আমার। বড় বেশি ক্লান্ত লাগছে। বাতি নিভিয়ে রুমটা থেকে বের হতে যাবো, এ সময় হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসলো আমার। ওখানেই জমে গেলাম।

ডায়েরিটা কোথায়?

ঘরের চারদিকে তাকালাম। সবকিছু খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি আমি। অ্যালিসিয়ার ব্যক্তিগত সব জিনিস হাতিয়ে দেখেছি।

কিন্তু ডায়েরিটা কোথাও নেই।

এতটা বেখেয়ালী হলাম কী করে? ইন্দিরার প্যাচালের কারণে আসলে বারবার মনোযোগ ছুটে গেছে।

কোথায় ওটা? নিশ্চয়ই এখানেই কোথাও আছে। ডায়েরি ছাড়া ক্রিস্টিয়ানের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না। ওটা লাগবেই আমার।

আবারো তল্লাশি চালালাম ঘরটায়, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। দুশ্চিন্তা। সবগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স উল্টেপাল্টে দেখলাম। সব খাম ছিঁড়ে ফেলে স্কেচগুলো মাটিতে ফেলে দিলাম। ওগুলোর মধ্যে লুকোনো নেই জিনিসটা। আবারো সবগুলো ড্রয়ার একটা একটা করে দেখলাম ধৈর্য সহকারে।

কিন্তু কোথাও পেলাম না ডায়েরিটা।

রিসিপশনে ট্রাস্টের জুলিয়ান ম্যাকমেহন অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। হুটপুট শরীরের বিশালদেহী একজন মানুষ, লালচে কোঁকড়ানো চুল।

কথোপকথনের সময় আপনার আমার মধ্যে থাক ব্যাপারটা, ‘সব কথার শেষ কথা বা বুঝতেই তো পারছেন এই জাতীয় কথা বলে অভ্যস্ত। ট্রাস্টের খুব অল্প সংখ্যক সদস্যই গ্রোভের প্রতি সদয়, জুলিয়ান তাদের মধ্যে একজন। বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছে সে।

“প্রফেসর ডায়োমেডেসের সাথে কেবলই কথা হলো। একটা বিষয় আপনার জানা উচিত-তিনি কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।”

“ওহ আচ্ছা।”

“আসলে ওনার চাকরির আরো কয়েক বছর বাকি ছিল। কিন্তু অনুসন্ধান কমিটিকে এড়াতে নিজে থেকেই সরে গেলেন। আপনার আর আমার মধ্যেই থাক কথাটা, কাঁধ নাচালো জুলিয়ান। “বেচারার জন্যে খারাপই লাগছে। এত সুন্দর একটা ক্যারিয়ারের এরকম সমাপ্তি। তবে মিডিয়ার হৈ-হট্টগোলের মধ্যে জড়াতে হবে না। যাইহোক, আপনার কথা বলছিলেন প্রফেসর।”

“আমার কথা?”

“হ্যাঁ। নিজের পদটা আপনাকে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন,” বলে একবার চোখ টিপলো জুলিয়ান। “আপনি নাকি কাজটার জন্যে একদম আদর্শ ব্যক্তি।”

হাসলাম আমি। “সবসময়ই আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন প্রফেসর।”

“দুর্ভাগ্যবশত, গত কয়েক দিনের ঘটনার কারণে ট্রাস্টের পক্ষে আর গ্রোভ চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে ক্রিস্টিয়ানের গ্রেফতার এই সিদ্ধান্ত নিতে একপ্রকার বাধ্যই করেছে আমাদের। চিরদিনের জন্যে গ্রোভ বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা।”

“খুব বেশি অবাক হলাম না শুনে। অর্থাৎ আমার কোন চাকরি নেই আপাতত?”

“আসলে, সব কথার শেষ কথা-কয়েক মাসের মধ্যে আমরা নতুন। সাইকিয়াট্রিক সার্ভিস চালু করার কথা ভাবছি। যেখানে ট্রাস্টের খরচ আগের তুলনায় অনেক কম হবে। আর আপনি যদি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে যোগ দেন, তাহলে আমরা খুশি হবো, থিও।”

উত্তেজনা চেপে রাখা কষ্টকর হলো আমার জন্যে। হাসিমুখেই হ্যাঁ বলে দিলাম। “আপনার আর আমার মধ্যেই একটা কথা বলি,” তার মত করেই বললাম, “এরকম সুযোগের স্বপ্নই দেখে এসেছি এতদিন।”

বানিয়ে বলিনি কথাটা। আমি যদি কোন সাইকিয়াট্রিক পরিচালনার সুযোগ পাই, তাহলে সত্যিকার অর্থেই অনেকে লাভবান হবে সেখান থেকে। যেমনটা রুথের কাছ থেকে আমি লাভবান হয়েছি। অ্যালিসিয়াকে যেভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি।

আমার জন্যে এখানে আসার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না, এটা স্বীকার করতেই হবে।
যা চেয়েছিলাম তার সবটুকুই পেয়েছি। প্রায় সবটুকু।

গত বছর সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে সারেতে চলে যাই আমি আর ক্যাথি, যেখানটায় বড় হয়েছি আমি। বাবা মারা যাবার সময় বাড়িটা আমার নামে দিয়ে যান। তবে মা যতদিন বেঁচে আছেন, মালিকানা তারই থাকবে। কিন্তু মা অত জটিলতার মধ্যে যেতে চাননি। আমাকে আর ক্যাথিকেই বাড়িটা পুরোপুরি লিখে দিয়ে তিনি একটা বৃদ্ধাশ্রমে উঠে পড়েন।

জায়গাটা লন্ডন থেকে একটু দূরে, এটা ঠিক। কিন্তু ওখানে এরকম খোলামেলা বড় বাসা কখনো পেতাম না। আমরা ঠিক করেছিলাম, সারেতে আসার পরপরই সবকিছু একদম নতুন করে সাজাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর করা হয়ে ওঠেনি। বাড়ি সাজানোর জন্যে পোর্তোবেল্লো মার্কেট থেকে কেনা জিনিসগুলো এখনও আগের মতনই প্যাকেট করে রাখা আছে। তাই বাড়িটার চেহারা খুব একটা বদলায়নি। বরং ছেলেবেলায় যেমনটা দেখেছি, এখনও সেরকমই আছে।

বাড়িতে পৌঁছে নিজেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। যত দ্রুত সম্ভব কোট খুলে ফেললাম, ভেতরটা গ্রিনহাউজের মতন গরম। হলওয়াতে থার্মোস্ট্যাটের তাপমাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিলাম। ক্যাথির এরকম গরমে থাকতে ভালো লাগলেও আমার তুলনামূলক ঠাণ্ডাই পছন্দ। এটা নিয়ে প্রায়ই খুনসুটি হয় আমাদের। টিভির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি হলওয়া থেকে। ইদানীং টিভি দেখার পরিমাণ বেড়ে গেছে ক্যাথির। সবসময় চালুই থাকে চারকোনা জিনিসটা।

লিভিংরুমে উঁকি দিয়ে দেখি সোফায় পা তুলে বসে আছে সে। হাতে বড় একটা চিপসের প্যাকেট। সবসময় এসব হাবিজাবি খেতেই থাকে; এ কারণেই গত কয়েক বছরে ওজন এ রকম বেড়ে গিয়েছে। এখন আর আগের মতন ব্যায়ামের ধার ধারে না। অনেক চুপচাপ হয়ে গেছে আগের তুলনায়, অবসাদগ্রস্তও বলা যায়। ওর ডাক্তার অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট খাওয়ার কথা বললেও, আমি মানা করে দিয়েছি। বরং একজন থেরাপিস্টের কাছে মনের সব কথা বলে হালকা হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

কিন্তু ক্যাথি খুব সম্ভবত কারো সাথেই কথা বলতে চায় না।

প্রায়ই খেয়াল করি যে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। তখন ওর মাথায় কি চলে কে জানে। হয়তো গ্যাব্রিয়েলের ব্যাপারে আমাকে বলবে কি না সেসব নিয়ে ভাবে। কিন্তু শেষমেষ কিছুই বলে না। চুপচাপ বসে থাকে, অনেকটা অ্যালিসিয়ার মতন। ওকে সাহায্য করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না কিছুতেই।

মাঝে মাঝে সবকিছু অর্থহীন মনে হয় আমার কাছে। এত কিছু তো ক্যাথিকে কাছে রাখার জন্যেই করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকেও হারাতে হলো।

সোফার হাতলে বসে ওকে কিছুক্ষণ দেখলাম। “আমার এক রোগি প্রায় মরতে বসেছিল ওভারডোজের কারণে। এখন কোমায়।” ক্যাথি নির্বিকার। “খুব সম্ভবত আমার এক সহকর্মীই ইচ্ছেকৃতভাবে কাজটা ঘটিয়েছে। এবারেও কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখালো না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছে তুমি?”

কাঁধ ঝাঁকালো ক্যাথি। “হ্যাঁ, কিন্তু বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।”

“সমবেদনা জানিয়েও কিছু একটা বলতে পারতে।”

“কার জন্যে সমবেদনা? তোমার জন্যে?”

“না, আমার রোগির জন্যে। লম্বা একটা সময় ধরেই তার থেরাপিস্টের দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম। অ্যালিসিয়া বেরেসন।” নামটা বলার সময় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলাম ক্যাথিকে।

মনে হলো যেন আমার কথা কানেই যায়নি তার। এক মুহূর্তের জন্যেও অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হলো না।

“বেশ বিখ্যাত কিন্তু সে, কুখ্যাতও বলতে পারো। কয়েক বছর আসে স্বামীকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে, মনে আছে তোমার?”

“নাহ,” আবারো কাঁধ ঝাঁকিয়ে চ্যানেল বদলায় ক্যাথি।

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে নাটকটা এখনও চালু আছে।

আমার অভিনয়ের মাত্রাও আগের তুলনায় আরো বেড়েছে। অনেকের সাথেই এরকম নাটক করতে হয় এখন। এমনকি নিজের সাথেও অভিনয় করি। সেজন্যেই এসব লিখে রাখছি বোধহয়। আত্মহংকারের জন্যে সত্যটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও, এখানে বাস্তবতাটুকু জমা থাক।

একটা ড্রিস্ক দরকার আমার এখন। রান্নাঘরে গিয়ে ফিজার থেকে ভদকার বোতল বের করলাম। গ্লাসে একটু ঢেলে নিয়ে একবারে গিলে ফেললাম পুরোটা। আরেক শট ঢালোম।

রুথের সাথে যদি এখন আবারো দেখা করি, তাহলে কি বলবে সে? ছয় বছর আগে তার কাছেই তো খুলে বলেছিলাম সবকিছু। কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয়, তা ভালো করেই জানি। আমি আর আগের থিও নেই। আমার ভেতরের সতোর লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রুথের মত বয়স্ক একজনের মানুষের সামনে বসে কি করে অকপটে মিথ্যে বলবো? আমার জীবনে তার অবদান অন্য যে কারো চাইতে বেশি। কি করে তাকে বলবো যে তিনটা জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছি? আর সেজন্যে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই আমার ভেতরে। শিষ্টাচার, দয়া, সতোর জায়গা দখল করে নিয়েছে শঠতা, হিংসা আর বিকৃত মানসিকতা। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাবি না আমি।

রুথের মনে আমার জন্যে বিতৃষ্ণা জন্মাবে, এই ভাবনাটার চাইতে আমার জন্যে কষ্ট পাবে সে-এই ভাবনাটাই বেশি পোড়ায়। তার হয়তো মনে হতে পারে যে আমাকে সাহায্য করতে অক্ষম হয়েছে সে। একদম অল্প বয়সি একটা ছেলে, যে তার কাছে সাহায্যের আশায় গিয়েছিল-সযোগ পেয়েও তার সমস্যা দূর করতে পারেনি সে। তার আত্মটাকে বাঁচাতে পারেনি। ঘন্টার পর ঘন্টা সাইকোথেরাপির কোন মূল্য থাকবে না। কিন্তু ধারণাটা ভুল, কারণ সব দোষ আমার।

কলিংবেল বেজে উঠলো এসময়। কল্লনা থেকে বাস্তবতায় ফিরে এলাম। সন্ধ্যা বেলায় আমাদের বাসায় কেউ আসে না। বিশেষ করে লন্ডন থেকে সারেতে চলে আসার পর কেউ এসময় বেল বাজায়নি। আর শেষ কবে আমাদের বাসায় কাউকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, সেটাও ভুলতে বসেছি।

“কারো আসার কথা নাকি?” জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ক্যাথি জবাব দিল না। টেলিভিশনের শব্দ ছাপিয়ে বোধহয় আমার কথা শুনতেই পায়নি।

আমিই উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। চিফ ইন্সপেক্টর অ্যালেন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। একটু অবাকই হলাম তাকে দেখে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে গাল দুটো একদম লাল হয়ে আছে বেচারার। গলায় মাফলার জড়ানো।

“শুভ সন্ধ্যা, মি. ফেবার।”

“ইন্সপেক্টর অ্যালেন? আপনি এখানে?”

“এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করে যাই। তাছাড়া কেসের ব্যাপারে কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। এখন কথা বলতে পারবেন?”

ইতস্তত করতে লাগলাম আমি। “আসলে এখন তো রান্না করবো ভাবছিলাম, তাই

“খুব বেশি সময় লাগবে না।”

হাসল অ্যালেন। না করলেও যে শুনবে না সেটা বোঝাই যাচ্ছে, অগত্যা একপাশে সরে তাকে ভেতরে আসার সুযোগ করে দিলাম আমি। ভেতরে ঢুকে হাসি আরো চওড়া হলো তার। হাতমোজা আর কোট খুলে ফেলল। “এত ঠাণ্ডা পড়েছে। কিছুক্ষণ পর তুষার ঝরতে শুরু করবে নিশ্চয়ই।” তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে চশমার কাঁচ ঘোলা হয়ে গেলে রুমাল দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করে নিল।

“আমাদের বাসায় একটু বেশিই গরম।”

“আরে নাহ, আমার তো এরকম গরমই পছন্দ।”

“আমার স্ত্রী-ও আপনার মতনই।”

ঠিক এই সময় ক্যাথি হলওয়েতে বেরিয়ে এসে আমার আর ইন্সপেক্টর অ্যালেনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। “কি হয়েছে?”

“ক্যাথি, ইনি চিফ ইন্সপেক্টর অ্যালেন। একটু আগে আমার যে রোগির ব্যাপারে কথা বলছিলাম, তার কেসটা তিনিই দেখছেন।”

“শুভ সন্ধ্যা, মিসেস ফেবার।”

“কিছু ব্যাপারে আলাপ আছে আমাদের। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি গিয়ে গোসল সেরে ফেল। আমি খাবার রেডি করে তোমাকে ডাক দেব,” বলে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করলাম। “চলুন তাহলে।”

ক্যাথির দিকে একবার তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো ইন্সপেক্টর অ্যালেন। তার পেছন পেছন গেলাম আমি। ক্যাথি তখনও হলওয়েতেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর তার পদশব্দ ওপর তলায় মিলিয়ে গেল।

“কিছু খাবেন?”

“ধন্যবাদ। এক কাপ চা পেলে বর্তে যেতাম।” ভদকার বোতলটার দিকে

তাকিয়ে বলল ইন্সপেক্টর।

হাসলাম আমি। “নাকি আরো শক্ত কিছু?”

“নাহ, আপাতত চা-ই দিন।”

“কিরকম চা পছন্দ করেন আপনি?”

“একটু কড়া। খুব বেশি দুধ না দিলেও চলবে। চিনি ছাড়া। চেষ্টা করছি মিষ্টি সবকিছু এড়িয়ে চলার।”

কেতলিতে পানি চাপিয়ে তার মুখোমুখি বসলাম।

“কী যেন বলবেন বলেছিলেন?”

“আসলে মি. মার্টিনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।”

“জিন-ফিলিক্স?” বিস্মিত কণ্ঠে বললাম। “তার ব্যাপারে আবার কি কথা?”

“তিনি থোভে এসেছিলেন অ্যালিসিয়ার আঁকা ছবি আর অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। তখন বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে আলাপ হয়। চমৎকার একজন মানুষ। অ্যালিসিয়ার ছবিগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন। তার মতে এখনই মোক্ষম সময়, যেহেতু মিডিয়াতেও অ্যালিসিয়াকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমার দিকে সমীহের দৃষ্টিতে তাকালো অ্যালেন। “আপনি কিন্তু তাকে নিয়ে একটা বই লিখতে পারেন।”

“আসলে এ বিষয়ে এখনও কিছু ভাবিনি। মাফ করবেন, জিন ফিলিক্সের সাথে আমার সম্পর্কটা এখনও বুঝতে পারছি না, ইন্সপেক্টর।”

“নতুন ছবিটা নিয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন মি. মার্টিন। এলিফ যে ছবিটায় দাগ দিয়েছে, এটা নিয়ে খুব বেশি মাথাব্যথা নেই তার। বরং এতে নাকি ছবিটার শিল্পমূল্য বেড়ে গেছে। আমি নিজে আসলে এসব শিল্প-টিল্ল নিয়ে অত বেশি বুঝি না, মি. ফেবার। আপনি বোঝেন?”

“নাহ।” মূল কথায় আসতে তার কতক্ষণ লাগবে কে জানে। কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হচ্ছে আমার।

“যাইহোক, ছবিটার অনেক প্রশংসা করছিলেন মি. মার্টিন। এক পর্যায়ে ভালো করে দেখার জন্যে হাতে তুলে নেন। আর সেখানেই ছিল জিনিসটা।”

“কোন জিনিসটা?”

“এটা।”

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চারকোণা জিনিস বের করলো প্রফেসর।
দেখামাত্র সেটা চিনতে পারলাম আমি।

অ্যালিসিয়ার ডায়েরি।

এসময় কেতলিটা পানি গরম হয়ে যাওয়ার সংকেত দিলে সেখান থেকে ফুটন্ত পানি নিয়ে একটা মগে ঢালোম আমি। চামচ দিয়ে দুধ মেশানোর সময় খেয়াল করলাম যে হাত কিছুটা কাঁপছে।

“ওহ। আমিও ভাবছিলাম যে কোথায় ডায়েরিটা।”

“ফ্রেমের উল্টোদিকে বামপাশে আটকে ছিল। ওখানে গেল কী করে কে জানে।”

এ কারণেই তাহলে চোখে পড়েনি। ছবিটা এতই অপছন্দ আমার যে একবার উল্টিয়েও দেখিনি। দেখলে...

কালো ডায়েরিটার ওপরে এখন হাত বুলাচ্ছে ইন্সপেক্টর। “ভেতরের লেখাগুলো কিন্তু ধাঁধার মতন। তীর চিহ্ন দিয়ে যোগ করা হয়েছে অনেক কিছু। বিভ্রান্তিকর।”

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। “অসুস্থ মনের প্রতিচ্ছবি বলতে পারেন।”

ডায়েরির পাতাগুলো উল্টে একদম শেষদিকে চলে গেল ইন্সপেক্টর। এরপর ওখান থেকে জোরে জোরে পড়া শুরু করলেন

“...সেজন্যেই কয়েক মিনিট আগে ফিরে এসেছিল। তবে এবারে আর কিছু বলেনি। সোজা এগিয়ে এসে আমার কজিতে একটা সুঁই বিধিয়ে দেয়।”

হঠাৎ আতঙ্ক ভর করলো আমার চিত্তে। আমি যখন ডায়েরিটা পড়ি তখন এই কথাগুলো ছিল না। এরকম প্রমাণের ভয়েই ছিলাম। কিন্তু এখন ডায়েরিটা ভুল একজনের হাতে চলে গেছে। ইচ্ছে করছে তার হাত থেকে ডায়েরিটা ছিনিয়ে নিয়ে পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। ফাঁদে পড়ে গেছি। তোতলাতে শুরু করলাম

“আ-আমার মনে হয় যদি-”

আমি যে ঘাবড়ে গেছি এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে ইন্সপেক্টর। “জি?”

“না, কিছু না।”

তাকে থামানোর আর চেষ্টা করলাম না। এখন আমি যা-ই করি না কেন তাতে আমাকে আরো বেশি অপরাধী মনে হবে। এই প্যাঁচ থেকে বের করার আর কোন

উপায় নেই। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বস্তিবোধ হচ্ছে এখন।

“আমার মনে হয় না আপনি অন্য কোন কাজে এই এলাকায় এসেছিলেন, ইন্সপেক্টর,” তার হাতে চা তুলে দিয়ে বললাম।

“ঠিক ধরেছেন। কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়েই এখানে আসার উদ্দেশ্যটা বলে ফেলতে মন সায় দেয়নি। সত্যিটা হচ্ছে, এই ডায়েরির লেখাগুলো কিন্তু পুরো বিষয়টার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।”

“ওখানে কি লেখা সেটা আমিও জানতে চাই,” নিজেকে বলতে শুনলাম। “দয়া করে একটু জোরে পড়বেন?”

“বেশ, এত করে যখন বলছেন...”

মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি নিয়ে জানালার পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

একবার গলা খাকারি দিয়ে পড়তে শুরু করলো ইন্সপেক্টর অ্যালেন।

“মাত্র চলে গেল থিও। এখন একা আমি। যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু লিখে ফেলতে হবে আমাকে। খুব বেশি সময় নেই হাতে...”।

কথাগুলো শুনতে শুনতে আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা দেখতে লাগলাম। অবশেষে তাদের মন গলেছে। ভেতরে বন্দি থাকা তুষারগুলোর আজ ছুটি। জানালা খুলে হাত সামনে বাড়ালাম। একটা তুষারকণা ভাসতে ভাসতে আমার হাতে এসে পড়লো। কিছুক্ষণ পর আবার মিলিয়েও গেল। অজান্তেই মুখে একটা হাসি ফুটলো আমার।

আরেকটা তুষারকণা ধরার জন্যে হাত সামনে বাড়িয়ে দিলাম।